পশ্চিমবঙ্গ

তেভাগা সংখ্যা

১৪০৪ বঙ্গাব্দ

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বর্ষ ৩০ ★ সংখ্যা ৪২-৪৬

২, ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০ মে ১৯৯৭

প্রধান সম্পাদক : তরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদক : দিব্যজ্যোতি মজুমদার

সহযোগী সম্পাদক : মুকুলেশ বিশ্বাস

সহকারী সম্পাদক

অনুশীলা দাশগুপ্ত ● মন্দিরা ঘোষাল ● উৎপলেন্দু মণ্ডল

প্রচ্ছদ : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা : এই সংখ্যায় ব্যবহৃত স্কেচ, কাঠখোদাই-চিত্র, আলোকচিত্র, কবিতা, গান, পুরনো প্রবন্ধ, ইস্তেহার, তথ্য জানযুদ্ধ, দৈনিক গণশক্তি, দৈনিক কালান্তর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি এবং দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোর, কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মজুমদার, পরিতোষ দত্ত, ধনঞ্জয় রায় প্রমুখের সৌজন্যে

অঙ্গসজ্জা : প্রতাপ সিংহ, তুলসীদাস বসাক, রামচন্দ্র পণ্ডিত, শ্যাম রুদ্র, নিতাই গোড়ে, জয়দেব পাল

প্রকাশক

তথ্য অধিকর্তা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রক

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড

১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০১২

দাম : কুড়ি টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা

সুভাষ সরকার, তথ্য আধিকারিক

৬ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

দূরভাষ : ২২১-৪২৯৫

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়

সেদিনের উজ্জীবনী উচ্চারণ

সম্পাদকীয়

অর্ধ শতাব্দী আগের অখণ্ড ভারতবর্ষ, পরাধীন ভারতবর্ষ। উপনিবেশবাদী শক্তির অর্থনৈতিক ও সামাজিক দর্শনই হল শোষণ এবং কুৎসিত অন্যায়-অবিচার। ইতিহাসের এই বীভৎস অধ্যায়কে কোনও শৃঙ্খলিত জাতিই মেনে নেননি, সে-কারণেই দিক থেকে দিগন্তে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের এই শোষণ-লোলুপতা স্বাভাবিক। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দোসর হয়ে যখন স্বদেশীয় ক্ষুদে শোষক জোতদার-জমিদার-মহাজন নিজের দেশের গরিব অসহায় মানুষকে ক্ষুধার অন্ন থেকে বঞ্চিত করে তখন বড় বিস্ময় লাগে। অবশ্য বিস্ময়ের প্রশ্ন অবান্তর, শোষকের দেশভেদ নেই, স্বদেশীয় বিদেশীয় কোনও শ্রেণী-বিভাজন নেই। এই স্বদেশীয় জোতদার-জমিদার-মহাজনের শত-শতাব্দীব্যাপী অত্যাচারের আর শোষণের পরিণতিতে ঘটে যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, পঞ্চাশের মন্বন্তর, 'বাপের' জমি হারায় কৃষক, 'দাপের' জমি বেড়ে চলে জমিদারের, কৃষক পরিণত হয় ভূমিহীন বর্গাদারে। বাংলার ইতিহাস তাই কিষানের রক্তে-ঘামে-কান্নায় সিঞ্চিত। আবার ইতিহাসই সাক্ষী রয়েছে,—অবমানিত বুভুক্ষু সর্বহারা কৃষক-সমাজ সব-সময় মেনে নেননি এই অবিচার, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে উজ্জ্বল অসংখ্য কৃষক-বিদ্রোহের উৎসার ঘটিয়েছেন। পাকা ফসলের 'ন্যায্য' দাবিতে অর্ধশতাব্দী আগের ঘটে-যাওয়া সেই মহান তেভাগা আন্দোলন আজও প্রগতিপন্থী মানুষকে উদ্দীপিত করে। সবচেয়ে লজ্জার কথা, স্বাধীনতা লাভের পরেও তেভাগার কৃষকদের রক্তে বাংলার মাটি বর্ষা-সিক্ত হয়েছিল।

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার এই তেভাগা সংখ্যায় 'তেভাগা-সময়কালের অভিজ্ঞতা' এবং 'সাম্প্রতিক মূল্যায়ন'—এই দুটি অংশে কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। সঙ্গে একটি অনন্য দলিলও রয়েছে। এইসব রচনার মাধ্যমে আজকের দিনের পাঠক সেদিনের 'দাউ দাউ বাংলা দেশের প্রাণে'র স্পর্শ অনুভব করতে পারবেন। সাম্প্রতিক কালের পশ্চিমবঙ্গের কিষানেরা যে স্বাধিকার ও আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তার পেছনে রয়েছে তেভাগার কৃষকদের আত্মবলিদান ও রক্তঝরানো প্রতিরোধ ও প্রতিজ্ঞা। সেদিনের সংগ্রামী মানুষদের ভুলে যাওয়ার অর্থ নিজেদের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা। ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে কোনও জাতির অগ্রগতি অসম্ভব। আমরা সেই ঐতিহ্যকে স্মরণ করছি।

সেদিনের উজ্জীবনী উচ্চারণ

দুর্মর

সুকান্ত ভট্টাচার্য

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলা দেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে,
সে কোলাহলের রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ।

জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।
হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।

"হয় ধান নয় প্রাণ" এ শব্দে
সারাদেশ দিশাহারা,
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা।

সাবাস, বাংলা দেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয় :
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালি নয়কো, রক্তে রঙিন ধান,
দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলা দেশের প্রাণ॥

(পূর্বাভাস)

শিল্পী : চিত্তপ্রসাদ

গ্রামের আলোকবর্তিকা তেভাগার শহিদেরা

জ্যোতি বসু

কৃষিজমির বর্গাদারকে তাঁর উৎপাদিত ধানের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ দেবার আইনসিদ্ধ অধিকার সরকার কর্তৃক পরিত্যাগ করার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং বিশ্বাসঘাতক নীতির আমি তীব্র নিন্দা করছি। কৃষকদের মধ্যে ৪১ শতাংশই বর্গাদার। তাঁরা যে ধান উৎপন্ন করেন তার দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ তাঁদেরই প্রাপ্য। এ সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ সচেতন। তাঁদের এই ন্যায্য দাবি ১৯৪০ সালে ভূমিরাজস্ব কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। আশ্চর্যের হলেও মুহূর্তের বিস্মরণে এবং দর্শকদের সামনে অভিনয়ের সাময়িক খেয়ালে মন্ত্রিপরিষদ (মুসলিম লিগ) বর্গাদারদের ধানের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ দেবার নীতিকে স্বীকার করে একটি খসড়া বিল গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখন তা শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে।

মন্ত্রিসভার মনে রাখা উচিত যে, এইসব মানুষ বছরের পর বছর তাঁদের দাবি পূরণের আশায় অপেক্ষা করেছেন। এ সম্পর্কে ভূমিরাজস্ব কমিশন কর্তৃক বর্গাদারদের পক্ষে রিপোর্ট দাখিলের পরও তাঁরা সাত বছর ধরে অপেক্ষা করেছেন, এখনও তা কার্যকর হল না। কিন্তু তাঁরা এখন দুই-তৃতীয়াংশ ভাগের সেই ন্যায্য দাবি যখন করছেন তখনই আমরা আইন-শৃঙ্খলার প্রতি চ্যালেঞ্জের কথা শুনতে পাচ্ছি। আইন-শৃঙ্খলার প্রতি চ্যালেঞ্জের কথা যখনই শোনা যাবে তখনই বুঝতে হবে যে, সেই আইন হচ্ছে শোষণ করার আইন এবং শৃঙ্খলা হচ্ছে সমগ্র কৃষক আন্দোলনকে নির্দয়ভাবে দমন করার শৃঙ্খলা। তাই আমরা দেখি দূর দূর গ্রামে কৃষক ও বর্গাদারদের ঘর-বাড়ি নিশ্চিহ্ন করার কাজে সরকারি যন্ত্রকে নিযুক্ত হতে ; আমরা দেখি তাঁদের স্ত্রীলোকদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে ; এবং স্টেনগান, রিভলভার ও রাইফেল নিয়ে গিয়ে গ্রামাঞ্চলকে আতঙ্কিত করতে। বর্গাদারদের দাবিটা কোনও প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি পরিবর্তনের নয়, তথাপি সরকার নিজেকে সমস্ত

মানুষের না হলেও অন্তত মুসলমানদের বন্ধু বলে ভান করছেন। মন্ত্রিসভা অবশ্য নিশ্চিতভাবেই জানেন যে, বর্গাদারদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান, আদিবাসী, তফসিলি জাতি ইত্যাদি সকলেই আছেন। একটি সহজ দাবির জন্য এঁদের সকলকেই ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলা হচ্ছে। আমরা এটাও দেখছি—আমি নিজেই স্বচক্ষে খুলনা, জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহে এবং দিনাজপুরের পাঠানো রিপোর্টে দেখেছি যে কৃষকেরা কোথাও মারমুখী হয়ে ওঠেননি। একটি থানা বা একজন জোতদারের বাড়িও পোড়েনি, জমিদার বা জোতদারদের একজনও খুন হয়নি ; তথাপি যখন বর্গাদারেরা তাঁদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য ভাগ দাবি করেন মাত্র, তখনই আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে শোনা যায়। এই মানুষেরা আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছেন বলে মিঃ সেহরাবর্দি আমাদের শুনিয়েছেন। কিন্তু আমি নিজে যতগুলি স্থানে গিয়েছি, সেখানে সর্বত্রই দেখেছি পুলিসই ধ্বংসাত্মক কাজগুলি করেছে। মন্ত্রীদের আমি জিজ্ঞেস করি—কোণ্ আইনের বলে পুলিস গিয়ে কৃষকদের ঘর-বাড়ি ভেঙেছে, মেয়েদের লাঞ্ছিত করেছে এবং কৃষক হত্যা করেছে?

আমি নিশ্চিত যে, দিনাজপুরের সমিরুদ্দিন এবং শিবরামের মতো মানুষেরা যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের এই প্রাণদান ব্যর্থ হবে না। পুলিসের বুলেট যখন তাঁদের দেহকে ঝাঁজরা করে দিয়েছে, তখনও তাঁরা 'তেভাগা চাই', 'জান দেব তবু ধান দেব না' বলে লুটিয়ে পড়েছেন। কারণ তাঁরা জানতেন যে, নিজেদের জীবনদান করেও যদি তাঁদের দাবি পূরণ হয়, তবে আগামী দিনে তাঁদের সন্তানেরা ভালভাবে বাঁচতে পারবে এবং তাঁদের প্রিয়জনদের চোখের জল ঘোচাতে পারবে।

তাই কয়েক দানা শস্যের জন্য তাঁরা প্রাণ দিলেন।

[*বক্তৃতা, ১২ মার্চ ১৯৪৭*]

শিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী

হারাণের নাতজামাই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন সক্রিয় সৈনিক। সে-সময়ের অনেক ছোটগল্পে সমবেত মানুষের অনন্য প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ও সক্রিয় প্রতিরোধের কথা তাঁর গল্পে আশ্চর্য সৃষ্টিকুশলতায় প্রকাশ পেয়েছে। এমনই একটি ছোটগল্প 'হারাণের নাতজামাই'।

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প সংকলন 'ছোটবড়' গ্রন্থে রয়েছে এই গল্পটি। পরবর্তী কালে ১৯৬৩ সালে মানিকের সাহিত্যিক জীবনের উত্তরপর্বের প্রতিনিধিত্বমূলক পঞ্চাশটি ছোটগল্প নিয়ে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি যে 'উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ' প্রকাশ করেন সেখানেও 'হারাণের নাতজামাই' গল্পটি রয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতার পরে গল্পটি প্রকাশিত হলেও এটির রচনাকাল সম্পর্কে প্রয়াত চিন্মোহন সেহানবিশ জানিয়েছেন,—"সময় সম্ভবতঃ ১৯৪৬ সালের শেষ অথবা ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিক। দাঙ্গার দুঃস্বপ্নকে মুছে ফেলে দিয়ে সারা বাংলাদেশ জুড়ে তখন চলছিল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ তেভাগা আন্দোলন। এমন সময় এল মানিকবাবুর 'হারাণের নাতজামাই'। মানিকবাবু যখন গল্প পড়া শেষ করলেন তখন ভাবছিলাম সাহিত্য সত্যই কত ধারালো হাতিয়ার হতে পারে। কৃষাণী ময়নার মা-র চরিত্র-মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়েছিলাম আমরা সবাই। কিন্তু তাঁর গোঁয়ার জামাইও কি ফেলবার? এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই গল্পের প্রথম দিকে লিখেছেন,—"শীতের তে-ভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষীদের........"। গল্পকার তেভাগা বা তেভাগার আন্দোলন সম্পর্কে গল্পে আর কিছুই উল্লেখ করেননি। কিন্তু সচেতন পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন, কথাসাহিত্যিক কোন প্রতিবাদী সময়ের কথা বলছেন। এই সময়কালেই শোষিত বঞ্চিত কৃষক-সমাজ জোতদার-জমিদারের অমানবিক ও কুৎসিত অবিচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় সংগঠিত তেভাগা আন্দোলন গড়ে তোলেন। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন সাম্যবাদী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিবর্গ যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক-সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, ঘটনা, উত্তাপ, প্রতিবাদী মানসিকতা, কৃষকদের আন্তরিকতা ও ঋজু মনোভঙ্গি গল্পটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। অবমানিত অথচ সংগ্রামী কৃষক-সমাজকে উপজীব্য করে এমন ছোটগল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি হয়নি। বোধ করি, পরেও লিখিত হয়নি। (*সম্পাদক, 'পশ্চিমবঙ্গ'*)

মাঝ রাতে পুলিস গাঁয়ে হানা দিল।

সঙ্গে জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতি। কয়েকজন লেঠেল।

কনকনে শীতের রাত। বিরাম বিশ্রাম ছেঁটে ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে তিনটি দিনরাত্রি একটানা ধান কাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পালা করে জেগে ঘরে ঘরে ঘাঁটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। শাঁক আর উলুধ্বনিতে আকস্মিক আবির্ভাব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল গ্রামের কাছাকাছি পুলিসের আবির্ভাবের। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিস সমস্ত গাঁ ঘিরে ফেলবার আয়োজন করলে হারাণের ঘর থেকে ভুবন মণ্ডল সরে পড়তে পারত, উধাও হয়ে যেত। গাঁ শুদ্ধ লোক যাকে আড়াল করে রাখতে চায়, হঠাৎ হানা দিয়েও হয়তো পুলিস সহজে তার পাত্তা পায় না। দেড়মাস চেষ্টা করে পারেনি, ভুবন এ গাঁ ও গাঁ করে বেড়াচ্ছে যখন খুশি।

কিন্তু গ্রাম ঘেরবার, আঁটঘাঁট বেঁধে বসবার কোন চেষ্টাই পুলিস আজ করল না। সটান গিয়ে ঘিরে ফেলল ছোট হাঁসতলা পাড়াটুকুর কখানা ঘর যার মধ্যে একটি ঘর হারাণের। বোঝা গেল আঁটঘাট আগে থেকে বাঁধাই ছিল।

ভেতরের খবর পেয়ে এসেছে।

খবর পেয়ে এসেছে মানেই খবর দিয়েছে কেউ। আজ বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে, হঠাৎ সন্ধ্যার পরে তাকে অতিথি করে ঘরে নিয়ে গেছে হারাণের মেয়ে ময়নার মা, তার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল না কোন পাড়ায় কার ঘরে সে থাকবে। খবর তবে গেছে ভুবন হারাণের ঘরে যাবার পরে। এমনও কি কেউ আছে তাদের এ গাঁয়ে? শীতের তে-ভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষীদের, জানা যাবেই, এ বজ্জাতি গোপন থাকবে না।

দাঁতে দাঁত ঘসে গফুরালী বলে, 'দেইখা লমু কোন হালা পিঁপড়ার পাখা উঠছে। দেইখা লমু।'

ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না সালিগঞ্জ গাঁ থেকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে ভুবন এতদিন গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্টকে কলা দেখিয়ে, কোনও গাঁয়ে সে ধরা পড়েনি। সালিগঞ্জ থেকে তাকে পুলিস নিয়ে যাবে? তাদের গাঁয়ের কলঙ্ক তারা সইবে না। ধান দেবে না বলে কবুল করেছে জান, সে জানটা দেবে এই আপনজনটার জন্যে।

শীতে আর ঘুমে অবশপ্রায় দেহগুলি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। লাঠি সড়কি দা কুড়ুল বাগিয়ে চাষীরা দল বাঁধতে থাকে। সালিগঞ্জে মাঝরাতে আজ দেখা দেয় সাংঘাতিক সম্ভাবনা।

গোটা আষ্টেক মশাল পুলিস সঙ্গে এনেছিল, তিন চারটে টর্চ। হাঁসখালি পাড়া ঘিরতে ঘিরতে দপ দপ করে মশালগুলি তারা জ্বেলে নেয়। দেখা যায় সব সশস্ত্র পুলিস, কানাই ও শ্রীপতির হাতেও দেশী বন্দুক।

পাড়াটা চিনলেও কানাই বা শ্রীপতি হারাণের বাড়িটা ঠিক চিনত না। সামনে রাখালের ঘর পেয়ে ঝাঁপ ভেঙে তাকে বাইরে আনিয়ে রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথকে তাই জিজ্ঞেস করতে হয়, 'হারাণ দাসের কোন বাড়ি?'

তার পাশের বাড়ির হারাণ ছাড়াও যেন কয়েক গণ্ডা হারাণ আছে গাঁয়ে। বোকার মতো রাখাল পাল্টা প্রশ্ন করে—'আজ্ঞা, কোন্ হারাণ দাসের কথা কন্?'

গালে একটা চাপড় খেয়েই এমন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রাখাল, দম আটকে আটকে এমন সে ঘন ঘন উকি তুলতে থাকে যে, তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাই অনর্থক হয়ে যায় তখনকার মতো। বোবা হাবা চাষাগুলো শুধু বেপরোয়া নয়, একেবারে তুখোড় হয়ে উঠেছে চালাকিবাজীতে।

এদিকে হারাণ বলে, 'হায় ভগবান।'

ময়নার মা বলে, 'তুমি উঠলা কেন কও দিকি?'

বলে কিন্তু জানে যে তার কথা কানে যায়নি বুড়োর। চোখে যেমন কম দেখে, কানেও তেমনি কম শোনে হারাণ। কি হয়েছে ভাল বুঝতেও বোধ হয় পারেনি, শুধু বাইরে একটা গণ্ডগোল টের পেয়ে ভড়কে গিয়েছে। ছেলে আর মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে চটপট, এই বুড়োকে বোঝাতে গেলে এত জোরে চেঁচাতে হবে যে প্রত্যেকটি কথা কানে পৌছবে বাইরে যারা বেড় দিয়েছে। দু-এক দণ্ড চেঁচালেই যে বুঝবে হারাণ তাও নয়, তার ভোঁতা ঢিমে মাথায় অত সহজে কোনও কথা ঢোকে না। এই বুড়োর জন্য না ফাঁস হয়ে যায় সব।

ভুবনকে বলে ময়নার মা, 'বুড়া বাপটার তরে ভাবনা!'

ভুবন বলে, 'মোর কিন্তু হাসি পায় ময়নার মা।' ময়নার মা গম্ভীর মুখে বলে, 'হাসির কথা না। গুলিও করতে পারে। দেখন মাত্তর। কইবো হাঙ্গামা করছিলেন।' তাড়াতাড়ি একটা কুপি জ্বালে ময়নার মা। হারাণকে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙুলের ইশারায় তাকে মুখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে। তারপর কুপির আলোয় মেয়ের দিকে নিদারুণ আপসোসে ফুঁসে ওঠে, 'আঃ! ভাল শাড়িখান পরতে পারলি না?'

'বলছ নাকি?' ময়না বলে।

ময়নার মা নিজেই টিনের তোরঙ্গের ডালাটা প্রায় মুচড়ে ভেঙে তাঁতের রঙীন শাড়িখানা বার করে। ময়নার পরণের ছেঁড়া কাপড়খানা তার গা থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এলোমেলো ভাবে জড়িয়ে দেয় রঙীন শাড়িটি।

বলে, 'ঘোমটা দিবি। লাজ দেখাবি। জামায়ের কাছে যেমন দেখাস।' ভুবনকে বলে, 'ভাল কথা শোনেন, আপনার নাম হইল জগমোহন, বাপের নাম সাতকড়ি। বাড়ি হাতিপাড়া, থানা গৌরপুর।'

নতুন এক কোলাহল কানে আসে ময়নার মার। কান খাড়া করে সে শোনে। কুপির আলোতেও টের পাওয়া যায় প্রৌঢ় বয়সের শুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখ দুর্দশার ছাপ ও রেখা কি রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে। ধুতি পরা বিধবার বেশ আর কদমছাঁটা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুষালী ভাব।

'গাঁ ভাইঙ্গা রুইখা আইতেছে। তাই না ভাবতেছিলাম ব্যাপার কি, গাঁর মাইনষের সাড়া নাই।'

ভুবন বলে, 'তবেই সারছে। দশবিশটা খুন জখম হইব নির্ঘাত। আমি যাই, সামলাই গিয়া।'

'থামেন আপনে, বসেন', ময়নার মা বলে, 'দ্যাখেন কি হয়।'

শ'দেড়েক চাষী চাষাড়ে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে দল বেঁধে। ওদের আওয়াজ পেয়ে মন্মথও জড়ো করেছে তার ফৌজ হারাণের ঘরের সামনে—দু-চারজন শুধু পাহারায় আছে বাড়ির পাশে পিছনে, বেড়া ডিঙিয়ে ওদিক দিয়ে ভুবন না পালায়। দশটি বন্দুকের জোর মন্মথের, তার নিজের রিভলভার আছে। তবু চাষীদের মরিয়া ভাব দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছে স্পষ্টই বোঝা যায়। তার সুরটা রীতিমতো নরম শোনায়—স্রেফ হুকুমজারির বদলে সে যেন একটু বুঝিয়ে দিতে চায় সকলকে উচিত আর অনুচিত কাজের পার্থক্যটা, পরিণামটাও।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে সে জানায় যে, হাকিমের দস্তখতী পরোয়ানা নিয়ে সে এসেছে হারাণের ঘর তাল্লাস করতে। তাল্লাস করে আসামী না পায়, ফিরে চলে যাবে। এতে বাধা দেওয়া হাঙ্গামা করা উচিত নয়, তার ফল খারাপ হবে। বে-আইনী কাজ হবে সেটা।

গফুর চেঁচিয়ে বলে, 'মোরা তাল্লাস করতে দিমু না।'

প্রায় দুশো গলা সায় দেয়, 'দিমু না!'

এমনি যখন অবস্থা, সংঘর্ষ প্রায় শুরু হয়ে যাবে, মন্মথ হুকুম দিতে যাচ্ছে গুলি চালাবার, ময়নার মার খ্যানখেনে তীক্ষ্ণ গলা শীতার্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল, 'রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোন আসামী নাই। চোর ডাকাইত নাকি যে ঘরে আসামী রাখুম? বিকালে জামাই আইছে, শোয়াইছি মাইয়া জামাইরে। দারোগাবাবু তাল্লাস করতে চান, তাল্লাস করেন।'

মন্মথ বলে, 'ভুবন মণ্ডল আছে তোমার ঘরে।'

ময়নার মা বলে, 'দ্যাখেন আইসা, তাল্লাস করেন। ভুবন মণ্ডল কেডা? নাম তো শুনি নাই বাপের কালে। মাইয়ার বিয়া দিলাম বৈশাখে, দুই ভরি রূপা কম দিছি ক্যান, জামাই ফিরা৷ তাকায় না। দুই ভরির দাম পাঠাইয়া দিছি তবে আইজ জামাই পায়ের ধুলা দিছে। আপ্নারে কমু কি দারোগাবাবু মাইয়াটা কাইন্দা মরে। মাইয়া যত কান্দে, আমি তত কান্দি—'

'আচ্ছা, আচ্ছা'—মন্মথ বলে, 'ভুবনকে না পাই, জামাই নিয়ে তুমি রাত কাটিও।

গৌর সাউ হেঁকে বলে, 'অত চুপে চুপে আসে কেন জামাই, ময়নার মা?'

গা জ্বলে যায় ময়নার মার। বলে, 'সদর দিয়া আইছে। তোমার একটা মাইয়ার সাতটা জামাই। চুপে চুপে আসে, মোর জামাই সদর দিয়া আইছে!'

গৌর আবার কি বলতে যাচ্ছিল, কে যেন আঘাত করে তার মুখে। একটা আর্ত শব্দ শুধু শোনা যায়, সাপেধরা ব্যাঙের একটি মাত্র আওয়াজের মতো।

ময়নার রঙীন শাড়ি ও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মন্মথের, পিচুটির মতো চোখে এঁটে যেতে চায় ঘোমটা পরা ভীরু লাজুক কচি চাষী মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা। বি. এ. পাশ মন্মথের কাছে, যেন চোরাই স্কচ হুইস্কির পেগ, যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে একফোঁটা টসটসে দরদ। তার রীতিমতো আপসোস হয় যে যোয়ান মর্দ মাঝবয়সী চাষাড়ে লোকটা এর স্বামী, ওর আদরেই মেয়েটার এই আলুথালু বেশ!

তবু মন্মথ জেরা করে, সংশয় মেটাতে গাঁয়ের দুজন বুড়োকে এনে সনাক্ত করায়। তার পরেও যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না! ভুবন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে যতটা সম্ভব নিরীহ গোবেচারী সেজে। কিন্তু খোঁচা খোঁচা গোঁপদাড়ি ভরা মুখ, রুক্ষ এলোমেলো একমাথা চুল, মোটেই তাকে দেখায় না নতুন জামায়ের মতো। মন্মথ গর্জন করে হারাণকে প্রশ্ন করে, 'এ তোমার নাতনীর বর?'

হারাণ বলে, 'হায় ভগবান!'

ময়নার মা বলে, 'জিগান মিছা, কানে শোনে না, বদ্ধ কালা।'

'আ!' মন্মথ বলে।

ভুবন ভাবে এবার তার কিছু বলা বা করা উচিত।

'এমন হাঙ্গামা জানলে আইতাম না কর্তা। মিছা কইয়া আনছে আমারে। সড়াইলের হাটে আইছি, ঠাইরেন পোলারে দিয়া খপর দিলেন, মাইয়া নাকি মর মর, তখন যায় এখন যায়।'

'তুমি অমনি ছুটে এলে?'

'আসুম না? রত্তিভরি সোনারূপা যা দিব কইছিল, তাও ঠেকায় নাই বিয়াতে। মইরা গেলে গাও থেইকা খুইলা নিলে আর পামু?'

'ওঃ! তাই ছুটে এসেছ? তুমি হিসেবী লোক বটে।' মন্মথ বলে ব্যঙ্গ করে। আর কিছু করার নেই, বাড়িগুলি তাল্লাস ও তছনছ করে নিয়ম রক্ষা করা ছাড়া। জামাইটাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া চলে সন্দেহের যুক্তিতে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু হাঙ্গামা হবে। দুপা পিছু হটে এখনো চাষীর দল দাঁড়িয়ে আছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায়নি। গাঁয়ে গাঁয়ে চাষাগুলোর কেমন যেন উগ্র মরিয়া ভাব, ভয় ডর নেই। ঘরে ঘরে তাল্লাস চলতে থাকে। একটা বিড়াল লুকানোর মতো আড়ালও যে ঘরে নেই, সে ঘরেও কাঁথাকলি হাঁড়িপাতিল জিনিসপত্র ছত্রখান করে খোঁজা হয় মানুষকে।

মন্মথ থাকে হারাণের বাড়িতেই। অল্প নেশায় রঙীন চোখ। এ সব কাজে বেরোতে হলে মন্মথ অল্প নেশা করে, মাল সঙ্গে থাকে কর্তব্য সমাপ্তির পর টানবার জন্য—চোখ তার রঙীন শাড়ি জড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। কুরিয়ে কুরিয়ে তাকায় ময়নার কুড়ি বাইশ বছরের যোয়ান ভাইটা, উসখুস করে ক্রমাগত। ভুবনের চোখ জ্বলে ওঠে থেকে থেকে। ময়নার মা টের পায়, একটু যদি বাড়াবাড়ি করে মন্মথ, আর রক্ষা থাকবে না!

মেয়েটাকে বলে ময়নার মা, 'শীতে কাঁপুনি ধরেছে, শো না গিয়া বাছা? তুমিও শুইয়া পড় বাবা। আপনে অনুমতি দ্যান দারোগাবাবু, জামাই শুইয়া পড়ুক। কত মানত কইরা, মাথা কপাল কুইটা আনছি জামাইরে'—ময়নার মার গলা ধরে যায়, 'আপনারে কি কমু দারোগাবাবু—'

ময়না ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভুবন যায় না।

আরও দুবার ময়নার মা সস্নেহে সাদর অনুরোধ জানায় তাকে, তবু ভুবনকে ইতস্তত করতে দেখে বিরক্ত হয়ে জোর দিয়ে বলে, 'গুরুজনের কথা শোন, শোও গিয়া। খাড়াইয়া কি করবা? ঝাঁপ বন্ধ কইরা শোও।'

তখন তাই করে ভুবন। যতই তাকে জামাই মনে না হোক, এরপর না মেনে কি আর চলে যে সে জামাই? মন্মথ আস্তে আস্তে বাইরে পা বাড়ায়। পকেট থেকে চ্যাপ্টা শিশি বার করে ঢেলে দেয় গলায়।

পরদিন মুখে মুখে এ গল্প ছড়িয়ে যায় দিগ্‌দিগন্তে, দুপুরের আগে হাত্তিপাড়ার জগমোহন আর জোতদার চণ্ডী ঘোষ আর বড় থানার বড় দারোগার কাছে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। গাঁয়ে গাঁয়ে লোকে বলাবলি করে ব্যাপারটা আর হাসিতে ফেটে পড়ে, বাহবা দেয় ময়নার মাকে! এমন তামাসা কেউ কখনো করেনি পুলিসের সঙ্গে, এমন জব্দ করেনি পুলিসকে। কদিন আগে দুপুরবেলা পুরুষশূন্য গাঁয়ে পুলিস এলে ঝাঁটা বঁটি হাতে মেয়ের দল দিয়ে ময়নার মা তাদের তাড়া করে পার করে গিয়েছিল গাঁয়ের সীমানা। সে যে এমন রসিকতাও জানে কে তা ভাবতে পেরেছিল?

গাঁয়ের মেয়েরা আসে দলে দলে, অনিশ্চিত আশঙ্কা ও সম্ভাবনায় ভরা এমন যে ভয়ঙ্কর সময় চলেছে এখন, তার মধ্যেও তারা আজ ভাবনা চিন্তা ভুলে হাসিখুশিতে উচ্ছল।

মোক্ষদার মা বলে একগাল হেসে গালে হাত দিয়ে, 'মাগো মা ময়নার মা তোর মদ্যি এত?'

ক্ষেন্তি বলে ময়নাকে, 'কিলো ময়না, জামাই কি কইলো? দিছে কি?'

লাজে ময়না হাসে।

বেলা পড়ে এলে, কাল যে সময় ভুবন মণ্ডল গাঁয়ে পা দিয়েছিল প্রায় সেই সময়, আবির্ভাব ঘটে জগমোহনের। বয়স তার ছাব্বিশ সাতাশ, বেঁটে খাটো যোয়ান চেহারা, দাড়ি কামানো, চুল আঁচড়ানো। গায়ে ঘরকাচা সার্ট, কাঁধে মোটা সুতির সাদা চাদর। গাঁয়ে ঢুকে গটগট করে সে চলতে থাকে হারাণের বাড়ির দিকে, এপাশ ওপাশ না তাকিয়ে, গম্ভীর মুখে।

রসিক ডাকে দাওয়া থেকে 'জগমোহন নাকি? কখন আইলা?'

নন্দ বলে, 'আরে শোন, শোন, তামুক খাইয়া যাও।'

জগমোহন ফিরেও তাকায় না।

রসিক ভড়কে গিয়ে নন্দকে শুধোয়, 'কি কাণ্ড বুঝলা নি?'

'কেমনে কমু?'

অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দুজনে।

পথে মথুরের ঘর। তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা আছে জগমোহনের। নাম ধরে হাঁক দিতে ভেতর থেকে সাড়া আসে না, বাইরের লোক জবাব দেয়। ঘরের কাছেই পথের ওপাশে একটা তালের গুঁড়িতে দুজন মানুষ বসে ছিল নির্লিপ্তভাবে, একজনের হাতে খোঁটা শুদ্ধ গরু-বাঁধা দড়ি।

তাদের একজন বলে, 'বাড়িতে নাই। তুমি কেডা, হারামজাদাটারে খোঁজ ক্যান?' জগমোহন পরিচয় দিতেই দুজনে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

'অ! তুমিও আইছ ব্যাটারে দুই ঘা দিতে?'

তা ভয় নেই জগমোহনের, তারা আশ্বাস দেয়, হাতের সুখ তার ফসকাবে না। কাল সন্ধ্যায় গেছে গাঁ থেকে, এখনো ফেরেনি মথুর, কখন ফিরে আসে ঠিকও নাই, তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না জগমোহনকে! মথুর ফিরলে তাকে যখন বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে বিচারের জন্য, সে খবর পাবে। সবাই মিলে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলার আগে তাকেই নয় সুযোগ দেওয়া হবে মথুরের নাক কানটা কেটে নেবার, সে ময়নার মার জামাই, তার দাবি সবার আগে।

'শাউড়ি পাইছিলা দাদা একখান!'

'নিজের হইলে বুঝতা।' জগমোহন জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে, চলতে আরম্ভ করে। শুনে দুজনে তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অবাক হয়ে।

আচমকা জামাই এল, মুখে তার ঘন মেঘ। দেখেই ময়নার মা বিপদ গনে। ব্যস্তসমস্ত না হয়ে হাসিমুখে ধীরে শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানায়, তার যেন আশা ছিল, জানা ছিল, এ সময় এমনি ভাবে জামাই আসবে, এটা অঘটন নয়। বলে, 'আস বাবা আস। ও ময়না, পিড়া দে। ভাল নি আছে বেবাকে? বিয়াই বিয়ান পোলামাইয়া?'

'আছে।'

আরেকটুকু ভড়কে যায় ময়নার মা। কত গোসা না জমা আছে জামাইয়ের কাটা ছাঁটা এই কথার জবাবে। ময়নার দিকে তার না-তাকাবার ভঙ্গিটাও ভাল ঠেকে না। পড়ন্ত রোদে লাউমাচার সাদা ফুলের শোভা ছাড়া আর কিছুই যেন চোখ চেয়ে দেখবে না শ্বশুরবাড়ির পণ করেছে জগমোহন? লক্ষণ খারাপ।

ঘর থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় হারাণ হাঁকে, 'আসে নাই? হারামজাদা আসে নাই? হায় ভগবান!'

'নাতিরে খোঁজে', ময়নার মা জগমোহনকে জানায়, 'বিয়ান থেইকা দ্যাখে না, উতলা হইছে।'

ময়নার মা প্রত্যাশা করে যে নাতিকে হারাণ সকাল থেকে কেন দ্যাখে না, কি হয়েছে হারাণের নাতির, ময়নার ভায়ের, জানতে চাইবে জগমোহন কিন্তু কোন খবর জানতেই এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না তার।

'খাড়াইয়া রইলা ক্যান? বস বাবা বস।'

জগমোহন বসে। ময়নার পাতা পিঁড়ি সে ছোঁয় না, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসে।

'মুখ হাত ধুইয়া নিলে পারতা।'

'না, যামু গিয়া অখনি।'

'অখনি যাইবা?'

'হ। একটা কথা শুইনা আইলাম। মিছা না খাঁটি জিগাইয়া যামু গিয়া। মাইয়া নাকি কার লগে শুইছিল কাইল রাইতে?'

'শুইছিল?' ময়নার মার চমক লাগে, 'মোর লগে শোয় মাইয়া, মোর লগে শুইছিল, কার লগে শুইব?'

'ব্রহ্মাণ্ডের মাইনষে জানছে কার লগে শুইছিল। চোখে দেইখা গেছে দুয়ারে ঝাঁপ দিয়া কার লগে শুইছিল।'

তারপর বেধে যায় শাশুড়ী-জামায়ে। প্রথমে ময়নার মা ঠাণ্ডা মাথায় নরম কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু জগমোহনের ওই এক গোঁ! ময়নার মাও শেষে গরম হয়ে ওঠে। বলে, 'তুমি নিজে মন্দ, অন্যেরে তাই মন্দ ভাব। উঠানে মাইনষের গাদা, আমি খাড়া সামনে, এক দণ্ড ঝাঁপটা দিছে কি না দিছে, তুমি দোষ ধরলা। অন্যে ত কয় না।'

'অন্যের কি? অন্যের বৌ হইলে কইতো।'

'বড় ছোট মন তোমার। আইজ মণ্ডলের নামে এমন কথা কইলা, কাইল কইবা যুয়ান ভায়ের লগে ক্যান কথা কয়।'

'কওন উচিত। ও মাইয়া সব পারে।' শুধু গরম কথা নয়, ময়নার মা গলা ছেড়ে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগমোহনের চোদ্দপুরুষ। হারাণ কাঁপা গলায় চেঁচায়, 'আইছে নাকি? আইছে হারামজাদা? হায় ভগবান, আইছে? ময়না কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছুটে আসে পাড়াবেড়ানি নিন্দাছড়ানি নিতাই পালের বৌ আর প্রতিবেশী কয়েকজন স্ত্রীলোক।

'কি হইছে গো ময়নার মা?' নিতাই পালের বৌ শুধায়, 'মাইয়া কাঁদে ক্যান?'

তাদের দেখে সম্বিৎ ফিরে পায় ময়নার মা, ফোঁস করে ওঠে— 'কাঁদে ক্যান? ভাইটারে ধইরা নিছে, কাঁদব না?'

'জামাই বুঝি আইছে খবর পাইয়া?'

'শুনবা বাছা শুনবা। বইতে দাও, জিরাইতে দাও।'

ময়নার মার বিরক্তি দেখে ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে মেয়েরা ফিরে যায়। তাকে ঘাঁটাবার সাহস কারো নেই। ময়নার মা মেয়েকে ধমক দেয়, 'কাঁদিস না। বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করছিলি, কাঁদনের কি?'

'বাপ নাকি?' জগমোহন বলে ব্যঙ্গ করে।

'বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান। তোমারে কই জগু, হাতে ধইরা কই বুইঝা দ্যাখো, মিছা গোসা কইরো না।'

'বুইঝা কাম নাই। অখন যাই।'

'রাইতটা থাইকা যাও। জামাই আইলা, গেলা গিয়া, মাইনষে কি কইব?'

'জামায়ের অভাব কি। মাইয়া আছে, কত জামাই জুটবো।'

বেলা শেষ হতে না হতে ঘনিয়ে এসেছে শীতের সন্ধ্যা। অল্প অল্প কুয়াশা নেমেছে। ঘুঁটের ধোঁয়া ও গন্ধে নিশ্চল বাতাস ভারি। যাই বলেই যে গা তোলে জগমোহন তা নয়। ময়নার মারও তা জানা আছে যে, শুধু শাশু[illegible] ঝগড়া করে যাই বলেই জামাই গট গট করে বেরিয়ে যাবে না। ময়নার সাথে বোঝাপড়া, ময়নাকে কাঁদানো, এখনো বাকি আছে। যদি যায় জামাই, মেয়েটাকে নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়ে তারপর যাবে। আর কথা বলে না ময়নার মা, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ঘরে কিছু নেই, মোয়ামুড়ি কিছু যোগাড় করতে হবে। খাক না খাক সামনে ধরে দিতেই হবে জামায়ের।

চোখ মুছে নাক ঝেড়ে ময়না বলে ভয়ে ভয়ে, 'ঘরে আস।'

'খাসা আছি। শুইছিলা তো?'

'না, মা কালীর কিরা, শুই নাই, মায় কওনে খালি ঝাঁপটা দিছিলাম, বাঁশটাও লাগাই নাই।'

ঝাঁপ দিছিলা, শোও নাই। বেউলা সতী!'

ময়না তখন কাঁদে।

'তোমার লগে আইজ থেইকা শেষ।'

ময়না আরও কাঁদে।

ঘর থেকে হারাণ কাঁপা গলায় হাঁকে, 'আসে নাই? ছোঁড়া আসে নাই? হায় ভগবান।'

থেমে থেমে এক একটা কথা বলে যায় জগমোহন, না থেমে অবিরাম কেঁদে চলে ময়না, যতক্ষণ না কান্নাটা একঘেয়ে লাগে জগমোহনের, তখন কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে। মুড়িমোয়া যোগাড় করে পাড়া ঘুরে ময়নার মা যখন ফিরে আসে, ময়না তখন চাপা সুরে ডুকরে কাঁদছে। বেড়ার বাইরে সুপারি গাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দুচোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সাথে, দারোগা পুলিসের সাথে লড়াই করা চলে, অবুঝ পাষণ্ড জামাইয়ের সাথে লড়াই নেই!

আপন মনে আবার হাঁকে হারাণ, 'আসে নাই? মোর মরণটা আসে নাই? হায় ভগবান।'

জগমোহন চুপ করে ছিল, এতক্ষণ পরে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে শালার খবর।—'উয়ারে ধরছে ক্যান?'

ময়নার কান্না থিতিয়ে এসেছিল, সে বলে, 'মণ্ডলখুড়ার লগে গোঁদলপাড়া গেছিল, ফিরতি পথে একা পাইয়া ধরছে।'

"ক্যান ধরছে?'

'কাইল জব্দ হইছে, সেই রাগে বুঝি?'

বসে বসে কি ভাবে জগমোহন, আর কাঁদায় না ময়নাকে। ময়নার মা ভেতরে আসে, কাঁসিতে মুড়ি আর মোয়া খেতে দেয় জামাইকে, বলে, 'মাথা খাও, মুখে দাও।'

আবার বলে, 'রাইত কইরা ক্যান যাইবা বাবা? থাইকা যাও।'

'থাকনের যো নাই। মা দিব্যি দিছে।'

'তবে খাইয়া যাও? আখা ধরাই? পোলাটারে ধইরে নিছে, পরাণডা পোড়ায়। তোমারে রাইখা জুড়ামু ভাবছিলাম।'

'না, রাইত বাড়ে।'

'আবার কবে আইবা?'

'দেখি।'

উঠি উঠি করেও দেরি হয়। তারপর আজ সন্ধ্যারাতেই পুলিস হানার সেইরকম সোর ওঠে কাল মাঝরাত্রির মতো। সদলবলে মন্মথ আবার আচমকা হানা দিয়েছে। আজ তার সঙ্গের শক্তি কালের চেয়ে অনেক বেশী। তার চোখ সাদা।

সোজাসুজি প্রথমেই হারাণের বাড়ি।

'কি গো মণ্ডলের শাশুড়ী,' মন্মথ বলে ময়নার মাকে, 'জামাই কোথা?'

ময়নার মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'এটা আবার কে?'

'জামাই।' ময়নার মা বলে।

'বাঃ তোর তো মাগী ভাগ্যি ভাল, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে! আর তুই ছুঁড়ী এই বয়সে—'

হাতটা বাড়িয়েছিল মন্মথ রসিকতার সঙ্গে ময়নার থুতনি ধরে আদর করে একটু নেড়ে দিতে। তাকে পর্যন্ত চমকে দিয়ে জগমোহন লাফিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে গর্জে ওঠে, 'মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন!'

বাড়ির সকলকে, বুড়ো হারাণকে পর্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামী নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মতো না হলেও লোক মন্দ জমেনি। দলে দলে লোক ছুটে আসছে চারিদিক থেকে, জমায়েত মিনিটে মিনিটে বড় হচ্ছে। মথুরার ঘর পার হয়ে পানা পুকুরটা পর্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালের চেয়ে সাত আট গুণ বেশী লোক পথ আটকায়। রাত বেশী হয়নি, শুধু এগাঁয়ের নয়, আশপাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারেনি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বুঝা যেত, হারাণের বাড়ির লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে! মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।

ময়না তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়েই রক্ত মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে জগমোহনের। নব্বই বছরের বুড়ো হারাণ সেইখানে মাটিতে মেয়ের কোলে এলিয়ে নাতির জন্য উতলা হয়ে কাঁপা গলায় বলে, 'ছোঁড়া গেল কই? কই গেল? হায় ভগবান!'

তেভাগার লড়াই

ভাগচাষীর সমস্যা : ভাগচাষী ও গ্রামের অর্থনীতি

বাংলার গ্রামাঞ্চলে সমগ্র সমাজ, অর্থনীতি ও কৃষিব্যবস্থায় ভাগচাষীর সমস্যাই আজ সবচেয়ে প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাগচাষীর দুর্গতি নূতন নয়। সেই দুর্গতির বিরুদ্ধে ভাগচাষীর লড়াইও একেবারে নূতন নয়। কিন্তু বর্তমানের কৃষকের মধ্যে ভাগচাষীর সংখ্যা সাংঘাতিক বাড়িয়া গিয়াছে ; তাহাদের জীবন একেবারেই দুঃসহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষিব্যবস্থা ধ্বংসপ্রায় ; চিরন্তন দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আক্রমণে সমস্ত বাঙ্গালী সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন। তাই আজ বাংলার নানা জেলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাগচাষীরা বাঁচিবার জন্য লড়াই শুরু করিয়া দিয়াছে। সারা বাংলা জুড়িয়া আধিয়ারের আওয়াজ উঠিয়াছে 'তেভাগা চাই।' নিজেদের সংগ্রামের জোরে ভাগচাষীরা আজ তাহাদের দাবী জনসাধারণের বিচারালয়ে হাজির করিয়াছে; আজ আর তাহাদের সমস্যা উপেক্ষা করার উপায় নাই।

কিন্তু ভাগচাষীর দাবী সম্পর্কে বিচার করিবার জন্য তাহাদের জীবন সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান না থাকিলে চলে না, তাহা সকলের আছে কিনা বলা কঠিন। কিছুদিন আগে জমিদারী প্রথা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একজন দেশকর্মী বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বর্গাদার কাহাকে বলে'। অগণিত দেশপ্রেমিক পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তির জন্য জীবন বলি দিয়াছেন, যে কোন মূল্যে স্বাধীনতার জন্য সারা জীবন তপস্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই পরাধীনতা কৃষকের জীবনে শোষণ চালাইয়া কেমন করিয়া আমাদের সোনার বাংলাকে শ্মশান করিতেছে সেদিকে উপযুক্ত দৃষ্টির অভাব বাংলার গৌরবময় স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি বড় দুর্বলতা। আজ শুধু আধিয়ার নয় ; মজুর, আধিয়ার, কৃষক ও মধ্যবিত্ত লইয়া গঠিত গ্রামের বৃহৎ সমাজ নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে ; এখনও যদি সমগ্র বাংলা গ্রাম-জীবনের সমস্যা সমাধানে অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর মানচিত্র হইতে বাংলার অস্তিত্ব

একেবারে মুছিয়া যাইবে। যে কৃষক সাধারণত নিজের লাঙ্গল-গরু দিয়া নিজের খরচায় অপরের জমি চাষ, বপন, কাটাই ও মাড়াই করিয়া উৎপন্ন ফসলের একটা ভাগ জমির মালিককে দেন এবং অবশিষ্ট অংশ নিজে লইয়া থাকেন, তাহাকেই ভাগচাষী বা বর্গাদার বলে। বর্গাদার সাধারণত জমির মালিককে উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ দিতে বাধ্য হন, তাই বর্গাদার বা ভাগচাষীর অপর প্রচলিত নাম আধিয়ার; এই প্রথাকেই বলে আধিপ্রথা। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে উৎপন্ন ফসলের বারোভাগের এক ভাগ বা আটভাগের বা ছয়ভাগের একভাগ রাজস্ব ধার্য হইত। পাঠান ও মোগল বাদশাহদের আমলেও অধিকাংশ সময়ে ঐ আইন বহাল ছিল। সে সময়ে চাষীই ছিল জমির মালিক; সাধারণ চাষীর জমি হইতে উৎখাত হওয়ার ভয় ছিল না। কিন্তু আধিপ্রথায় ভাগচাষীর জমিতে কোন স্বত্ব নাই ; অথচ নিজের মেহনতে নিজের খরচায় ফসল তৈয়ার করিয়া অকৃষক জমির মালিককে সে অর্ধেক ভাগ দিতে বাধ্য হয়! আধিপ্রথা যে কত বড়ো অন্যায় নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রথা তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়। আজ যে জমিকে আধিয়ার বুকের রক্ত জল করিয়া আবাদের যোগ্য করিয়া তোলে, শক্ত হাতে লাঙলের মুঠা ধরিয়া যে মাটির বুকে সে সোনার ফসল তৈয়ার করে, কাল সেই জমি হইতে সে বিতাড়িত হয়। চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে আবার তাহাকে নূতন জমির জন্য নূতন জমিদার বা জোতদারের দুয়ারে ধর্না দিতে হয়। তাহা ছাড়া অতিরিক্ত সুদ, নানারকম বেআইনী ও বাজে আদায়, জমির মালিকের অন্যায় জুলুম, এসব তো ভাগচাষীর জীবনের চিরসাথী। কিন্তু গত যুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যে ভাগচাষীর সমস্যা যে কত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে, তাহার জীবন যে কি রকম দুর্বিষহ হইয়া পড়িয়াছে, ভাগচাষীর সমস্যা আজ কিভাবে সারা বাংলার সকল স্তরের মানুষের সব চেয়ে বড়ো সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে বাংলার বিভিন্ন অংশে ভাগচাষীরা কিভাবে জীবন কাটাইতেছে তাহা দেখিতে হইবে।

উত্তরবঙ্গের আধিয়ার

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বড় বড় জোতদারের সংখ্যাও বেশী আবার আধিয়ারের সংখ্যাও বেশী। পাঁচ হাজার, দশ হাজার বা পনের হাজার বিঘা জমি আছে, এরূপ জোতদারের সংখ্যা এ অঞ্চলে একেবারে কম নয়। অপরপক্ষে রংপুর জেলার শতকরা ৭২ জন, বগুড়ার শতকরা ৬৪ জন, পাবনা জেলার শতকরা ৫৫ জন আজ ভাগচাষীতে পরিণত হইয়াছে।* ভূমিরাজস্ব কমিশনের হিসাবমত ১৯৩৯ সালে জলপাইগুড়ি জেলায় শতকরা ২৬টি পরিবারের জীবিকা ছিল ভাগচাষ, আর আজ ইহাদের সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বাড়িয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা কৃষক সমিতির হিসাবে শতকরা ৭৫ হইতে ৮০টি চাষী পরিবার আজ আধিয়ার।

এ বৎসর এই সব জেলার আধিয়ারেরা সর্বস্বান্ত হইতেছে, অনাহারে ও দুর্ভিক্ষে উজাড় হইয়া যাইতেছে। জলপাইগুড়ির কথাই ধরা যাক। ফসল উৎপাদনের দিক দিয়া জলপাইগুড়ি বাড়তি জেলা। তবুও গত জুলাই মাস হইতেই এখানকার ভাগচাষীরা উপবাসী থাকিতেছে, অনাহারে মরিতেছে। ঐ সময়ে বোদা ও পচাগড় থানার কয়েকটি গ্রামে যাই। প্রতি গ্রামে গড়ে দুই শত পরিবার। তার মধ্যে চার পাঁচটি পরিবার জোতদার ও ১২ হইতে ১৫টি পরিবার স্বচ্ছল চুকানদার (এখানে রায়তকে চুকানদার বলে, ইহাদের ১৫ হইতে ৩০ বিঘা জমি আছে)। আর সকলেই গরীব-চুকানদার, আধিয়ার ও মজুর। গড়ে দেড়শ পরিবার কমবেশী জমি ভাগে চাষ করে। ফসলের আধাভাগ ছাড়াও, গদী সেলামী, খলিয়ান ঝাড়ানি প্রভৃতি পাঁচ সাত রকম আবওয়াব জমির মালিক ইহাদের কাছ হইতে আদায় করে।

পচাগড় থানার পানিমাছ পুকুরিয়া গ্রামে বসিয়া ইহাদের কাহিনী শুনিতেছি ; দেখিলাম মাঠের আইলের উপর দিয়া একটি কঙ্কালসার চাষী একটি স্ত্রীলোকের সাথে চলিয়াছে। তাহাকে ডাকিলাম ; কিন্তু সে আসিল না, কথাও কহিল না। কৌতূহলী হইয়া তাহার বাড়ীতে গেলাম। আগে তাহার অবস্থা চলনসই ছিল। কিন্তু তেরশ পঞ্চাশ সালের মন্বন্তরের বছর জমি বেচিয়া পেট চালাইতে হইল। সে ছিল চুকানদার, হইল আধিয়ার। কাল যে জমি তাহার নিজের ছিল আজ সেই জমিতেই সে হইল আধিয়ার। আধাভাগে সংসার চলে না, জোতদারের কাছ হইতে গত বছর পর্যন্ত ক্ষেতে চাষ দিবার পর দেড়াবাড়িতে (অর্থাৎ আষাঢ় মাসে একমণ বীজ কর্জ লইলে পৌষমাসে দেড়মণ শোধ দিতে হয়) কর্জ মিলিয়াছিল। এবারও কর্জ দরকার হয়। কিন্তু জোতদার মহম্মদ আফি মিঞা এবার বিনা বন্ধকে, বা জমির দলিল করিয়া না দিলে কর্জ দিতে অস্বীকার করিয়াছে। প্রথমে দুই-একটা পিতল কাঁসা বন্ধক দিয়াছে, তারপর জোতদার তাহার গরু তিনটি বন্ধক রাখ বলিয়া হস্তগত করিয়াছে ; বলিয়াছে, যত ধান কর্জ লইবে, তাহার দর দিতে হইবে মণ প্রতি ১২ টাকা। পাঁচ মণ ধান কর্জ লইলে কর্জের পরিমাণ ধরা হইবে ৩০ টাকা। ধান উঠিলে ধানের দাম সস্তা হইয়া যাইবে, তখন এই ৯০ টাকা দামের পরিমাণে ধান দিতে হইবে। তখন যদি ধানের দর মণকরা ৬ টাকা হয়, তাহা হইলে ১৫ মণ ধান দিলে তবে ৫ মণ ধানের দেনা শোধ হইবে। অর্থাৎ ৫ মণ ধানে ছয়মাসে ১০ মণ সুদ দিতে হইবে ; পেটের দায় বড় দায়। তাই এই কঠোর চুক্তিতেই (ইহাকে কড়ালি প্রথা বলে) সম্মত হইয়া সে ১৫০ টাকার খরিদা গরু তিনটি জোতদারের ঘরে দিয়া ১২ মণ ধান কর্জ লওয়ার মৌখিক চুক্তি করে। গরু তিনটি রাখিয়া জোতদার তখনকার মত তাহাকে তিন মণ ধান দেয়, অবশিষ্ট ধান পরে দিবে বলিয়া তাহাকে বিদায় করে। সে তিন মণ ধান ফুরাইয়াছে। চার বার ধান আনিতে গিয়াছে, জোতদার টালবাহানা করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। সাতদিন সমস্ত পরিবার উপবাসী। সেদিনও ধান আনিতে গিয়াছিল। সেদিনও মাপার লোক না থাকার অজুহাতে জোতদার ফিরাইয়া দিয়াছে। নিস্ফল আক্রোশ বুকে করিয়া সে টলিতে টলিতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই তখন ডাক শুনিয়াও আমাদের কাছে যায় নাই। এই অভাবের মধ্যে তাহার বোন না খাইতে পাইয়া ৩টি ছেলেমেয়ে লইয়া তাহার বাড়ীতেই আসিয়াছে। দেখিলাম, তাহাদের লইয়া বাড়ীতে ৯জন মানুষ একটি কাঁঠাল কোলে করিয়া বসিয়া আছে ; সন্ধ্যার সময়ে সকলে ভাগ করিয়া খাইবে, আজ সাত দিন পরে।

*এই হিসাবগুলি ভারতীয় স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের শ্রীযুত অম্বিকা ঘোষের প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। যেখানেই অন্য উল্লেখ নাই, সব জায়গার তথ্যগুলিও উপরোক্ত প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

কাহিনী বলিলাম একটি। এমনই দেখিলাম ঘরে ঘরে। পাশের বাড়ীতে গেলাম। তাহারা খাইতে দিতে না পারিয়া বড় মেয়েটিকে বিক্রয় করিয়াছে। ছোট অথচ ছেলেদের মধ্যে বড়টিকে আর এক বাড়ীতে পোষানী দিয়াছে, দুটি ছোট ছেলে ও মেয়ে মায়ের শুকনো বুক চুষিতেছে। কৃষক ও তাহার স্ত্রী সারাদিন অভুক্ত আছে, আগের দিনও উপবাস করিয়াছে।

এই রকম অগণিত চিত্র দেখিয়াছিলাম যত গ্রাম ঘুরিয়াছি, সব গ্রামে।

দেবীগঞ্জ থানায় যাইতে পারি নাই ; সেখানকার খবর লইয়া জানিলাম, একই অবস্থা। ৫নং ইউনিয়নের একটি গ্রামে ৩০ ঘর খাস আধিয়ার (যাহাদের একবিন্দু জমি নাই জোতদারের জমির উপর ঘর বাঁধিয়া বাস করে), ৮৮ ঘর আধিয়ার-চুকানদার, ৮ ঘর সর্বস্বহারা নিঃস্ব, ৩৭ ঘর দিন মজুর আর জোতদার ও চুকানদার ৩২ ঘর। এই ৩২ ঘর ব্যতীত সকলেই মাসের অর্ধেক দিন উপবাসী থাকে। গোটা জেলার গ্রামাঞ্চলে এই অবস্থা। অধিকাংশ চাষীর এক তিল জমি নাই বা সামান্যই জমি আছে, আর বড় বড় জোতদারের ৫ হাজার বিঘা হইতে ১৫ হাজার বিঘা পর্যন্ত জমি আছে। প্রায় সমস্ত চাষী অনাহারে দিন কাটাইতেছে। এক এক জন বড় জোতদার পঞ্চাশ হাজার মণ পর্যন্ত ধান চোরা বাজারে বেচিতেছে।

জলপাইগুড়ি সহরে ৩২ টাকা হইতে ৪০ টাকা চাউলের মণ হইয়াছিল। পচাগড় হাটে ধানের মণ ২০্ (৩১।১০।৪৬ তারিখের হিসাব)। কেহ মনে করিতে পারেন, ধান চাউলের অভাব, তাই এত দর। কিন্তু তাহা নয়। সরকারী হিসাবে জলপাইগুড়ি বাড়তি জেলা। আমি যখন জুলাই মাসে গিয়াছিলাম, তখন পচাগড় হাটে ১৫০ মণ ধান আমদানি হইত। সাধারণত ২৫০ মণের বেশী আমদানি হয় না, কিন্তু এখন নূতন ধান ওঠার সময় হইয়াছে, তাই ৩৫০।৪০০ মণ ধান প্রতি হাটে আমদানি হইতেছে। তাহা ছাড়া গোপনে রাত্রিতে রাত্রিতে গাড়ী বোঝাই করিয়া অনেক ধান বিক্রয় হইতেছে,—জোতদার-মজুতদারেরা চোরাবাজারে বেচিতেছে। ধানের অভাব নাই; তবুও সেই ধান যাহারা পয়দা করিয়াছে সেই আধিয়ার কৃষকেরা থালা, ঘটি-বাটি, গরু, জমি সব বেচিয়াও লাখে লাখে উপবাসী থাকিতেছে, কত অনাহারে মরিতেছে। শুধু তাহারাই নয়, মধ্যবিত্তরাও উজাড় হইতেছে। এই নভেম্বর মাসেও জলপাইগুড়ি সহরে ২৭ টাকা চাউলের মণ। কেরানী, ছোট ব্যবসায়ী, শিক্ষক, গরীব মধ্যবিত্ত ছেলেপুলেকে পেট ভরিয়া খাইতে দিতে পারিতেছে না। প্রতি ঘরের গৃহিণী নিঃশব্দে চোখের জল ফেলিয়া মুছিতেছেন।

অন্যদিকে, জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়া যাওয়ায় চাষের খরচও অনেক গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। একজন আধিয়ারের পরিবারে সাধারণত ছয় জন লোক, এই হিসাবে বছরে অন্তত ৪৫০।।৹ টাকা খরচ লাগে। (৬।। টাকা দরে ধানের মণ ধরিয়া ৩৫১ টাকার ধান ; তৈল লবণ প্রভৃতি ১২ টাকা ; বাজার খরচ ২৪ ; কাপড় ১৫ টাকা, বাড়ীর খাজানা ২।।৹ টাকা, বাড়ী মেরামত ৩০।।৹, ঔষধপত্র ২০ টাকা)। ইহার কমে কোনমতেই চলিতে পারে না। পক্ষান্তরে তাহার আয় অনেক কম। সাধারণত আধিয়ার দশ বিঘার বেশী জমি পায় না। উত্তরবঙ্গে গড়ে একর প্রতি ১৫ মণ ধান ফলন হয়। তাহা ছাড়া চাষীরা কিছু পাট ও আউস ধান পাইয়া থাকে। দশ বিঘা জমিতে মোট উৎপন্ন হয় গড়ে ৫০ মণ ধান, তাহার দাম মণ করা ৬।।৶ টাকা হারে ৩২৫ টাকা, ৫০ টাকা মূল্যের পাট ও ৩৬ টাকা দামের আউস ধান, বিছালীর দাম ৫০ টাকা—মোট উৎপন্ন ফসলের দাম ৪৬১ টাকা। সুতরাং জোতদারের ভাগে প্রতি আধিয়ারের মারফত ২৩০।।৶ টাকা আয় হয়। জমির খাজানা ছাড়া তাহার ব্যয় কিছুই নাই। দশ বিঘা জমির খাজানা ২০ টাকা ধরিলে জোতদারের প্রতি দশ বিঘা জমিতে আধিয়ারের মারফত ২১০।।৶ টাকা নিট মুনাফা থাকে। এই দশ বিঘা জমির চাষের খরচ পড়ে অন্তত ৭৮ টাকা হইতে ১৪০ টাকা। এক জোড়া বলদ তিন বছর লাঙ্গল টানিতে পারে। গরু কেনার মূলধনের কথা স্বতন্ত্র। তাহা বাদে এবং আধিয়ার পরিবারের মেহনত বাদে গরুর খোরাকী প্রভৃতি ধরিয়া বছরে গড়ে গরুর দরুন খরচ অন্তত ৪০ টাকা। লাঙ্গল ও কোদালির দরুন বছরের খরচ অন্তত ৬ টাকা ; বীজ ধান ৯।।৶; খোরাকী এবং চৌদ্দ আনা হইতে এক টাকা হারে মজুরী ধরিয়া ২১টি মজুরের বাবদ ২৬ টাকা। এই হিসাবে মোট চাষের খরচ ৮১।।৶ টাকা। এই মোট খরচই আধিয়ারকে বহন করিতে হয়, এই খরচ করিয়া সে পাইল মোট ২৩০।।৶ আনার ফসল। সুতরাং তাহার নিট আয় সর্বোচ্চ হইলে ১৪৯ টাকা হয়। আধিয়ারের বাৎসরিক ব্যয় ৪৫৪।।৶ টাকা আর আয় ১৪৯ টাকা ; বছরে ঘাটতি পড়ে ৩০৫ টাকা। কিন্তু আধিয়ারের প্রকৃত আয় হয় ইহার চেয়েও কম। তাহার ভাগ্যে ধানের মণ ৪।।৶ টাকা। ৫ টাকার বেশী জোটে না খরচ আরও বেশী হয় এবং এই ঘাটতি পূরণের জন্য কর্জার আশায় জোতদারের দুয়ারে ধর্না দিতে আধিয়ার বাধ্য হয়। জোতদার দেড়াবাড়িতে সুদ, আবওয়াব ও আসল ধানের বাবদ আধিয়ারের সর্বস্ব হস্তগত করিয়া তাহাকে নিজের গোলাম করিয়া লয়, ইচ্ছামত জমি হইতে উৎখাত করে, ক্রমে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে। সারা উত্তরবঙ্গের প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ চাষীর এই অসহনীয় দুরবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গের ভাগচাষী

উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে আধিয়ারের সংখ্যা একটু কম হইতে পারে ; তবুও হুগলী জেলায় শতকরা ৭০ জন, বাঁকুড়া জেলায় ৫৬ জন, মেদিনীপুর জেলায় ৪৬ জন চাষী বর্গাদার হইয়া গিয়াছে। হাওড়া ও বর্ধমান জেলায় ভূমি রাজস্ব কমিশনের সময়ে শতকরা ২৭ জন ভাগচাষী ছিল ; এখন তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া শতকরা ৪০ জন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত চাষের খরচ ভয়ানক বাড়িয়াছে। হাওড়া জেলায় প্রায় ভাগচাষীর লাঙ্গল নাই, তাহাদের লাঙ্গল ভাড়া করিতে হয়। কোথাও কোথাও এক বিঘা জমির চাষের খরচ ষাট টাকা পর্যন্ত হয়। বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় (সবচেয়ে বেশী পরিমাণে বীরভূম জেলায়) বর্গা বাদেও মাহিন্দারী, কৃষাণী ও ঠিকা প্রভৃতি অনুরূপ প্রথায় জমি চাষ করানো হয়। বীরভূম জেলায় ১৫টি গ্রামের হিসাব লইয়া ডাঃ সুধীর সেন দেখাইয়াছেন যে—মাত্র শতকরা ১১ ভাগ ধানের জমি নিজ জোতে চাষ হয়, মাহিন্দার মারফত ৭ ভাগ, কৃষাণ মারফত ৪২ ভাগ, বর্গাদার মারফত ৩৮ ভাগ আর ঠিকা প্রথায় ২ ভাগ জমি চাষ হয়। মাহিন্দারেরা খোলাখুলি ভূমিদাস। তাহারা খোরাকী পায় এবং সাধারণত বার্ষিক

চুক্তিমত কিছু টাকা পায়। এই টাকার পরিমাণ খুব কম; এমন কি বর্তমানেও সাধারণত বছরে ৩০ টাকার বেশী বেতন ইহারা পায় না। কৃষাণী প্রথায় জমির মালিক গরু, লাঙ্গল, সার, বীজ, ধান ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেন, মেহনত করে কৃষাণ। মালিক ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পান আর কৃষাণ পান এক ভাগ। বর্গা প্রথায় চাষীই সাধারণত গরু, লাঙ্গল ইত্যাদি সব খরচ বহন করে, বর্গাদার ফসলের অর্ধেক আর জমির মালিক অর্ধেক পান। বর্ধমান, বীরভূম জেলার কোন কোন অঞ্চলে মালিক ভাগচাষীকে চাষের আধা খরচ দিয়া থাকেন। ঠিকা প্রথায় ধানের পরিমাণ নির্ধারিত থাকে। অন্যান্য অঞ্চলে ইহাকে গুলা, খাড়া, ভাগ প্রভৃতি বলে। মেদিনীপুর জেলার তমলুক অঞ্চলে পাঁচ হাজারী দশ হাজারী জোতদার আছে। তবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ বড় জোতদারের সংখ্যা উত্তর বাংলার চেয়ে কম।

১৯৪২ সালের বন্যা ও ঝড় এবং পরের বৎসর দুর্ভিক্ষের ফলে মেদিনীপুরের কৃষি ব্যবস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভাগচাষীর দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছে। ভাগচাষীর উপর জুলুমের কোন শেষ নাই। এখানেও ভাগচাষীর নিকট হইতে নানা রকমের আবওয়াব আদায় করা হয়। মালিক রাজভাগ লইয়া কোন রসিদ দেন না, সামান্য অজুহাতে আদালতের সাহায্যে তাহাদের নিকট হইতে পুনরায় ধান আদায় করেন। ভাগচাষীকেই চাষের সব ব্যয় বহন করিতে হয় অথচ জমিতে তাহাদের কিছুমাত্র অধিকার থাকে না। মালিক ইচ্ছামত তাহাকে জমি হইতে উৎখাত করে। এখানেও দেড়াবাড়িতে আধিয়ারেরা ধান কর্জ করিতে বাধ্য হয় এবং দেনার দায়ে অতিদ্রুত সর্বস্ব খোয়াইয়া পথের ভিখারী হয়। এখানেও যাহারা ফসল পয়দা করে, তাহারা বছরের কয়েক মাস অনশনে থাকিয়া মরে বা অর্ধাশনে কোনমতে বাঁচিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে অনেক সাঁওতালের বাস। সরল সাঁওতালেরা রক্তজল করিয়া পতিত জমি চাষ করে। অমানুষ জোতদারেরা তারপর আইনের কূট খেলা খেলিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দেয়। এই নির্মম উৎপীড়নের ফলে ইহারা আজও যাযাবর হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ববঙ্গের ভাগচাষী

গত যুদ্ধের আগে বাংলার অন্যান্য অংশের তুলনায় পূর্ববঙ্গে ভাগচাষীর সংখ্যা অনেক কম ছিল। ভূমি রাজস্ব কমিশনের হিসাবে ১৯৩৮-৩৯ সালে বরিশাল জেলার শতকরা ৪৫ ভাগ আবাদী জমি, চট্টগ্রাম জেলার ১২ ভাগ, ঢাকা জেলার ২৩ ভাগ, ফরিদপুর জেলার ১১ ভাগ, ময়মনসিংহ জেলার ১০ ভাগ, নোয়াখালি জেলার ১৭ ভাগ আর ত্রিপুরা জেলার ১২ ভাগ আবাদী জমি বর্গাদার মারফত চাষ হইত। কিন্তু পূর্ববঙ্গের অধিকাংশই ছিল গরীব চাষী। তাহাদের লাঙ্গলের অধিকাংশ ছিল তাহাদের নিজের জমি। সাথে সাথে অল্প অল্প জমি ভাগেও চাষ করিত। তাই প্রধানত বা পুরাপুরি বর্গাদার এমন লোকের সংখ্যা ছিল কম। ঢাকা ও বরিশালে শতকরা ৭ ভাগ চাষী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালিতে ২ ভাগ, ফরিদপুরে ২৩ ভাগ, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় ৭ ভাগ মাত্র পুরা বা প্রধানত ভাগচাষী ছিল। কিন্তু পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের আঘাত সব চেয়ে বেশী লাগে সমগ্র পূর্ববঙ্গে।

পূর্ববঙ্গে গরীব চাষীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী। তাই যুদ্ধের মধ্যে বিশেষত দুর্ভিক্ষের সময়ে তাহারাই সবচেয়ে বেশী জমি বিক্রয়, মৌরসী, রেহেণ ও কটকোবালা করিতে বাধ্য হয়। দুর্ভিক্ষের বছরে বাংলার ২৭টি জেলায় মোট ৩৫,৪০,২৫৫ খানি জমি হস্তান্তরের দলিল হয়। তাহার মধ্যে পূর্ববঙ্গের ৭টি জেলাতেই হয় অর্ধেকের বেশী—১৮,৭১,৭৮৩ খানি দলিল (সরকারী হিসাব)। এই এক একখানি দলিলে গড়ে তিন বিঘা বা এক একর জমি হস্তান্তর হইয়াছে ধরিয়া লইলেও এই কয়টিতে মোট প্রায় ১৯ লক্ষ একর জমি হস্তান্তর হইয়াছে এই এক বছরে; আর এই সাতটি জেলার আবাদী জমি মোট ৯৩,৭২,০০০ একর। অর্থাৎ মোট আবাদী জমির পাঁচ ভাগের এক ভাগ জমি হস্তান্তর হইয়াছে এক বছরে। তাহার পরও মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ পূর্ববঙ্গে লাগিয়াই আছে। এবারও পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষের অবস্থা হইয়াছে। আজ জমির অধিকাংশই বর্গাদার মারফত চাষ হইতেছে, আগে যে চাষী জমির মালিক ছিল সেই এখন ভাগে চাষ করিতেছে, অথবা নূতন বর্গাদার পত্তন হইয়াছে। সুতরাং বর্গাদারের সমস্যা যে পূর্ববঙ্গের গুরুতর হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে উত্তর বাংলার ন্যায় পাঁচ হাজারী দশ হাজারী জোতদার এখানে এখনও তত বেশী দেখা যাইতেছে না।

পূর্ববঙ্গে বর্গাদারদের উপর উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা এখনও হয়ত একটু কম আছে; কিন্তু যুদ্ধের সময়ে ও দুর্ভিক্ষের পর হইতে এখানে জীবনযাত্রার ব্যয় ও চাষের খরচ সাংঘাতিক বাড়িয়াছে। শুধু বীজ ধানের দামই সাত আট গুণ বাড়িয়াছে—এক মণ বীজ ধানের দাম ১৮-১৯ টাকা হইয়াছে। ঢাকা জেলায় একটি সাধারণ কৃষক-পরিবারের চাষের খরচ ৪০০ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। অন্যান্য জেলাতেও বলদের অভাব, বীজ ধানের অভাব, চড়া মজুরীর জন্য চাষের খরচ খুব বেশী হয়। আধিয়ারের আয় খুব কম হয়। ফলে আধিয়ারের জীবন দুঃসহ হইয়াছে, গরীব চাষী ও ভাগ-চাষীরা খুব তাড়াতাড়ি ক্ষেতমজুর হইয়া যাইতেছে।

মধ্য বাংলার ভাগচাষী

মধ্য বাংলার জেলাগুলিতে বর্গাদারের ভাগ্যও সমান শোচনীয়। ১৯৩৮-৩৯ সালেই খুলনা জেলার শতকরা ৫০ ভাগ আবাদী জমি, মুর্শিদাবাদ জেলার ২৬ ভাগ, নদীয়া জেলার ২৪ ভাগ, যশোহর ও চব্বিশ পরগণা জেলার ২২ ভাগ আবাদী জমি বর্গাদার মারফত চাষ হইত। এ জেলাগুলিতে ফলন বড় কম। ১৯৩২-৩৭ সালের উৎপন্ন ফসলের উপর বার্ষিক একর প্রতি ফলনের যে সরকারী রিপোর্ট বাহির হয়, সেই অনুসারে যশোহর জিলায় একর প্রতি উৎপন্ন ধানের পরিমাণ ১৬ মণ, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৫ মণ, খুলনা জেলায় ১৯ মণ আর চব্বিশ পরগণা জেলায় ১৭ মণ। সমগ্র বাংলার গড় উৎপাদন ছিল কুড়ি মণ। এখন উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ আরও কমিয়াছে। একর প্রতি এখন গড়ে ১৫ মণের বেশী ফলন নাই, বর্গা জমির গড় উৎপাদন ১২ মণ (একরে)। তাহা ছাড়া এ অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় সমস্ত পল-বিচালী মালিককে দিতে হয়, আর বর্গাদারকে তাহার গরুর খোরাক কিনিতে হয়। আগে যে সব গো-চারণ ভূমি ছিল, এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে। মজুরীর হার

পশ্চিমেও উত্তরবঙ্গের চেয়ে বেশী, তবে পূর্ববঙ্গের চেয়ে কম। চাষের খরচও উত্তরবঙ্গের চেয়ে বেশী। ঋণ সরবরাহ প্রথা একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে জোতদারেরা বর্গাদারকে কর্জ দিবে এই প্রথাই চালু ছিল, এখন তাহা ভাঙা হইতেছে; মধ্য বাংলার জেলাগুলিতে এ ব্যবস্থা আগেই ভাঙিয়া গিয়াছে; খুব সামান্য ক্ষেত্রেই ভাগচাষীর ধান কর্জ পায়। এইসব কারণে এখানকার বর্গাদারদের দুরবস্থার শেষ নাই। খুলনা ও চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে ইহাদের অবস্থা একেবারে ক্রীতদাসের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অঞ্চলে জমি খাস করার ষড়যন্ত্র অনেক জায়গায় উত্তরবঙ্গের চেয়েও ব্যাপক এবং জঘন্য। খুলনা জেলার কামারখোলা ইউনিয়নে বড় জোতদারদের বাড়ীতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চালা ঘর দেখা যায়। কোন জোতদারের চালাঘরে ৫০ জন, কোথাও বা ১০০ জন মাদুরের উপর পড়িয়া থাকে। কেন পড়িয়া থাকে? ইহাদের সব জমি, বাড়ি-ঘর পর্যন্ত জোতদারের পেটে গিয়াছে; সপরিবারে জোতদারের বাড়ীতে জোতদার জায়গা দেয়, সমস্ত পরিবারকে খাটাইয়া লয়। নিজেদের প্রাপ্য ধানে এবং কর্জ লইয়া ইহারা গাছতলায় বা কুঁড়েঘরে রাঁধিয়া খায়; অল্পদিন পরে পারিবারিক জীবনও ভাঙিয়া যায়। ইহার পরের কাহিনী আর বইয়ে লেখা যায় না। তাহারই পরিণতিতে আধিয়ারেরা জোতদারের চালাঘরে পড়িয়া থাকে। জমি খাস করার জন্য জোতদারেরা এই উপায়গুলি নেয়:—(ক) চাষীকে খুব মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়া সামান্য কিছু টাকা বা ধান কর্জ দেয় ও সাদা কাগজে তাহার টিপসই লয়। অল্পদিন পরে চাষার অজ্ঞাতে গোপনে আদালতের ডিক্রি হইয়া জমি খাস হইয়া যায়। (খ) সামান্য কিছু টাকা কর্জ দিয়া বা দেনাগ্রস্ত চাষীকে জমি বেনামী করার সুবিধা দেখাইয়া নিজের অনুকূলে জমির পাট্টা করিয়া কৃষকের নিকট হইতে ভাগচাষের কবুলতি লয়। মৌখিক কথা থাকে জমি কৃষকেরই রহিল; দুই-এক বছর পরে মালিক মৌখিক চুক্তি অস্বীকার করে, জমি খাস হইয়া যায়। নিরুপায় কৃষক আদালতে ও উকিলের কাছে ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে জোতদারের কাছেই আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ নানা চক্রান্তে কৃষকেরা আধিয়ার হয়, আধিয়ারেরা ক্রীতদাসে পরিণত হয়। চব্বিশ পরগণা ও খুলনা জেলার সুন্দরবন ও দক্ষিণ অঞ্চলে এইভাবেই অমানুষিক শোষণ চলিয়াছে।

আধিয়ারের সমস্যা

উপরের আলোচনা হইতে আমরা নিচের সিদ্ধান্তগুলিতে পৌঁছাইতে পারি।

১। বাংলার কৃষকের অধিকাংশই আজ আধিয়ার। বাস্তবিক পক্ষে আধিয়ারের সমস্যাই আজ সমগ্র কৃষক সমাজের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাগচাষের উপরই শতকরা ৪৩ জনের জীবিকা নির্ভর করে। অন্তত চল্লিশ লক্ষ পরিবার কমবেশী জমি ভাগে চাষ করে। অন্তত অর্ধেক আবাদী জমি বর্গাভাগে চাষ হয়।

২। যুদ্ধের আগেও আধা ভাগের ব্যবস্থায় ভাগচাষীর সংসার চালানো খুব কষ্টকর হইত কিন্তু বর্তমানে আধাভাগে সংসার চালানো একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আধিয়ারদের বাঁচিতে বা বাঁচাইতে হইলে তাহার খরচ কমাইতে হইবে, আয় বাড়াইতে হইবে। ইহারা যেভাবে থাকে, তাহার চেয়ে কম খরচে কোন মানুষ থাকিতে পারে না। তাই ইহাদের খরচ কমাইতে হইলে চাষের খরচের ভার জমির মালিক না লইলে ইহাদের অন্য উপায় নাই; বর্গাদারের প্রাপ্য ফসলের ভাগ না বাড়াইলে আয় বাড়াইবার অন্য পথ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নাই।

৩। ইহাদের যে হারে ধানের সুদ দিতে হয়, তাহা কল্পনা করা শক্ত। আইনত কর্জ টাকার বছরে সুদের হার দশ টাকা; আর আধিয়ারেরা দেড়া বাড়ি, ডবল বাড়ি, কড়ালি বা দরকাটি প্রথায় ধানের সুদ দিতে বাধ্য হয় বছরে শতকরা ১০০ ভাগ হইতে ৩০০ ভাগ পর্যন্ত। সুদ ভাগচাষীদের শেষ করে।

৪। বর্তমানে জমি ও ফসল একচেটিয়া করার লোভে জমির মালিকেরা এই চড়া হারে সুদ লইয়াও কর্জ দিতে অস্বীকার করিতেছে। জমি, লাঙ্গল, গরু সব নিজেদের দখলে আনিয়া চাষীদের ক্রীতদাস করিয়া রাখিবে, এই মতলবে জমির মালিকেরা এখন বন্ধক না রাখিয়া কর্জ দিতেছে না। ফলে উপবাসী কৃষক বাধ্য হইয়া থালা-ঘটি-বাটি, বাড়ী, গরু লাঙ্গল, জমি বেচিয়া পথের ফকির হইতেছে।

৫। নানারকম আবওয়াবের ফলে আধিয়ারদের ভাগ আসলে অর্ধেকেরও কম হয়। অথচ জমির উৎপন্ন ফসলের হার খুব কম, ফলে আধিয়ার শুধু চাষই করে; ফসল তাহার ভাগ্যে প্রায় কিছুই জোটে না।

৬। জমিতে ভাগচাষীর কোন স্বত্ব নাই; মালিকের ইচ্ছামত ইহারা জমি হইতে উৎখাত হয়। সুতরাং জমির বা চাষের উন্নতি করিবার কোন উৎসাহ ভাগচাষীদের থাকে না বা থাকিতে পারে না। পতিত বা জলা জমি উদ্ধার হয় না; ভাল বীজ বা সারের ব্যবস্থা হয় না। ফলে বিঘা প্রতিফলন বাংলাদেশে খুব তাড়াতাড়ি কমিয়া যাইতেছে। আগে বিঘা প্রতি গড় ফলন দশ মণ ধান ছিল। ভূমি রাজস্ব কমিশনের সময়ে গড় ফলন ছিল বিঘা প্রতি সাড়ে ছয় মণ; এখন দাঁড়াইয়াছে পাঁচ মণ। বাংলাদেশে যে ৪২ লক্ষ একর আবাদযোগ্য পতিত জমি আছে, তাহা হইতে প্রায় ছয় কোটি মণ ধান হইতে পারে; বিঘা প্রতি দুই মণ ফলন বাড়িলে পৌনে তিন কোটি একর জমিতে প্রচুর ফসল হইতে পারে। কিন্তু আধিপ্রথা ও বর্তমান ভূমিব্যবস্থা এবং জমিদারী প্রথার ফলে এই উৎপাদন বন্ধ থাকে। উৎপাদনে এই ঘাটতির ফলেই বাংলায় চিরদুর্ভিক্ষ; তাই মধ্যবিত্ত ও জনসাধারণ ২৭ টাকা, ৩০ টাকা, ৪০ টাকা, ৫০ টাকা দরে চাউল কিনিতে যাইয়া ফতুর হইয়া যাইতেছে। আর সারা বাংলার কৃষিব্যবস্থা, খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা ধ্বসিয়া পড়িতেছে। আধিপ্রথা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দূর না করিলে বাংলাকে আজ আর দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা করা কোনমতে সম্ভব নহে।

৭। জমির মালিক ফসলের ভাগ লন, অথচ রসিদ দেন না, ফলে আধিয়ারের উপর অকারণ জুলুম চলে।

৮। ভাগচাষীর উপর আজ যে অমানুষিক শোষণ চলিতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে, ফসল মজুত করিয়া ইচ্ছামত চড়াদরে বিক্রয় করার লোভ এবং তাহার জন্য সমস্ত জমি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে একচেটিয়া করার লোভ আজ ধান চাউল থাকিতেও যে দাম এত বেশী, তার কারণ এই একচেটিয়া কর্তৃত্ব। এই একচেটিয়া মুনাফা

ভোগ বন্ধ করিতে না পারিলে আধিয়ার, কৃষক, মধ্যবিত্ত, মজুর সকলেই একচেটিয়া ভোগীর সীমাহীন লোভের আগুনে পুড়িয়া মরিবে। বাংলাদেশকে রক্ষা করার একমাত্র পথ—এই জমি ও খাদ্য একচেটিয়া করা ও মজুত করা-যেমন করিয়া হোক্ বন্ধ করিতে হইবে। মজুতদারের হাতে ফসল যত কম থাকিবে, বাজারে ধান চাউলের দর তত সস্তা হইবে। আধিয়ারের আয় বাড়াইতে না পারিলে বাংলার ৭৫ লাখ কৃষক পরিবারের মধ্যে চল্লিশ লাখ ভাগচাষী পরিবার ধ্বংস হইবে ; আধিয়ারের ভাগ বাড়িলে, মজুতদারের হাতে কম মজুত হইবে, বাজারে বেশী আমদানি হইবে, ধান চাউলের দর কমিবে। মজুর, মধ্যবিত্ত, গরীব চাষী সকলেই রক্ষা পাইবে।

ভাগচাষীর দাবী

বাস্তবিক ভাগচাষীর সমস্যা আজ গোটা বাংলাদেশের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভূমি রাজস্ব-কমিশনের হিসাবে ১৯৩৮-৩৯ সালে বাংলার আবাদী জমির পাঁচ ভাগের এক ভাগ বর্গা প্রথায় চাষ হইত। কিন্তু গত যুদ্ধের কয়েক বৎসরে ইহার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। শুধুমাত্র তেরশত পঞ্চাশ সালেই পঁয়ত্রিশ লক্ষ দলিলে অন্তত এক কোটি ছয় লক্ষ বিঘা হস্তান্তরিত হইয়াছে। তাহার পরও এই হস্তান্তর বন্ধ হয় নাই। সাড়ে আট কোটি বিঘা আবাদী জমির মধ্যে আগেই এক কোটি সত্তর লক্ষ বিঘা বর্গা চাষ হইত। তাহার পর গত ছয় বৎসরে অন্তত সওয়া তিন কোটি বিঘা জমি হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রতি বছর কুড়ি ভাগের এক ভাগ জমি হস্তান্তর হইতেছে। এখনই বাংলার মোট আবাদী জমির পাঁচ ভাগের তিন ভাগ বর্গা প্রথায় চাষ হইতেছে। পনের বিঘার বেশী জমি আছে, এরূপ পরিবারের সংখ্যা দশ লাখের বেশী নয়। তেমনই তেরশ পঞ্চাশ সালে বাংলার মোট আশি লক্ষ হালের বলদের সাত ভাগের এক ভাগ ধ্বংস হইয়াছে। বলদ গিয়াছে ভাগচাষী ও গরীব চাষীর। তারপরেও বলদ ধ্বংস হওয়া বন্ধ হয় নাই। গ্রামের মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ পরিবারের আজ হালের বলদ আছে। কৃষক আধিয়ার হইতেছে, আধিয়ার ক্ষেতমজুর হইতেছে। এই গতি প্রতিরোধ করিতে না পারিলে বাংলাদেশে কৃষক থাকিবে না। একদিকে থাকিবে মুষ্টিমেয় জমিদার, জোতদার, মজুতদার, অন্যদিকে ভূমিহীন লাঙ্গল-গরু বিহীন আধিয়ার ও ক্ষেতমজুর। জমিদার, জোতদার, মজুতদারের জমি এই সব ক্রীতদাস মারফত চাষ হইবে। মধ্যবিত্ত বা কৃষকের জমি থাকিবে না, থাকিলেও চাষের লোক বা উপায় থাকিবে না।

প্রকৃতপক্ষে বাংলার কৃষিব্যবস্থা যে একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, এই অসহনীয় দুরবস্থা তাহারই একটি চিহ্নমাত্র। পুরানো কালে এদেশের আইন ছিল—লাঙ্গল যার, জমি তার ; কৃষকই ছিল জমির মালিক। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে আসিয়া নিজেদের কুমতলব হাঁসিল করিবার জন্য চিরন্তন ভূমি-ব্যবস্থা করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথা পত্তন করিয়াছে। বাংলার জমি এই আইনের জোরে মুষ্টিমেয় জমিদারের একচেটিয়া সম্পত্তি হয়। এই একচেটিয়া অধিকারের জোরে জমিদার খাজনা হইতে মুনাফা করিত দশ কোটি টাকা, আর রাজস্ব দেয় মাত্র সওয়া তিন কোটি টাকা। কিন্তু আজ এই জমিদার জোতদারেরা অনেক বেশী মুনাফা লুটিবার এক নূতন পথের সন্ধান পাইয়াছে। তেরশ পঞ্চাশ সালে মজুতদারেরা শুধু মজুত চাউল বেচিয়া দেড়শ কোটি টাকা অন্যায় মুনাফা করিয়াছিল (দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট)। তখন হইতে ধান চাউল মজুত করিবার লোভে, জমি খাস করিবার নেশায় জমিদার জোতদারেরা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু একচেটিয়া খাজনা নয়, একচেটিয়া ধান-চাউল ও খাস জমি চাই—ইহাই তাহাদের রণধ্বনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জমিদার জোতদারেরা তাই কৃষি-ব্যবস্থা ভাঙিয়া ফেলিতেছে, তাহারই ফলে মধ্যবিত্ত মরিতেছে, আধিয়ার উৎসন্ন হইতেছে, কৃষক ধ্বংস হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট জমিদারী প্রথার ইহাই অনিবার্য পরিণতি। **তাই অবিলম্বে জমিদারী প্রথা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ধ্বংস করাই বাংলাকে বাঁচাইবার মূল উপায়, চরম কৃষি-সঙ্কটের মূল সমাধান।**

কিন্তু জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সমাপ্ত হইতে কিছু সময় লাগিতে পারে। তাহার পূর্বেই ভাগচাষীর দুরবস্থার প্রতিকার না হইলে বাংলাদেশ ধ্বংস হইবে। তাই এখনই ভাগচাষীর নিম্নলিখিত দাবীগুলি যাহাতে পূর্ণ হয় তাহার জন্য সমস্ত দেশবাসীর একযোগে সংগ্রাম করা দরকার ঃ—

১। উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ ভাগচাষী পাইবে, জমির মালিক আইনত তিন ভাগের এক ভাগের বেশী আদায় করিতে পারিবে না।

২। ভাগচাষীকে বর্গা জমি হইতে উৎখাত করা চলিবে না ; ঐ জমিতে তাহাকে 'দখলী স্বত্ব' দিতে হইবে।

৩। সুদের হার ধান বা টাকা কোন ঋণের বেলাতেই আট ভাগের এক ভাগের বেশী হইতে পারিবে না। একমণ ধানে পাঁচ সেরের বেশী সুদ নাই ; বাড়ি, দরকাটি ও করালি প্রথা দণ্ডনীয় হইবে। কর্জার ব্যবস্থার জন্য প্রতি ইউনিয়নে সরকারী গোলা (গ্রেণ ব্যাঙ্ক) স্থাপন করিতে হইবে।

৪। জমি হইতে উচ্ছেদ করা, খাদ্য মজুত করা, ও ধান থাকিতে ভাগচাষীকে ন্যায্য সুদে কর্জা দিতে অস্বীকার করা আইনত অপরাধ হইবে।

৫। সব রকম আবওয়াব আইনত দণ্ডনীয় হইবে।

৬। রসিদ না দিয়া ভাগচাষীর নিকট হইতে ধান লওয়া চলিবে না ; বিধান থাকিবে, রসিদ না দিয়া ধান লইলে সাজা হইবে।

৭। জমি পতিত ফেলিয়া রাখা দণ্ডনীয় হইবে; ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের পতিত জমি চাষ করিবার ও তাহার ফসল লইবার অধিকার দিতে হইবে। ভূমিহীনদের জন্য সস্তাদরে সরকার হইতে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এগুলি সর্বোচ্চ দাবী নয়, এগুলি ভাগচাষীর সর্বনিম্ন দাবী। এই দাবী শুধু ভাগচাষীর বাঁচিবার পথ নয়, কৃষক ও মধ্যবিত্ত সকলেরই বাঁচিবার একমাত্র রাস্তা। শুধু ইহারই ভিত্তিতে কৃষি-ব্যবস্থা নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা যায়, উৎপন্ন-ফসলে বাংলার ঘাটতি দূর করা যায়, ধান ও চাউলের দর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় নামানো যায়, চির-দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাংলাকে বাঁচানো যায়।

ভাগচাষীর লড়াই

আধিপ্রথা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া সকলের চোখে সহিয়া গিয়াছিল, নীতিপরায়ণ মানুষের চোখেও ইহার বর্বরতা

সহজে ধরা পড়িত না। কিন্তু শোষিত আধিয়ার বিনা প্রতিবাদে এই অন্যায়কে কোনদিন মানিয়া লয় নাই। যখনই সুবিধা পাইয়াছে, তখনই কোন না কোন আকারে ভাগচাষীরা এই অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। আধিয়ার তাহার নিজের তৈরী ফসল নিজের খলিয়ানে বা বাড়ীতে তুলিতে পারে না, সারা প্রদেশে ইহাই প্রথা। আধিয়ার কোন দিন ইহা মানিয়া লইতে পারে নাই; তাই বিদ্রোহের প্রথম আওয়াজ উঠিয়াছে, 'নিজ খলিয়ানে ধান উঠাও।' নানা রকমের বাজে আদায় ভাগচাষীদের নিকট হইতে আদায় করা হয়। সুদ ও বাজে আদায় দিয়া কত আধিয়ার যে সমস্ত ফসল মালিকের গোলায় তুলিয়া দিয়া শুধু কুলা হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরে, তাহার লেখাজোখা নাই। ইহাও আধিয়ার নিঃশব্দে সহ্য করে নাই। জমি কৃষকের কাছে নিজের অন্তরের চেয়েও প্রিয়। সেই জমি হইতে উৎখাত হওয়ার সময়ে তাহার হৃদয়ের শিরা উপশিরা ব্যথায় টনটন করিয়া ওঠে, তাই চিরদিন ভাগচাষী তাহার জমিতে দখলী স্বত্ব বা অন্তত প্রজাই স্বত্ব দাবী করিয়াছে। আধাভাগে পেট চলে না, তাই সাথে সাথে তাহার দাবী হইয়াছে, তেভাগা চাই।

তেভাগা আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাস বর্তমানে আলোচনা করিব না, শুধু কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিব। প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে বাংলার বহু জেলায় আপনা হইতে তেভাগা আন্দোলন জাগিয়া ওঠে, ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ে যশোহর, খুলনা, নদীয়া প্রভৃতি মধ্য ও পশ্চিমবাংলার জেলাগুলিতে এই আন্দোলন বেশী বিস্তৃত হয়। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন বেশী দূর আগাইতে পারে নাই। তেভাগার দাবী পূরণ হয় না। তবুও বাজে আদায় অনেক জায়গায় বন্ধ হয়। অনেক জায়গায় জমির মালিক ভাগচাষীকে চাষের অর্ধেক খরচ দিতে সম্মত হন, আবার কোথাও বা ভাগচাষী নিজের বাড়ীতে ধান উঠাইবার অধিকার আদায় করে। লড়াইয়ের সরাসরি সফলতা খুব কম হইল বটে, কিন্তু প্রচার ও আন্দোলন বন্ধ হইল না, ভাগচাষীকে প্রজাই স্বত্ব দানের জন্য ও তেভাগার জন্য অভিযান চলিতে লাগিল।

১৯০৭ সালের সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইনে ভাগচাষীর কোন উল্লেখ ছিল না। তবে সাধারণ প্রথায় ও মানুষের চেতনায় ভাগচাষীকে অনেক সময়ই প্রজা বলিয়া ধরা হইত। তাই সেকালের ভাগ কবুলতিতে অনেক সময়েই ভাগচাষীর সহিত জমির মালিকের প্রজা-মুনিব সম্বন্ধের উল্লেখ বা আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরে মালিকেরা আইনের সুযোগ লইতে আরম্ভ করে। আদালতে এই প্রজাই স্বত্বের জন্য অনেক লড়াই চলে, কোন কোন ক্ষেত্রে ভাগচাষী, কোথাও বা মালিক জয়লাভ করে। ভাগচাষীর জমিতে অধিকার সাব্যস্ত করার অনুকূল জনমত গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই সময়ে ভাগচাষীকে ফসলের তিনভাগের দুই ভাগের অধিকার ও জমিতে প্রজাই স্বত্ব দিয়া একটি বিল আনীত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯২৮ সালের সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইনে এই বিল পরিত্যক্ত হয়, জমিদার-প্রভাবিত তৎকালীন কংগ্রেস সদস্যদের চেষ্টায় আধিয়ার প্রজা নহে ইহাই ঘোষণা করিয়া আইন রচিত হয়। তেভাগার দাবী অগ্রাহ্য হয়।

তাহার পরও তেভাগা আন্দোলন বন্ধ হয় নাই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ১৯৩৬ সালে গঠিত হওয়ার সময় হইতেই আধিয়ারের দাবী লইয়া জোর আন্দোলন শুরু করে। ১৯৩৯ সালে ভূমিরাজস্ব কমিশনের নিকট কৃষক সভা যে স্মারকলিপি দাখিল করে, তাহাতে ভাগচাষীর সমস্ত অধিকার দাবী করা হয়। এই সময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি জেলায় আধিয়ার আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। নিজ খামারে ধান তুলিবার অধিকারের জন্য বাজে আদায় ও অত্যধিক সুদের শোষণ হইতে মুক্তির জন্য উত্তর বাংলার বীর কৃষক জোতদার ও পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই চালায় এবং কতক কতক অধিকার আদায় করে। ১৯৪০ সালে ভূমি রাজস্ব কমিশন তাহাদের রিপোর্টে সুপারিশ করেন, "১৯২৮ সালের আইনে বর্গাদার সম্পর্কে ঐরূপ বিধান করা ভুল হইয়াছে। ...বর্গাদারকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; মালিক আইনত ঃ অর্ধেক ভাগের বদলে তিনভাগের এক ভাগ মত্তে বর্গাদারের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।"

তথাপি আইন আজও বর্গাদারকে এই অধিকার দেয় নাই। আজ লীগ মন্ত্রিসভা বাংলার মসনদে; বাংলার ভাগচাষী ও গরীব চাষীর মধ্যে শতকরা ৭০ জন মুসলমান। ইহারা আজ অনাহারে ও দুর্ভিক্ষে মরিতেছে, নৃশংস জোতদার মজুতদারের শোষণে ধ্বংস হইতেছে; তবুও লীগ মন্ত্রিসভা গত সাতমাসের মধ্যে এই সুপারিশ আইনে পরিণত করিবার ফুরসত পান নাই। তাই অনশন জর্জরিত ভাগচাষীরা গরীব কৃষক ও দেশভক্তের সহিত মিলিয়া আজ নিজেদের হাতে নিজেদের আইন তৈয়ার করিবার জন্য তেভাগার লড়াই শুরু করিয়াছে; আওয়াজ তুলিয়াছে—দখল রেখে চাষ কর, ফসল কেটে ঘরে তোল, আধি নাই, তেভাগা চাই, বিনা রসিদে ভাগ নাই, বাজে কোন আদায় নাই, পাঁচসেরের বেশী সুদ নাই। জাগ্রত কৃষকের এই সংগ্রামে জয় আজ অনিবার্য।

ভাগচাষী ও মধ্যবিত্ত

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গত এক বছরের মধ্যেই খাদ্য ও জমি একচেটিয়া করার লোভে জমিদার, জোতদার, মজুতদারেরা কি ভাবে আধিয়ার ও গরীব কৃষকের উপরে নূতন আক্রমণ শুরু করিয়াছে, তাহা গোড়াতেই দেখাইয়াছি। মানুষের খাদ্য লইয়া এইভাবে ছিনিমিনি খেলিয়া এই মুষ্টিমেয় জনশত্রুরা কিভাবে মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে অর্ধাহার ও হাহাকার আনিয়াছে, তাহাও আলোচনা করিয়াছি। ইহারা আধিয়ার ও কৃষকদিগকে লাখে লাখে জমি হইতে উচ্ছেদ করিতেছে, চিরাচরিত রীতি বাতিল করিয়া আধিয়ারকে কর্জা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে, সর্বসাধারণের নিকট ৩০।৪০।৫০।৬০ টাকা পর্যন্ত দরে চাউল বিক্রয় করিতেছে, এবং আধিয়ারের বেলায় চোরাবাজারের দরেও বিনা বন্ধকে ধান সরবরাহ করিতেছে না। এই নৃশংস আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্যই বাংলার কৃষকেরা আজ তেভাগার দাবী লইয়া লড়াই শুরু করিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই দশটি জেলায় সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে। ঐক্যবদ্ধ হিন্দু-মুসলমান কৃষকের এই যুক্ত অভিযানে সন্ত্রস্ত হইয়া জমিদার-জোতদার-মজুতদার এবং তাহাদের দালালের দল ইতিমধ্যেই নানা অপপ্রচার শুরু করিয়াছে। কোথাও তাহারা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ধুয়া তুলিতেছে বা হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে, আবার কোথাও বা তাহারা দেশভক্ত মধ্যবিত্তদের 'স্বার্থ-রক্ষার' নামে দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি একজন কংগ্রেসী এম-এল-এ ময়মনসিংহের তেভাগা

বিনীতভাবে ইঁহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, মাত্র কয়েক বছর আগেও তোমরা ২ টাকা দরে একমণ ধান বেচিতে পারিলে কৃতার্থ হইতে ; এখন কুড়ি টাকা দর নিতে চাও কেন? তোমরা আগে পুরানো দরে ধান দাও, তারপর পুরানো হারে আধিয়ারের নিকট হইতে ভাগ আদায় করিও। কৃষক ও মধ্যবিত্ত উভয়েরই যাহারা শোষক সেই জমিদার, জোতদার, মজুতদার ও বড় চাকুরিয়ারা বা মালিকেরা নিজেদের আয় বহুগুণ বাড়াইতেছে, আর মধ্যবিত্ত, মজুর বা কৃষকের বেতন বা আয় একটু বাড়াইবার দাবী শুনিলেই তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া অভিসম্পাত করিতেছে।

আন্দোলনকে দলবিশেষের আন্দোলন বা হিন্দু জোতদারের বিরুদ্ধে প্রধানত মুসলমান কৃষকের সাম্প্রদায়িক লড়াই হিসাবে দেখাইয়া দেশভক্ত জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে চেতনা আজ প্রতি মানুষের মনে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, আজ আর সাধারণ দেশভক্তকে বিভ্রান্ত করা সহজ নয়। এই মুষ্টিমেয় জমিদার-জোতদার-মজুতদারের দল প্রথমে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে দেশভক্ত মধ্যবিত্তের ভ্রান্ত স্বার্থবুদ্ধি। তেভাগার দাবী মধ্যবিত্তকে [illegible] করার চক্রান্ত: "কৃষকের অবস্থা বরং ভাল, মধ্যবিত্তের অবস্থাই আজ শোচনীয়"—জনশত্রুর দল আজ এই সব বুলি আওড়াইতে শুরু করিয়াছে। যে সব মধ্যবিত্ত গ্রামে থাকেন তাঁহাদের অনেকেরই দুরবস্থা—সে কথা ঠিক ; কিন্তু সেই দুরবস্থার জন্য দায়ী কে? যে সব মধ্যবিত্ত গ্রামে থাকেন, তাঁহারা এই জমিদার, জোতদার, মজুতদারের অধীনে নায়েব, গোমস্তা বা মুহুরীর কাজ করেন, কিংবা ছোটখাট সুদী ও পুঁজী কা[illegible]রের দোকানদারী করেন। তাঁহাদের সৎপথে আয়ের ব্যবস্থা নাই। জমিদার যে মহালে দশহাজার টাকা মুনাফা করেন, সেই মহালে নায়েবের মাহিনা দেন কুড়ি টাকা, মুহুরীর মাহিনা দেন দশ টাকা। নায়েব ও মুহুরীর সংসার ইহাতে কোনমতে চলিতে পারে না। কৃষকের নিকট হইতে পুরা টাকা নিজে আদায় লইয়া দয়ালু জমিদার নায়েবকে বলেন, "চুরি বা জুলুম করিয়া কৃষককে মারিয়া খাও।" কৃষক এই তহুরী-পার্বণী খরচার প্রতিবাদ করিলে জমিদার নায়েবের প্রতি সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া বলেন কৃষক মধ্যবিত্তকে ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। জোতদার ধান মাপিয়া গোলায় তুলিবার জন্য বা গোলা হইতে বিক্রয় করিবার জন্য ও হিসাব রাখিবার জন্য লোক রাখেন, কিন্তু তাহাকে দয়া করিয়া কোন মাহিনা দেন না। আধিয়ার আসিলে নিজের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া নেন, লোকটিকে বলেন, "আধিয়ারের নিকট হইতে গদী-সেলামী, খলিয়ান ঝাড়ানী ইত্যাদি বাবদ বাজে আদায় কর, তাহার কতকাংশ আমাকে দাও, কতক তুমি নাও।" বেচারী আধিয়ার প্রতিবাদ করিলে জোতদার রাগিয়া বলেন আধিয়ার এই সব মধ্যবিত্তকে মারিবার সর্বনাশ করিতেছে।" সহরের মধ্যবিত্তদের বেলাতেও এই কথা। সরকারী অফিসের হাকিম বা বেসরকারী অফিসের ম্যানেজারের বি এ পাশ কেরানীরই সমান যোগ্যতা। হাকিম বা ম্যানেজারের বেতন এক হাজার টাকা, কিন্তু কেরানীকে দেন ৩৫ টাকা। যাঁহারা কাজের তাগিদে অফিসে আসেন তাঁহাদের নিকট হইতে বাঁ হাত পাতিয়া ঘুষ নাও, তাহাতে হাকিমের আপত্তি নাই। উদয়াস্ত খাটিয়াও ৩৫ টাকা বেতনে তোমার সংসার চলে না, বেশ, যে আধিয়ার বুকের রক্ত নিংড়াইয়া জমিতে ফসল করিয়াছে, তাহাকে উপবাসী রাখিয়া আধাভাগ লইয়া আইস। আধিয়ার আধাভাগ দিতে আপত্তি করিতেছে শুনিয়া কেরাণীর প্রতি করুণায় বিগলিত হইয়া হাকিম আধিয়ারের অন্যায় বিশ্লেষণ করিয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন। গরীব মধ্যবিত্তদের যাহারা সবচেয়ে বড় শোষক ও শত্রু তাহারা এইভাবেই সহানুভূতি দেখায় এবং মধ্যবিত্তকে নিজের পায়ের তলায় পিষিয়া মারে। বাস্তবিক পক্ষে জমিদার ও জোতদার, মজুতদার ও সরকার ইহারা কৃষক ও মধ্যবিত্ত উভয়েরই শত্রু; উভয়ের বিরুদ্ধে উভয়কে লাগাইয়া ইহারা নিজেদের স্বার্থ ও শোষণকে কায়েম করিতে চায়।

ইহাদের দ্বিতীয় বুলি, আধিয়ারেরা এতদিন আধাভাগ দিতে পারিয়াছে, এখন দিবে না কেন, চালাকী নাকি?'

বিনীতভাবে ইঁহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, মাত্র কয়েক বছর আগেও তোমরা ২ টাকা দরে একমণ ধান বেচিতে পারিলে কৃতার্থ হইতে ; এখন কুড়ি টাকা দর নিতে চাও কেন? তোমরা আগে পুরানো দরে ধান দাও, তারপর পুরানো হারে আধিয়ারের নিকট হইতে ভাগ আদায় করিও। কৃষক ও মধ্যবিত্ত উভয়েরই যাহারা শোষক সেই জমিদার, জোতদার, মজুতদার ও বড় চাকুরিয়ারা বা মালিকেরা নিজেদের আয় বহুগুণ বাড়াইতেছে, আর মধ্যবিত্ত, মজুর বা কৃষকের বেতন বা আয় একটু বাড়াইবার দাবী শুনিলেই তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া অভিসম্পাত করিতেছে।

ইহাদের তৃতীয় বুলি—"এখন তেভাগার দাবী তুলিলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিবে ; যাহারা এখন এই সব দাবী তুলিতে চায় তাহারা দেশের ও সমাজের শত্রু"। ইঁহাদের কাছে শুধু একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—দাঙ্গা বাধিয়াছে বলিয়া আপনারা কি মুনাফা ভোগ বন্ধ করিয়াছেন? আপনারা কি মুখে ভাত দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন? দাঙ্গার ফলে আপনাদের চোরাবাজারের মুনাফা আরও তিনগুণ ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। গরীব মধ্যবিত্ত তাহার ফলে সর্বস্ব খোয়াইয়া ৩০ টাকা দরে চাউল কিনিয়া আধপেটা খাইয়া বাঁচিয়া আছে, গরীব কৃষক না খাইয়া মরিতেছে। বড়লোকেরা দাঙ্গা বাধাইবে বলিয়া গরীবেরা তো চিরকাল হাওয়া খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না! তেভাগার দাবী আধিয়ারের বাঁচিবার দাবী, তাই তাহারা এই দাবী

উঠাইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহা ছাড়া তেভাগার লড়াই দাঙ্গা বাধাইবার রাস্তা নয়, দাঙ্গার বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে দেশকে মুক্ত করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

বাংলার জনসাধারণকে আজ একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে। যেখানে ন্যায্য মজুরী ও জীবিকার জন্য হিন্দু-মুসলমান মজুরেরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কলিকাতার বীর ট্রামের মজুর তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী। গ্রামাঞ্চলেও যেখানেই কৃষকেরা নিজেদের দাবীর জন্য সংঘবদ্ধ হইয়া লড়িয়াছে তাহার কোন জায়গাতেই এখনও পর্যন্ত দাঙ্গা বাধে নাই। সেই সব জায়গায় এখনও পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান কৃষক মিলিত হইয়া যুক্তভাবে দাঙ্গার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে। ত্রিপুরা জেলার হাসনাবাদের অতীতের কৃষক সংগ্রামই আজও হাসনাবাদে হিন্দু-মুসলমান মিলনের অজেয় দুর্গ করিয়া রাখিয়াছে। কৃষকের ন্যায্য দাবীর জন্য লড়াই হিন্দু-মুসলমান কৃষককে মিলিত করিবে, গৃহযুদ্ধের কলঙ্ক ও রক্তস্রোত হইতে বাংলাকে রক্ষা করিবে।

ইহা সত্য যে পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গায় গরীব কৃষক ও আধিয়ারের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান এবং বড় জোতদার জমিদারের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। আজ যদি সমস্ত দেশভক্তই কৃষকের ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক অধিকার মানিয়া লন তাহা হইলে দাঙ্গার প্ররোচনাকারীদের মুখোস খুলিয়া যায়, গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়, হিন্দু-মুসলমান কৃষক মিলিত হইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে, সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হইতে মুক্তির আন্দোলন জয়যুক্ত হয়।

বাস্তবিক জোতদার-জমিদারের ঐ সব যুক্তি একেবারেই অলীক, মিথ্যা প্ররোচনা। আসল কথা, গণতান্ত্রিক মনোভাব লইয়া প্রথমে বিচার করা দরকার—বর্তমান অবস্থায় আধিপ্রথা সম্পূর্ণ অন্যায় কিনা, তেভাগার দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত কি না। এখন জীবনযাত্রার ব্যয় বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে এবং প্রধান উপজীবিকার ক্ষেত্রে যাহাদের আয় সেই অনুপাতে বাড়ে নাই তাহারাই নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। বাংলার মধ্যবিত্তের সাধারণত প্রধান উপজীবিকা চাকুরি বা ব্যবসায়, জমির ধান বা খাজানা তাহার একটা অতিরিক্ত আয়। কিন্তু আধিয়ারের একমাত্র উপজীবিকা তাহার কৃষি। জিনিষপত্রের দাম বাড়ার সাথে সাথে, সংসারের খরচ বাড়ার সাথে সাথে মধ্যবিত্তের চাকুরির বা ব্যবসায়ের আয় বাড়া দরকার এবং ঠিক তেমনই আধিয়ার বা কৃষকের কৃষির আয় বাড়া দরকার। পঞ্চাশ বছর আগে ধানের মণ ছিল এক টাকা ছয় আনা, আজ চোরাবাজারে কুড়ি টাকা পর্যন্ত দরে বিক্রয় হইতেছে। তখন বছরে মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকা খরচে আরামে চলিত, এখন মাসে পঁচিশ টাকার কমে কষ্টেসৃষ্টেও একজনের খরচ চলে না। জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ এই যুদ্ধের আগের চেয়ে ৩৯৭ ভাগ বাড়িয়াছিল। বড় বড় চাকুরিয়াদের মোটা মাহিনা হইয়াছে, কারখানা ও ব্যবসায়ের মালিকেরা প্রচুর মুনাফা করিয়াছে, চোরাকারবারীরা ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, জোতদারের আয় অনেক গুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ছোট কেরানী বা চাকুরিয়ার আয় বিশেষ ছাড়ে নাই, ইহারা তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। যাহার এক দিকে চাউল বা জিনিষের দাম বাড়াইয়াছে তাহারাই অন্যদিকে বেতন কম দিয়াছে এবং তাহার ফলেই মধ্যবিত্তের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে।

এই দুরবস্থা দূর করিবার জন্য শোষণকারীর বিরুদ্ধে না দাঁড়াইয়া মধ্যবিত্তরা অনেক সময়ে নিজেরাও শোষণ করার পথে যাইয়া কোনমতে জীবিকা-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। কৃষককে মারিয়া নায়েব তহুরী আদায় করিয়াছে, মক্কেলকে মারিয়া মুহুরী-কেরানী সিকি আধুলি লইয়াছে, আধিয়ারকে উপবাসী রাখিয়া জমির মালিক ফসলের আধা ভাগ লইয়াছে। কিন্তু এগুলি ন্যায়সঙ্গত নয়, সব কাজগুলিই দুর্নীতিপূর্ণ ও নিতান্ত অন্যায়। কৃষক, মক্কেল ও আধিয়ার আজ এই অন্যায়ের প্রতিবাদে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে—তহুরী, ঘুষ, আধি বন্ধ কর। তাহাদের এই দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়, কোন দেশভক্ত সাধারণ মানুষ তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া এই অন্যায় শোষণ, তঞ্চকতা ও উঞ্ছবৃত্তির পথে মধ্যবিত্তের দুরবস্থার প্রতিকার হয় নাই, হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে এখনও আধি প্রথা বহাল রাখিতে চাওয়া সম্পূর্ণ অন্যায়। বর্গা জমির আয় জমির মালিকের নিজ শ্রম-লব্ধ আয় নয়। এদেশের চিরকালের আইন "যে চষে জমি তার, ফসল তার"। সাম্রাজ্যবাদী আইন সেই ন্যায্য আইন বাতিল করিয়া অন্যায় আইন চালু করিয়াছে—যে চষে জমি তার নয়, জমি যার সে হয়তো জমি চেনেও না। স্বাধীনতাকামী কোন সাধারণ মানুষ এই জঘন্য সাম্রাজ্যবাদী আইন সমর্থন করিতে পারেন না। আধিয়ার নিজের খরচে নিজের লাঙ্গল-গরুতে জমি চাষ করে। শহরের কোন একটি দোকান ঘরে কেহ যদি নিজের মূলধনে দোকান করে তাহা হইলে দোকানঘরের মালিক কি ব্যবসায়ের অর্ধেক মুনাফা দাবী করিতে পারে, না শুধু ঘরের ভাড়া বা খাজনা দাবী করিতে পারে? তেমনই জমির মালিক আধিয়ারের নিকট হইতে খাজনার বেশী কিছু দাবী করিতে পারে না। বাস্তবিক তেভাগার দাবী প্রকৃতই ভাগচাষীর ন্যূনতম দাবী। আমরা আগেই দেখিয়াছি তেভাগা হইলেও ভাগচাষীর ন্যূনতম সংসার খরচ চালাইবার মত আয় হয় না। এইবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাক, তেভাগা হইলেও জমির মালিকের আয় আগের তুলনায় কত বেশী থাকিবে। এক বিঘা জমিতে ছয় মণ ধান হইলে আগে মালিক পাইতেন তিন মণ, তাহার দাম ছিল মণ করা এক টাকা বার আনা হারে পাঁচ টাকা চারি আনা। এখন ধানের দাম মণ করা সাড়ে ছয় টাকা, চোরা বাজারের দর ধরিলে কুড়ি টাকা পর্যন্ত। তেভাগা হইলে মালিক পাইবেন দুই মণ ধান তাহার দাম ১৩ টাকা হইতে ৪০ টাকা। অপরের শ্রম-লব্ধ ফসল হইতে যদি ইহার অপেক্ষা বেশী আয় চাওয়া যায় তাহা হইলে অন্যায় লোভের আর কোন সীমা থাকে না, মনুষ্য নীতি ও ধর্ম্ম একেবারে কলঙ্কিত হয়।

ইহার পরও যদি তেভাগার দাবীর বিরুদ্ধে কাহার মনে কোন ধারণা থাকে, তাহার মূলে রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতি মোহ। কিন্তু মধ্যবিত্তের নিজের স্বার্থেই আজ এই মোহ কাটাইতে হইবে। শিল্প ধ্বংস হইয়াছে, নূতন শিল্প গড়িবার পথে সাম্রাজ্যবাদ অচলায়তন বাধা হইয়া রহিয়াছে। সরকারী জাতি গঠন বিভাগগুলির জন্য—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, সেচ প্রভৃতি বিভাগের জন্য টাকা নাই। বর্তমান ব্যবস্থার ফলেই মধ্যবিত্ত ধ্বংস হইয়া মজুরে পরিণত হইতেছে। ১৯৩১ সালের আদম সুমারি

অকৃষক ভূমিস্বত্ব ভোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় আট লাখ পরিবার ; আর ১৯৪৪ সালে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মাত্র পাঁচ লাখ সত্তর হাজার। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা বহাল থাকিলে অল্পদিনের মধ্যেই মধ্যবিত্ত বাংলার বুক হইতে বিলুপ্ত হইবে। স্বাধীনতার আন্দোলন এই জঘন্য সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া নূতন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তোলার আন্দোলন।

আজ একথা পরিষ্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আধিয়ার, কৃষক, মধ্যবিত্ত ইহাদের সকলেরই শত্রু এক—সাম্রাজ্যবাদ-জমিদার-জোতদার-মজুতদার। সকলে মিলিয়া এই সাধারণ শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে শোষণ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়। আধিয়ার-কৃষক-মধ্যবিত্ত সকলেই রক্ষা পায়। তাই আধিয়ারের ন্যায্য দাবী মানিয়া লওয়ার ভিত্তিতে আধিয়ার ও মধ্যবিত্তকে এক হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। মধ্যবিত্ত লড়িবে আধিয়ারকে বাঁচাইবার জন্য। আধিয়ার লড়িবে মধ্যবিত্তের দাবী আদায়ের জন্য।

মিলিত সংগ্রামের ডাক

এই সব কথা মানিয়া লইলেও শুধু মধ্যবিত্তের মনে যে প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিতে পারে তাহা হইতেছে : (ক) এখন যে সমাজ ব্যবস্থা আছে তাহা বদল করিতে না পারা পর্যন্ত কেমন করিয়া গরীব মধ্যবিত্তের সংসার চলিবে, (খ) বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর নূতন সমাজে মধ্যবিত্তদের কি কোন স্থান থাকিবে?

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় লাভবান হইতেছে, শুধু মালিক, বড় বড় সরকারী কর্মচারী, আর জমিদার জোতদার মজুতদার। জমিদার-নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটার তালিকা হইতে দেখা যায়, বাংলাদেশে বড় জমিদারের সংখ্যা দুই হাজার। ছোটবড় কারখানার মালিকের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশী নয়। সারা বাংলায় বড় জোতদার-মজুতদারের সংখ্যা অনুমান এক লাখ পরিবারের বেশী নয়। ভূমিস্বত্বভোগী পঁচাত্তর লক্ষ পরিবার বাংলাদেশে আছে (দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন)। এই একলাখ কয়েক হাজার পরিবার ব্যতীত অবশিষ্ট সকলেই শোষিত মজুর, আধিয়ার, কৃষক বা মধ্যবিত্ত। মজুর তাহার জীবিকার জন্য কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করিতেছে, কৃষক তাহার আয় বাড়াইবার জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম করিতেছে জমিদার প্রভৃতির বিরুদ্ধে। এই সংগ্রাম ছাড়া শোষিতদের কাহারও বাঁচিবার কোন পথ নাই। মধ্যবিত্তদেরও সংগ্রাম করিতে হইবে এই জমিদারী প্রথা ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সেই পথেই তাহাদের চাকুরির আয় বাড়িবে। মধ্যবিত্তের এই নূতন সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ডাক-তার-টেলিফোন বিভাগের মধ্যবিত্ত সরকারী কর্মচারীরা সারা ভারতব্যাপী ধর্মঘট চালাইয়া তাঁহাদের বেতন, চাকুরি ও বাঁচিবার দাবী কতক আদায় করিয়াছেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মধ্যবিত্ত চাকুরিয়ারা বেয়ারা, দারোয়ানদের সহিত মিলিয়া ৪৫ দিন ধর্মঘট চালাইয়া নিজেদের দাবীর কতকাংশ পূরণ করিয়াছেন। সারা ভারতের রেলওয়ে কর্মচারীরা, স্টেশন-মাস্টাররা রেলমজুরের সহিত মিলিয়া ধর্মঘটের প্রস্তুতি করিয়া নিজেদের দাবীর কিছু কিছু মানিতে সরকারকে বাধ্য করিয়াছেন। গ্রামের গরীব প্রাইমারী শিক্ষকেরা বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবীর জন্য সংঘবদ্ধ হইয়াছেন, আদালতের কেরানীরাও সমিতি গঠন করিয়া নিজেদের দাবী লইয়া আন্দোলন করিতেছেন। এই লড়াই ও আন্দোলনের ফলে তাঁহাদের বেতনাদি কিছুটা বাড়িয়াছে বলিয়াই আজ মধ্যবিত্তরা টিকিয়া আছেন। এই লড়াই ও আন্দোলন আরও সচেতনভাবে, আরও সংগঠিতভাবে মজুর কৃষকের সহিত মিলিয়া চালাইতে পারিলে মধ্যবিত্তের ন্যায্য দাবী কেহ উপেক্ষা করিতে পারিবে না। মধ্যবিত্তের বাঁচিবার ইহাই একমাত্র পথ। কেহ কেহ মধ্যবিত্ত পরিবারের গরীব বিধবা অক্ষম লোককে দেখাইয়া বলেন ইহাদের উপায় কি হইবে? ইহাদের অন্নসংস্থানের জন্য সরকারী ও বেসরকারী তরফ হইতে উপযুক্ত বন্দোবস্তই একমাত্র উপায়। আধিপ্রথা তাঁহাদের বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান শোষণ-মূলক সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া বাংলাদেশে নূতন সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। বর্তমানে যাঁহারা মধ্যবিত্ত, ভবিষ্যতে সমাজে তাঁহাদের স্থান হইবে আরও উচ্চে, তাঁহাদের কাজ হইবে আরও সম্মানের, সমাজের মঙ্গলজনক ও প্রয়োজনীয় কাজে তাঁহাদের ক্ষেত্র হইবে আরও প্রসারিত। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থা ভাঙিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে যে নূতন গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে, সেখানে প্রতি গ্রামে স্কুল থাকিবে, প্রত্যেকের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। শিক্ষকদের জীবনধারণের উপযুক্ত ন্যায্য বেতনের ব্যবস্থা হইবে। বাংলা দেশে চুরাশী হাজার গ্রাম আছে, তাহার জন্য চার লাখ শিক্ষক, পরিদর্শক ও কর্মচারীর দরকার হইবে (সরকারী যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় ৫০,০০০ হাজার স্কুলের জন্য আড়াই লাখ কর্মচারীর প্রয়োজন ইহা বলা হইয়াছে)। প্রতি ইউনিয়নে অন্ততঃ একটি ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল খুলিতে হইবে। বাংলাদেশে পাঁচ হাজারের বেশী ইউনিয়ন আছে। ইহা পরিচালনার জন্য অন্তত এক লক্ষ ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স ও কর্মচারীর দরকার। সারা বাংলার সেচ ও জল নিকাশ ব্যবস্থার জন্য, রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য অন্তত দুই লক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, সাব ওভারসিয়ার ও রোড সরকারের প্রয়োজন হইবে। বাংলাদেশে নূতন কারখানা ও শিল্পের বিরাট প্রসার করিতে হইবে, তাহার জন্য একাউন্ট্যান্ট, ম্যানেজার, কেরানী, ফোরম্যান, পরিদর্শক প্রভৃতি লইয়া বহু লক্ষ লোকের দরকার হইবে। জমিদারী প্রথা উঠাইয়া দিয়া সরাসরি জমির ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা করিলে আদায়ের জন্য অন্তত এক লাখ কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। বর্তমান সমাজ ও শাসনব্যবস্থায় এই দেশ গঠনের বিভাগগুলি অবহেলিত হয়, সাম্রাজ্যবাদী আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বাজেটের মোটা টাকা খরচ হয়। তাই মধ্যবিত্ত বেকার ও গরীব। ইহার বদলে বাংলার নূতন সমাজ গড়িবার কাজে দেশভক্ত মধ্যবিত্ত আগুয়ান হইলে, সুখী মজুর, সুখী কৃষক, সুখী মধ্যবিত্তের নূতন বাংলাদেশ গড়িয়া উঠিবে।

মনে হইতে পারে, এই পরিকল্পনা মনোরম, কিন্তু ইহার জন্য টাকা আসিবে কোথা হইতে? জমিদারী প্রথা উঠিয়া গেলে ভূমি ট্যাক্সের হার শতকরা পঞ্চাশ টাকা কমাইয়া দিলেও তিন কোটি টাকার বদলে অন্তত আটকোটি টাকা আদায় হইবে, বিলাতের নিকট ভারতবর্ষের তেরশত কোটি টাকা ষ্টার্লিং ব্যালান্স পাওয়া আছে, স্বাধীন হইলে সে টাকা আমরা আদায় না করিয়া ছাড়িব না। তাহা আদায় হইলে বাংলার ভাগে পড়িবে অন্তত দেড় শত কোটি টাকা। বাংলাদেশে বিলাতী ব্যবসায়ীর প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা মূলধন খাটিতেছে,

এই টাকা স্বাধীন বাংলা বাজেয়াপ্ত করিবে। সুতরাং এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করিবার জন্য টাকার অভাব হইবে না।

পৃথিবীর দেশে দেশে আজ মুক্তি ও নবজীবনের নবীন স্পন্দন জাগিয়া উঠিয়াছে। কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত এক সাথে মিলিয়া নূতন গণতন্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে ইউরোপের পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লোভিয়া ও আরও অনেক দেশে আজ গরীব জনসাধারণের জয় হইয়াছে। ছোট্ট ইন্দোনেশিয়াতেও আজ মজুর কৃষক মধ্যবিত্ত মিলিয়া নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে রচনা করিতেছে। আমাদের দেশেও মজুর, আধিয়ার ও কৃষকের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইয়া মধ্যবিত্তেরা তাহাদের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইলে আমরাও বাংলাদেশের মুক্তি ও নবজীবন, নূতন গণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে পারিব।

বাংলার গৌরবময় মধ্যবিত্ত-সন্তানের দল, আসুন, আধিয়ারের ন্যায্য দাবী, কৃষকের ন্যায্য দাবী, মজুরের ন্যায্য দাবী, মধ্যবিত্তের ন্যায্য দাবীর জন্য যুক্ত সংগ্রামে নির্ভয়ে আগাইয়া আসুন। জালালাবাদের শক্ত পাহাড়ের বুকে কচি হৃদয়ের তপ্ত শোণিত ঢালিয়া অমর শহীদেরা স্বাধীন নূতন দেশের জন্য লড়িয়াছে। বালেশ্বরের প্রান্তরে এই নবীন বাংলার জন্য বাঘা যতীন বীরের মত লড়িয়া মরিয়াছে। এই স্বাধীন সুখী বাংলা গড়িবার জন্য বাংলার মধ্যবিত্ত-সন্তান হাজার হাজার বিপ্লবী যুবক ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়াছে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে গিয়াছে, লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ কারাবরণ করিয়াছে। ইহাদের স্মৃতি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর বুকে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। আজও সেই ঐতিহ্য স্মরণ করিয়া বাংলার মধ্যবিত্ত আগাইয়া চলিয়াছে। স্মরণীয় ২৯শে জুলাই-এর দিনে অফিসের মধ্যবিত্ত, মজুরের ডাকে মজুরের হাতে হাত মিলাইয়া সাধারণ ধর্মঘট করিয়া বাংলার ইতিহাসে নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। এই নূতন পথের দিকে তাকাইয়া, পুরাতনের মোহ কাটাইয়া আসুন আপনারা আধিয়ারের তেভাগার দাবী মানিয়া লন, কৃষকের জমির দাবী স্বীকার করুন, মজুরের বাঁচিবার দাবী নিজের দাবী বলিয়া গ্রহণ করুন। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া শেষবারের মত মৃতপ্রায় সাম্রাজ্যবাদের বুকে চরম আঘাত করি, তাহারই ধ্বংসস্তূপের উপর মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্তের নূতন বাংলা গড়িয়া তুলি।

[আলোচ্য প্রতিবেদনটি 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার' দ্বারা প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে গৃহীত। এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল।

প্রতিবেদনটি 'সমাজ সমীক্ষা' (ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেস-এর মুখপত্র), অষ্টম বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা ১৯৯৬ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত হল। সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ]

শিল্পী : চিত্তপ্রসাদ

শুনেন যত দেশবাসী শুনেন ভাই গরীব চাষী

নিবারণ পণ্ডিত

শুনেন যত দেশবাসী শুনেন ভাই গরীব চাষী শুনেন সর্বজন
কৃষক দরদী মণি সিংহের বিবরণ
সংক্ষেপেতে দুই এক কথা হে করিব বর্ণন ॥

একদিন মণি আচম্বিতে দেখে সুসুং রাজবাড়িতে হাজং বহুলোক
জঙ্গী চেহারা তাদের ভয়ে ভীতু মুখ
কারণ জানিতে মণি হে হইল উৎসুক ॥
ডাকি এক হাজং এরে নিয়া মণি কিছুদূরে জিজ্ঞাসে কারণ
কি কারণে তোমাদের ভয়ে ভীতু মন
বিস্তারিয়া কহ শুনি হে সব বিবরণ ॥
হাজংটি কাঁদিয়া বলে শুন বাবু তাহা হলে (আমরা) দোষী সর্বজন
ধান আনিয়াছিলাম নব্বুইয়ের ওজন
একশ তোলায় সের দিতে হে কয় পেয়াদাগণ ॥
নব্বুই তোলাতে সের, ধান দেই টংকের জানি সর্বদায়
এখন সের দিতে কয় একশ তোলায়
এই দোষে হইয়াছি দোষী হে ছাড়ে না পেয়াদায় ॥
আসিয়াছি কোন সকালে ক্ষুধায় এখন পেট জ্বলে পাইনা বিদায়
বিকালে আসিবেন বাবু বাহির আঙ্গিনায়
পেয়াদারা জানাইয়া গেল হে কর্কশ ভাষায় ॥
হাজং এর কথা শুনি অবাক হইয়া বলে মণি হবে প্রতিকার
রক্ষা করব তোমাদের প্রতিজ্ঞা আমার—
বন্ধ করব জুলুমবাজী হে অন্যায় অবিচার ॥
মণি আপন জমি বাড়ি সমিতিতে দান করি করেন আবেদন
কে কে হবে কৃষককর্মী বলো এইক্ষণ
সংগ্রাম চালাইতে হবে হে জীবন-মরণ ॥
তারপরে এক সভা হলো নিয়া হাজং কোচ ডালো যতেক কিষাণ
গারো বাঙালি ছেলে মেয়ে হিন্দু মুসলমান
সবারে চিনাইলো মণি হে রক্ত নিশান ॥
ললিত হাজানের যত কর্মী এলো শত শত ফৌজি দশ হাজার
মেয়েরা আসিল সেজে কয়েক হাজার
টংক প্রথাটি শেষে হে হইল চুরমার ॥

তেভাগার লড়াই

মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল

কৃষক সমিতির নেতৃত্বে তেভাগার দাবিতে যথাসময়ে কৃষকদের আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ল ভাগীদার বা ভাগচাষীদের (পূর্ববঙ্গে বর্গাদার এবং উত্তরবঙ্গে আধিদার বা আধিয়ার নামে পরিচিত) মধ্যে। তাদের প্রধান সহযোদ্ধা হল খেতমজুররা। আন্দোলন হল অল্পবিস্তর পরিমাণে ১৯টি জেলায়। সমিতির হিসাবে প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক জড়িত হল এই আন্দোলনে। আন্দোলনের প্রধান এলাকা ছিল উত্তরবঙ্গ—রংপুর, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলা—আর ২৪ পরগনা জেলার আবাদ এলাকা, যেখানে জোতদারী শোষণ ছিল সবচেয়ে তীব্র এবং বর্গাদারের সংখ্যা ছিল খুব বেশি।

ডিসেম্বরের মধ্যে ব্যাপকভাবে আধিয়াররা ধানকাটা ও তোলার কাজ সেরে ফেলে। আন্দোলনের এই প্রথম পর্যায়ে বাধা বেশি এল না। জোতদাররা প্রথমে ধারণা করতে পারেনি যে এতকালের লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত কৃষকরা এতখানি উৎসাহী ও একতাবদ্ধ হয়ে লড়তে পারবে। কিন্তু অবস্থা দেখে তারা সরকারী সাহায্য চাইলে। বহু জায়গায় পুলিস ক্যাম্প বসল। পুলিসী হামলা শুরু হল এবং বাড়তে লাগল। কৃষকদের সঙ্গে সংঘর্ষও বাধতে লাগল। বড় বড় জোতদারদের দালাল ও গুণ্ডারাও সক্রিয় হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে প্রকাশ পেলে আন্দোলনের দুর্বলতা। কৃষকদের সংগ্রামী চেতনার অবস্থা না বোঝার ফলে মৌভোগ সম্মেলনে তেভাগা দাবির আন্দোলনের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। কৃষক কাউন্সিল যখন আন্দোলনের সিদ্ধান্ত করলে তখনো সেজন্য উপযুক্ত প্রস্তুতির দিকে নজর দিলে না, কৃষক বাহিনী গঠনের এবং তালিম দেবার ব্যবস্থা হল না। এ রকম একটা সুস্পষ্ট শ্রেণী সংগ্রামের বিরুদ্ধে শত্রু শ্রেণীর ও সরকারের হামলা যে আসবেই তা কাউন্সিল ধারণা করতে পারলে না। শ্রেণী চেতনার অভাব না হলে তা ঘটতে পারত না।

কৃষক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত

শুধু যে কৃষক বাহিনী গড়া হয়নি তাই নয়, ১৯৪৩-৪৪ সনে যে হাজার হাজার কৃষক ভলন্টিয়ার জেলায় জেলায় সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং যারা রিলিফের ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে সাহায্য করেছিল, তাদের সংগঠনও ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে ভেঙ্গে গেল। আন্দোলনের উপর যখন পুলিসের ব্যাপক আক্রমণ চলছে, জেলায় জেলায় গুলি চলা ও হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে, লুট-তরাজ, গৃহদাহ, ঘর ভাঙ্গা ও নারী ধর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে, হাজারখানেক কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তিন হাজারের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে, তখন (১০-১৪ জানুয়ারী ১৯৪৭) প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিল স্বীকার করছে যে আন্দোলন শুরু হবার সময় আক্রমণের কথা চিন্তা করা হয়নি, লড়াইয়ের কায়দার "সমস্যা আমরা ততটা বুঝিতে পারি নাই। বুঝি নাই বলিয়াই সংগঠন ও স্বেচ্ছাবাহিনী শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করি নাই। আমলাতন্ত্র এই দুর্বলতার সুযোগে আমাদের সংগঠনের দুর্বল এলাকায় প্রথম আঘাত হানিয়াছে। গোটা আন্দোলনকেই ধ্বংস করিবার জন্য আক্রমণ শুরু করিয়াছে।" (ফসল ও জমির লড়াই, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭, পৃ. ৫।)

কাউন্সিল তখন সিদ্ধান্ত করে কৃষক ফৌজ গঠন করতে ও তাকে শিক্ষা দিতে হবে আর আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংগ্রাম পরিষদ তৈরি করতে হবে। আরো সিদ্ধান্ত হয় যে ২৫—৩১ জানুয়ারি (১৯৪৭) দমন নীতি বিরোধী সপ্তাহ পালন করা হবে।

এই দমন ব্যবস্থা ও আন্দোলন ভাঙ্গবার চেষ্টার জন্য কৃষক কাউন্সিল সাম্রাজ্যবাদকে অথবা লীগ (সুহরাওয়ার্দি) মন্ত্রীসভাকে বা তার শ্রেণী স্বার্থকে দায়ী করছে না, দায়ী করছে পুলিস ও আমলাতন্ত্রকে—"আমলাতন্ত্র মন্ত্রীসভারই নামকরণে উপরোক্ত জঘন্য দমন নীতি চালাইতেছে আর কোটি কোটি কৃষকের মনে, বিশেষত মুসলমান কৃষকের মনে লীগ মন্ত্রীসভার প্রতি শ্রদ্ধার আসন চুরমার করিয়া সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি হাসিল করিতেছে।"

লীগ মন্ত্রীসভার ধাপ্পাবাজি

ইতিমধ্যে মন্ত্রীসভা প্রেসনোট মারফত তেভাগা দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করে। তাই কৃষক কাউন্সিল তার প্রস্তাবে দাবি করে: "এই বছরের ফসল সম্পর্কেই যাহাতে আধির বদলে তেভাগা ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য অবিলম্বে তেভাগা অর্ডিন্যান্স জারি করা হউক।" (ঐ, পৃ. ৮)

তার অল্প দিন পরেই গবরমেন্ট জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য একটি বিল গেজেটে প্রকাশ করে এবং তা বিধান সভার বাজেট অধিবেশনে পেশ করা হবে স্থির হয়। এই বিলের ভূমিকায় বলা হয়েছিল কৃষককে জমি দিতে হবে। প্রজা বলতে প্রকৃত চাষীকে বোঝাবে, রাইয়ত জমির দখলীস্বত্ব পাবে এবং সরাসরি সরকারের সহিত সম্পর্কে আসবে, মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা বন্ধ হবে, পরিবার পিছু খাস জমি ১০০ বিঘা বা মাথাপিছু পাঁচ বিঘা (যেটার পরিমাণ বেশি) রেখে বাকি খাস জমি সরকার দখল করতে পারবে এবং সেই জমি ভূমিহীন মজুর, বর্গাদার ও গরিব চাষীদের মধ্যে বিলি করা হবে। আরো বলা হয় বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা চলবে না, কমপক্ষে ফসলের তিনভাগের দু ভাগ তার প্রাপ্য হবে এবং ভবিষ্যতে নতুন জমি বর্গা বিলি করা নিষিদ্ধ হবে।

কৃষক সভা এই বিলকে প্রগতিশীল বলে অভিনন্দন জানায়, তবে তার দোষ ত্রুটির সমালোচনাও করে। সভা এক রকম নিশ্চিত হয়েছিল যে বিলটা আইন সভায় আসবে এবং পাসও হয়ে যাবে। তার ফলে তেভাগা আন্দোলন সম্বন্ধেও কিছু শৈথিল্য এসে পড়ে। দমন পীড়ন সত্ত্বেও আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের কাজ, আধিয়ারের নিজ খামারে ধান তোলার কাজ শেষ হয়েছিল। এই বিল দেখে মনে হয়েছিল আন্দোলনের বাকি কাজও সমাধা করা যাবে, বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

কিন্তু কাজে তা ঘটল না। বিলটি গেজেটে প্রকাশ করা হলেও আইন সভায় পেশ করা হল না। আন্দোলন দমন করবার উদ্দেশ্যে ধাপ্পা দেবার জন্যই এই বিল প্রচার করা হয়ে থাকুক, অথবা লীগের ও তার সরকারের আভ্যন্তরীণ মত-বিরোধের কারণেই হ'ক, বিল পাস করা দূরের কথা, আইন সভাতে পেশ করাও হল না। পক্ষান্তরে প্রচণ্ডভাবে দমনের ব্যবস্থা করে বহু ক্ষেত্রেই আন্দোলন ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা হল। কৃষকরা ফসল ধরে রাখবার ও তেভাগা আদায় করবার জন্য সর্বত্র বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করলে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা সফল হল না।

পুলিসী হত্যাকাণ্ড ও বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ

আন্দোলন যেমন ব্যাপক ও তীব্র হয়েছিল, দমন ব্যবস্থাও তেমনি ভয়ঙ্কর হল। বহু জায়গায় গুলি চলল, অনেক কৃষক শহীদ হলেন। গুলি চলল জলপাইগুড়িতে, দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দর, ঠুমনিয়া, ঠাকুরগাঁও ও খাঁপুরে, ২৪ পরগনায়। আরো চলল রংপুর, ময়মনসিং ও খুলনা জেলায়। মোট ৭০ জনের বেশি কৃষক—হিন্দু, মুসলমান ও আদিবাসী পুরুষ ও নারী—প্রধানত পুলিসের গুলিতে এবং জোতদারের গুলিতেও নিহত হলেন এই আন্দোলনে। একমাত্র দিনাজপুর জেলাতেই শহীদ হলেন ৪০ জন কৃষক, গ্রেপ্তার হলেন ১২০০ এবং আহত হলেন প্রায় দশ হাজার।

এই তেভাগা আন্দোলন চলা কালে মুসলিম লীগ সরকারের পুলিস গুলি চালিয়েছিল ২২ বার, নারী ধর্ষণ করেছিল ২৪ পরগনা, রংপুর, দিনাজপুর, মেদিনীপুর ও ময়মনসিং জেলায়। বিভিন্ন জেলায় বিস্তর পুলিস ক্যাম্প বসানো হয়েছিল, তার মধ্যে দিনাজপুরেই ৩৫টি। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৩১১৯ জনকে এবং দীর্ঘকাল ধরে তাদের মামলা চলেছিল। আইন ও শৃঙ্খলার অজুহাতে সরকারের এই সমস্ত দমন ব্যবস্থার সাফাই দিতে গিয়ে লীগের মুখ্যমন্ত্রী সুহরাওয়ার্দি ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ বিধান সভায় তাঁর বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেছিলেন যে কেবলমাত্র খাঁপুর গ্রামেই তাঁর সশস্ত্র পুলিস ১২১ রাউণ্ড গুলি চালিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি ঐ গ্রামের ২০ জনকে হত্যা করেছিল।

এই সব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দুটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিরির বন্দর থানার বাজিতপুর গ্রামে ৪ জানুয়ারি ১৯৪৭ ভোরে নিরীহ গরিব খেতমজুর সমিরুদ্দীনের বাড়ি পুলিস এসে ঢোকে। পুলিস তাঁকে ডেকে নিয়ে যেতে চাইলে তাঁর বোন প্রতিবাদ করেন এবং পুলিস তাঁর পায়ে সংগিনের খোঁচা মেরে আহত করে। পরে জোর করে সমিরুদ্দীনকে নিকটের মাঠে নিয়ে যায়। হৈহল্লার মধ্যে অনেক লোক জুটে গেছে সেই গ্রাম ও আশপাশের গ্রাম থেকে।

সাঁওতাল কৃষক জোয়ান শিবরাম তার একজন। হঠাৎ পুলিস সমিরুদ্দীনকে গুলি করে মারে, কেন কেউ জানে না। তিনি তখনি নিহত হন।

সঙ্গে সঙ্গে শিবরাম হাতের তীরধনুক চালান হত্যাকারী পুলিসকে লক্ষ্য করে। শীতের ভোরে তার মোটা ওভারকোট ভেদ করে তীর তার হৃৎপিণ্ডে গেঁথে যায় এবং সে তখনি মারা পড়ে। তারপরই অবশ্য অন্য একজন পুলিসের গুলিতে এই বীর জোয়ানও শহীদ হন।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে খাঁপুরে, এখন পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট মহকুমায়। ২০ ফেব্রুয়ারি শীতের ভোরে সশস্ত্র পুলিসের গাড়ি আসছে গ্রামে কৃষক কর্মীদের ধরপাকড়ের উদ্দেশ্যে। খবর পেয়ে খেতমজুর চিয়ার সাই শেখের নেতৃত্বে কৃষকরা গ্রামে ঢোকবার কাঁচা রাস্তা কেটে দেন। গাড়ি আর এগোতে পারে না। পুলিস গাড়ির মধ্যে থেকেই গুলি চালাতে থাকে। কৃষকরা টায়ার কেটে গাড়ি অচল করেন। প্রচণ্ড লড়াইয়ের মধ্যে খাঁপুরের অনেক কৃষক নরনারী হতাহত হন। অন্তত ১৪ জন সেখানেই মারা যান, পরে আরো আটজন হাসপাতালে মারা যান। এই একটি মাত্র ঘটনায় একখানি গ্রামের মোট ২২ জন শহীদ হন।

খাঁপুরের কৃষকদের এই বীরত্বের তুলনা নাই। লীগ সরকারের পুলিস এক সঙ্গে এতগুলি কৃষকের জীবন নিয়ে খাঁপুরকে এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছে। প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি কৃষক সভা এখানে তার বার্ষিকী পালন করে। কৃষক সভার উদ্যোগে একটি পাকা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভও তৈরি করা হয়েছে এখানে।

এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে প্রাদেশিক কৃষক সভা থেকে আমি সেখানে যাবার জন্য ২৩শে ফেব্রুয়ারি রওনা হই। সঙ্গে ছিলেন পি. আর. সি-র ডাক্তার বিজয় বসু বেশ কিছু পরিমাণ ওষুধ পথ্য নিয়ে এবং "জনযুদ্ধের" একজন রিপোর্টারও ছিলেন। বালুরঘাট শহর থেকে পরদিন সকালে মোষের গাড়িতে খাঁপুর যাবার সময় পথে জিপে করে পুলিস গিয়ে আমাদের আটকায় ও শহরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং দুমাসের জন্য বহিষ্কার আদেশ দেয়। আমরা আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পাই না।

তেভাগা চাই !

তেভাগার দাবি এমনভাবে এই কৃষকদের মাতিয়েছিল যে এটাই যেন তাদের জীবনের একমাত্র কাম্য হয়ে পড়েছিল। এ সম্বন্ধে একটি করুণ কাহিনী শুনেছিলাম। খাঁপুরের আহতদের বালুরঘাট হাসপাতালে থাকা কালে একজন যখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিলেন তখন শেষ অবস্থা বুঝে ডাক্তার তাঁকে জিজ্ঞেস করেন তাঁর কী চাই। মৃত্যুপথের যাত্রী সেই আধিয়ার কৃষক ক্ষীণ কণ্ঠে তাঁর জীবনের শেষ কথা উচ্চারণ করেন, তেভাগা চাই!

তেভাগা আন্দোলনের মধ্যে ভুলত্রুটি যাই থাকুক, তার ফলাফল যাই হ'ক, বাংলাদেশের কৃষক সভার ইতিহাসে এটাই ছিল তখন পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যাপক ও শক্তিশালী আন্দোলন। তার নাম ও ছাপ আজও ব্যাপকভাবে কৃষকদের মধ্যে রয়ে গেছে। এই আন্দোলনের দাবিকে ভিত্তি করে পরে আইন রচনাও করা হয়েছে। এই দাবিতে সংগঠিত এলাকায় ভাগ আদায়ও হয়েছে।

এই আন্দোলন কেবল বর্গাদাররা চালায়নি, ব্যাপকভাবে খেতমজুররাও তাতে যোগদান করেছিল সমিরুদ্দীন ও চিয়ার সাই ছিলেন খেতমজুর। কিন্তু বর্গাদাররা তাদের সাহায্যে তেভাগা আদায় করলেও তারা কিছুই পায়নি ; বর্গাদাররা ফসলের অর্ধেকের চেয়ে যতটা বেশি পেয়েছিল তার থেকে কিছু অংশ আদায় করে খেতমজুরদের দেবার জন্য কোন সাংগঠনিক ব্যবস্থা করা হয়নি। কৃষকসভার নেতৃত্বের দিক থেকে এই ত্রুটির জন্য অনেক খেতমজুরের একটা ন্যায়সংগত অভিযোগ থেকে গিয়েছিল। তেভাগা আন্দোলন সম্বন্ধে যে যাই বলুক, তেভাগা দাবির বিরুদ্ধে কারো কোন বক্তব্য শোনা যায়নি। বাংলার মন্ত্রীসভা দাবি স্বীকার করে বিল পর্যন্ত প্রকাশ করেছিল। এই আন্দোলন চলা কালে গান্ধীজি যখন নোয়াখালি ভ্রমণ করছিলেন তার মধ্যে আমিশাপুরের নিকট নবগ্রামে তেভাগার দাবি ও লড়াই সমর্থন করেছিলেন (৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৭)। পরে (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭) তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন তিনি জোতদারদের পরামর্শ দেবেন স্বেচ্ছায় তেভাগা দাবি মেনে নিতে এবং তখন প্রকাশিত তেভাগা বিলকে তিনি সাম্প্রদায়িক বিষয় বলে স্বীকার করেন না। এই আন্দোলন যে যথেষ্ট সফলতা লাভ করতে পারেনি তার প্রধান কারণ তার নেতৃত্বের মধ্যে কৃষকদের শ্রেণী স্বার্থ সম্বন্ধে সংস্কারবাদী ধারণা এবং তার ফলে আন্দোলন পরিচালনা সম্বন্ধে উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও ব্যবস্থার অভাব। কিন্তু আন্দোলনের মূলে যে কৃষকদের মধ্যে তাদের শ্রেণী দাবি সম্পর্কে গভীর ও তীব্র বিক্ষোভ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ১৯৪৬ সনে কলকাতায়, বাংলাদেশে এবং সারা উত্তর ভারতে যে সমস্ত ব্যাপক ও রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছিল তাতে সরকারী হিসাবে ১২৪০০ মানুষের মৃত্যু হয়। (Henderson, Under-Secretary of State for India, in the House of Commons on 4. 3. 1947.) শুধু বাংলাদেশেও অক্টোবর ১৯৪৬ এ নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার হাঙ্গামায় ২১৬ জন হিন্দু ও একজন মুসলিম মারা যায় এবং পুলিস ও মিলিটারির গুলিতে একজন হিন্দু ও ৭৫ জন মুসলিম মারা যায়। (Parliamentary Secretary to the Chief Minister, the Bengal Assembly on 21.4.1947) এই অবস্থায় গভীর শ্রেণী চেতনা ছাড়া সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পর মাত্র দু মাসের মধ্যে এমন ব্যাপক ও শক্তিশালী শ্রেণী সংগ্রাম সম্ভব হত না।

অহল্যা মায়ের গান

বিনয় রায়

আর কতকাল বল, কতকাল সইব এ মৃত্যু অপমান।
প্রাণ আর মানে না ॥
শহরে বন্দরে চাষীর কুটিরে
নরখাদক দলের অভিযান।
প্রাণ আর মানে না ॥
কমলাপুর শহীদ ডাকে, আয়রে আয় আয়রে,
ডোহাঁজোড়ার শহীদ সুরেন
তাদের পানে চায়রে চায়রে
চন্দন পিঁড়ির সরোজিনী অহল্যার মা—
তাদের খুনের অর্পণ হল না
সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে ফলাল সে সোনা
তার মা বোনের রক্তে হল সোনার মাটি লোনা,
রক্তের ধার বেঁধে মোদের প্রতি গ্রাসে গ্রাসে
কবে বল কবে শুধব তা
প্রাণ আর মানে না ॥
শুনি নাকি স্বরাজ এখন, এই কি তার নমুনা
মা-বোনের ইজ্জত লোটে কোন স্বরাজের সেনা
চরখা নয় খদ্দর নয় আর—নয় অহিংসার বুলি
বুকে বেঁধে গরম সীসার গুলি—এ আর সহে না।
অহল্যা মা, তোমার সন্তান জন্ম নিল না
ঘরে ঘরে সেই সন্তানের প্রসব যন্ত্রণা
শত কংস ধ্বংস করে, যে শিশু জন্মিবে
মাঠে মাঠে তারই জল্পনা।
এ আর স'ব না ॥

জলপাইগুড়ির আধিয়ার আন্দোলন

ডাঃ শচীন দাশগুপ্ত

জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের কৃষক আন্দোলন নিয়ে অনেকে লিখেছেন। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু তথ্য ও আলোচনা স্থান পেয়েছে সেই-সব লেখায়। কিন্তু এই অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন, আজও দুঃখজনকভাবে অনুপস্থিত। তেভাগার পূর্ববর্তী আধিয়ার আন্দোলন প্রায় সর্বত্র উপেক্ষিত। কিন্তু আধিয়ার আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারলে পরবর্তীকালের তেভাগা আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তারকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। জলপাইগুড়ির আধিয়ার আন্দোলন যে চেতনা ও অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়ে গেছে, তেভাগার সময়কার অত্যাচার ও নিপীড়ন-এর বিরুদ্ধে তা ছিল কৃষক সমাজের প্রতিরোধের পাথেয়।

কৃষক সমিতি গঠন

কংগ্রেসের মধ্যে আমরা যারা বামপন্থী-রূপে পরিচিত ছিলাম, তাদের উদ্যোগে ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি গঠিত হয় জলপাইগুড়ির বুকে। তার আগেই গঠিত হয়েছে জেলা ছাত্র সমিতি। কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ ছাত্র-যুব-মধ্যবিত্তদের ঐক্যবদ্ধ করার সংগঠিত প্রচেষ্টা শুরু হয় সেই সময় থেকেই। বিরাট-সংখ্যক ছাত্র-যুব সমবেত হন কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি ও জেলা ছাত্র সমিতির পতাকাতলে।

মার্কসীয় পঠন-পাঠন ও প্রাদেশিক কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে আমরা তখন ভারতে শুরু করেছি জঙ্গী কৃষক আন্দোলনের কথা। সেই সময় জলপাইগুড়িতে এলেন গুরুদাস রায়। এসেই সব সময়ের কর্মীরূপে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। বামপন্থী আন্দোলনকে শুধুমাত্র শহরের মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার দাবি ওঠে সি.এস.পি.-র মধ্যে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়,

কংগ্রেস থেকে আলাদাভাবে কৃষকদের নিজস্ব শ্রেণী-সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। প্রাদেশিক নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮, জেলার কৃষক সংগঠনী সমিতি গঠিত হয়।

কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছিলেন নিম্নলিখিতরা : সভাপতি—চুনীলাল বসু, সাধারণ সম্পাদক—গুরুদাস রায়, প্রচার সম্পাদক ও স্বেচ্ছাসেবক ভারপ্রাপ্ত—মাধব দত্ত, কোষাধ্যক্ষ—শচীন দাশগুপ্ত। কৃষক সমিতি গঠন জেলার কৃষক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সন্দেহ নেই। কিন্তু তা ছিল ভবিষ্যৎ আন্দোলনের প্রস্তুতির কাঠামো মাত্র। কারণ যেটা লক্ষণীয় তা হল, সমিতি গঠিত হয়েছিল মূলত শহরের মধ্যবিত্তদের নিয়ে। কংগ্রেসকর্মী হিসেবে পূর্বে আমাদের যোগাযোগ ছিল, মূলত জোতদার ও ধনী কৃষকদের সঙ্গে। কৃষকদের প্রকৃত অবস্থা, তাদের শোষণের রূপ, কৃষক সমাজের শ্রেণীবিন্যাস—এই মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা ছিল খুব ভাসা-ভাসা। তাই আন্দোলন গড়ার ক্ষেত্রে সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করা ছিল সংগঠনের প্রাথমিক কাজ। গড়ালবাড়ি, হাড়িভাসা, বেলাকোবা প্রভৃতি অঞ্চলে লালঝাণ্ডা সহ আমাদের যাতায়াত শুরু হয়, কৃষক সমিতির সাধারণ বক্তব্যকে সামনে নিয়ে। হাট মিটিং, বৈঠক মিটিং ইত্যাদির মাধ্যমে তৎকালীন কৃষি সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত। প্রথম পর্যায়ে আমাদের ভূমিকা ছিল মূলত আলোক-এর। জ্ঞানের আদান-প্রদানের মাধ্যমে আমাদের সামনে ফুটে উঠল কৃষিব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র, যা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, আধিয়ার সমস্যাই হল এখানকার ভূমিব্যবস্থার মূল সমস্যা। যে-কোনো জঙ্গী আন্দোলন গড়তে হলে, তা করতে হবে আধিয়ারদের নেতৃত্বে, আধিয়ার সমস্যাকে সামনে রেখে। সমস্যার অনুধাবন, সংগ্রামের নীতি ও কৌশল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনার পর স্থির হল সংগ্রামের রূপরেখা।

আধিয়ার সমস্যা

জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হল আধিয়ার। জোতদারদের জমিতে তারা চাষ করত। উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক পেত জোতদার, অর্ধেক আধিয়ার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই শস্যে আধিয়ারদের সম্বৎসরের অন্নের সংস্থান হত না। ফলে বছরের কোনো-এক সময়ে আধিয়ারকে শস্য ধার করতে হত সেই জোতদারদের কাছেই দেড় বা দ্বিগুণ চড়া সুদে। বহু সময়ে দেখা যেত, শস্য উৎপাদনের সময়ে জোতদারের ধার শোধ করতে আধিয়ারকে তার ভাগের পুরোটাই দিয়ে দিতে হচ্ছে : এবং একই সঙ্গে আবার সেই চড়া সুদে ধার করতে হচ্ছে। একদিকে বিপুল অংশের জমির মালিক মুষ্টিমেয় কিছু জোতদার-জমিদার যাদের মুনাফা ও সম্পত্তি স্ফীততর হচ্ছিল, অন্যদিকে কঠিন থেকে কঠিনতর অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত হচ্ছিল আধিয়ার কৃষক সমাজ। এর উপর ছিল 'বাজে আদায়' বা 'আবওয়াব' প্রথা। 'গোলামোছানি' ছিল এইরকম এক ধরনের বাজে আদায়। জোতদারের যে গোলায় ধান রাখা হত, তা রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ আধিয়ারকে উৎপন্ন শস্যের এক অংশ দিতে হত জোতদারকে। 'বরকন্দাজি'—জোতদারের স্বার্থরক্ষার জন্য যে বরকন্দাজ বাহিনী ছিল, তাদের ভরণপোষণের জন্য নিজ-অধিকারের শস্যের একাংশ নিয়ে নিত জোতদার। এই ধরনের ১৮ রকমের বাজে আদায় প্রথা চালু ছিল এই অঞ্চলের গ্রামগুলিতে। এই 'বাজে আদায়' কিংবা কর্জা করা ধানের চড়া সুদ নির্ধারণের সপক্ষে কোনো সরকারি আইন না থাকা সত্ত্বেও এই প্রথাগুলি চালু ছিল দীর্ঘদিন ধরে।

শোষণের এই বহুবিধ নাগপাশে জর্জরিত হচ্ছিল আধিয়ার কৃষক সমাজ। চরম দারিদ্র্য ছিল, দারিদ্র্যের জন্য অনুচ্চারিত ক্ষোভ ছিল, ছিল না ক্ষোভের সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ বা কোনো প্রতিরোধ আন্দোলন। কৃষক সমিতি সিদ্ধান্ত নেয়, শোষণের এই নির্মম রূপকে চেতনায় বিধৃত করতে হবে, এর বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে হবে কৃষক সমাজকে। কিন্তু রণকৌশল হিসেবে স্থির হয়, প্রথম আন্দোলন হবে গাণ্ডি বন্ধের আন্দোলন।

গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে নির্দিষ্ট দিনে হাট বসে। কৃষকেরা আসে তাদের কৃষিজ পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে। হাটে তাদের ব্যবসা করার অধিকার ছিল। কিন্তু প্রতিদানে হাটের ইজারাদারকে কিছু পরিমাণ অর্থ বা পণ্য-সামগ্রী দিতে হত, যাকে বলা হত গাণ্ডি বা তোলা। ইজারাদারের বেতনভুক্ বরকন্দাজরা ইচ্ছেমতো তোলা আদায় করত কৃষকদের কাছ থেকে। কৃষক সমিতিতে আলোচনা হল, এই বেআইনী প্রথা সর্বশ্রেণীর কৃষককে আঘাত করে। সুতরাং এই দাবি নিয়ে লড়াই করলে সর্বশ্রেণীর কৃষককে কৃষক সমিতির সংগঠনে আনা যাবে। যেহেতু গাণ্ডি আদায়ের সমর্থনে কোনো সরকারি আইন নেই, তাই এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারি নিপীড়নের সম্ভাবনা কম। এবং এই আন্দোলন সফল হলে ব্যাপক অংশের কৃষকদের মধ্যে সমিতির জনপ্রিয়তা-বিস্তার ঘটানো সম্ভব হবে, পরবর্তী আন্দোলনে কৃষকদের পাশে পাওয়া যাবে। এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে শুরু হল ব্যাপক প্রচার অভিযান। অসংখ্য লিফলেট বিতরণ করা হল হাটগুলিতে গাণ্ডি আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি দেওয়া হল দুটি শিক্ষামূলক স্লোগান—'কর্জা ধানের সুদ নাই' এবং 'বাজে আদায় বন্ধ করো'। ধাপে ধাপে বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ ও সদর থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই প্রচার এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে।

ময়দানদীঘি সম্মেলন—প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য

ইতিমধ্যে এসে গেল কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন—জলপাইগুড়ি শহরে। মাধব দত্ত তখন বোদা থানার সর্বসময়ের কংগ্রেসকর্মী ; একই সাথে ঐ অঞ্চলে কৃষক সমিতির সংগঠক। প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য মাধববাবুরা বোদা এলাকার যুব-কৃষকদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুললেন। বোদা ও পচাগড় থেকে এক বিশাল কৃষক মিছিল মাধববাবু ও অনাথশরণ গৌতমের নেতৃত্বে ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ শহরে এসে পৌঁছল। ইতিমধ্যে সম্মেলন মণ্ডপ 'জগদিন্দ্র নগরে' কৃষক সমিতির এক ক্যাম্প অফিস তৈরি হয়েছে, লালঝাণ্ডা এবং কৃষকদের দাবি-দাওয়া সম্বলিত পোস্টারে সাজানো। কয়েক হাজার কৃষকের মিছিল শহরে পৌঁছল লালঝাণ্ডা সামনে রেখে। কলকাতা থেকে আসা এক ব্যাণ্ড-পার্টি বাজিয়ে মিছিল শুরু হল। জলপাইগুড়ি শহরে লালঝাণ্ডা নিয়ে কৃষক মিছিল এই প্রথম। মিছিল সম্মেলন মণ্ডপে হাজির হল কৃষকদের দাবির স্লোগানে চতুর্দিক মুখরিত ক'রে। সম্মেলনে প্রবেশের দর্শনী ধার্য হয়েছিল দুই

আনা। সেই দর্শনী ছাড়া কৃষকদের সম্মেলনে ঢুকতে বাধা দিলেন কর্মকর্তারা। কিন্তু সম্মেলনে উপস্থিত কংগ্রেসের বামপন্থী নেতাদের সমর্থনে সুভাষচন্দ্র নির্দেশ দিলেন, দর্শনী ছাড়াই কৃষকদের সম্মেলনে প্রবেশ করতে দিতে হবে। কৃষকদের দাবি গৃহীত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পরের দিনের অধিবেশনে এ. আই. সি. সি. সদস্য ও প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতা বঙ্কিম মুখার্জী সমবেত কৃষকদের সামনে এক অসামান্য বক্তৃতা দেন। এই প্রসঙ্গে ২৯ মাঘ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'ত্রিস্রোতা' লিখছে—'ভাষার গুরুত্বে অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সহস্র সহস্র ব্যক্তির সকলে উহা সম্পূর্ণ অনুধাবন করিতে না পারিলেও কৃষকশ্রেণীর মধ্যে শত শত প্রাচীন ব্যক্তির চক্ষের জলধারাই স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছে আজ বাঙ্গালীর কৃষক কি চায়।'

সেই সময় পর্যন্ত বামপন্থীদের নেতৃত্বে কৃষক সমিতির কাজ পরিচালিত হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয়নি। পার্টি তখন বেআইনী। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন এ. আই. সি. সি. সদস্য এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সোমনাথ লাহিড়ীর উপস্থিতিতে পার্টির জেলা সাংগঠনিক কমিটি তৈরি হয় বীরেন দত্ত, গুরুদাস রায় ও শচীন দাশগুপ্তকে নিয়ে। পরবর্তীকালে কৃষক সমিতির যাবতীয় কাজ পরিচালিত হয়েছে পার্টির প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে। পার্টি গঠনের পর স্থির হয় কৃষক সমিতিকে আরও সংগঠিত করতে হবে। ইতিমধ্যে গাণ্ডি আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার এবং কংগ্রেস সম্মেলনে কৃষকদের প্রবেশাধিকার আদায় কৃষক সমিতিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে গ্রামাঞ্চলের কৃষক, এমন-কি, শহরের মধ্যবিত্তদের মধ্যেও। এই সময়ে ঠিক হয়, জেলার প্রথম কৃষক সম্মেলন করা হবে বোদা থানার ময়দানদীঘিতে। ইতিমধ্যে সমিতির ১৩টি ইউনিয়ন কমিটি তৈরি হয়ে গেছে, এবং প্রত্যেক ইউনিয়ন কমিটির অধীনে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী। ময়দানদীঘির বৃদ্ধ কৃষক নন্দকিশোর বর্মণ-এর দান করা চার বিঘা জমির উপর গড়ে উঠল কৃষক সমিতির কার্যালয়। মাধববাবু তখন কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কৃষক সমিতির সর্বসময়ের কর্মীতে রূপান্তরিত। তাঁর তত্ত্বাবধানে নিয়মিত ভলান্টিয়ার কুচকাওয়াজ হতে লাগল কার্যালয়ের সামনের মস্ত উঠানে। কার্যালয়ের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন গুরুদাস রায়। সম্মেলনের জন্য স্বেচ্ছাসেবকরা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ধান-চাল সংগ্রহ করতে লাগলেন। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সমগ্র বোদা থানা জুড়ে কৃষকদের মধ্যে ছিল এক বিপুল উদ্দীপনা। অঞ্চলের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে গেল কৃষক সমিতির স্লোগান—'কৃষক সমিতির জয়', 'লাঙল যার জমি তার', 'জমিদারি প্রথা ধ্বংস হউক', 'কৃষকদের গাণ্ডি নাই' প্রভৃতি। ১৯৩৯-এর ১৮ জুলাই অনুষ্ঠিত হল প্রথম জেলা সম্মেলন—গরিব আধিয়ার, দিন-মজুরদের দ্বারা সংগঠিত প্রথম কৃষক সম্মেলন। প্রাদেশিক নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এলেন মহম্মদ আব্দুল্লাহ্ রসুল। তাঁরই সভাপতিত্বে সম্মেলন পরিচালিত হয়। এই সম্মেলনেই প্রথম আধিয়ার সমস্যাকে এখানকার প্রধান সমস্যা রূপে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়ে প্রস্তাব পাস হয়। গৃহীত হয় গাণ্ডি আদায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামার দাবি।

সম্মেলন নিম্নলিখিত কর্মকর্তা নির্বাচন করে : সভাপতিমণ্ডলী—অবনীধর গুহনিয়োগী, সতীশ লাহিড়ী, অনাথশরণ গৌতম। সাধারণ সম্পাদক—গুরুদাস রায়। প্রচার সম্পাদক ও স্বেচ্ছাসেবক ভারপ্রাপ্ত—মাধব দত্ত। কোষাধ্যক্ষ—শচীন দাশগুপ্ত।

কার্যকরী কমিটিতে ছিলেন রাধামোহন বর্মণ, উমেশ বর্মণ, মহম্মদ খিজিমুদ্দিন, দীননাথ বর্মণ, লাল্টু বর্মণ, প্রমদা ঠাকুর প্রমুখ কৃষক কর্মীরা।

শহরের কর্মীদের মধ্যে ছিলেন অঘোর সরকার, শশাঙ্ক বসু, হারাধন চক্রবর্তী, শচীন দত্ত প্রমুখ।

ময়দানদীঘি সম্মেলন নানাদিক দিয়েই ছিল তাৎপর্যমণ্ডিত। জলপাইগুড়ি জেলার আগেই তৈরি হয়ে গেছে রংপুর ও দিনাজপুরের কৃষক সমিতি। কিন্তু ঐ জেলাগুলির কৃষক সমিতি তৈরি হয়েছিল কংগ্রেস কমিটির পাশাপাশি, সহযোগী হিসেবে। কৃষক সমিতিতে প্রাধান্য পেয়েছিল ধনী ও মধ্যবিত্ত কৃষকেরা। সংগঠনের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল মূলত প্রচার-কার্যের মধ্যে। উত্তরবাংলার কৃষি, অর্থনীতি যাদের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, সেই আধিয়ারদের উপর শোষণের সঠিক চিত্র তুলে ধরে, তার ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনার যে চিন্তা, তা কখনোই জাগ্রত হয়নি সেখানকার সমিতি নেতৃত্বের মধ্যে। সেই দিক দিয়ে ময়দানদীঘি সম্মেলন উত্তরবঙ্গ তথা প্রাদেশিক কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কংগ্রেস থেকে পৃথক কৃষকদের নিজস্ব শ্রেণী-সংগঠন গড়ে তুলে, কৃষকদের নেতৃত্বেই তাদের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ডাক দেয় এই সম্মেলন। পরে প্রাদেশিক কৃষকসভার পাঁজিয়া সম্মেলনে (১৯৪০) আধিয়ারদের সমস্যা উল্লিখিত হয়েছিল, যদিও সমস্যার গভীরে প্রবেশ করা হয়নি। আধিয়ার আন্দোলনে ময়দানদীঘি সম্মেলনের ভূমিকা ছিল অগ্রদূতের।

গাণ্ডি আন্দোলন ও কালীর মেলা অভিযান

সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুরু হল গাণ্ডি আন্দোলন। তৈরি হল সংগ্রাম পরিষদ। প্রথম লড়াই—ময়দানদীঘির হাটে। লালঝাণ্ডা ও লাঠি হাতে স্বেচ্ছাসেবকরা কৃষক সমিতির 'আদেশ' প্রচার করল—'কৃষকের গাণ্ডি নাই'। সন্ত্রস্ত জোতদার ও ইজারাদাররাও তৎপর হয়ে উঠল। শহরে দরখাস্ত করা হল, কৃষকদের নানাভাবে ভয় দেখাতে লাগল, পুলিসবাহিনী এল, কিন্তু কৃষকদের মনোবল ছিল অটুট। জোতদার ও ইজারাদাররা সদর এস. ডি. ও.-কে নিয়ে এক সভার আয়োজন করে। সেই সভায় কৃষক সমিতির নেতৃবৃন্দকে ডাকা হয়। রাধামোহন বর্মণের নেতৃত্বে এক কৃষক প্রতিনিধি দল সমিতির প্রতিনিধিত্ব করেন, যার অধিকাংশই আধিয়ার ও দিন-মজুর। ইংরেজ আমল। হাকিমের সামনে চেয়ারে বসে তারা ঘোষণা করল—গাণ্ডি আদায় বেআইনী, কৃষকেরা এই বেআইনী কাজ বন্ধ করতে দৃঢ়-সংকল্প। কৃষকদের বক্তব্যের সামনে দাঁড়িয়ে এস. ডি. ও. সেদিন প্রত্যক্ষভাবে জোতদার-ইজারাদারদের সাহায্য করতে সক্ষম হলেন না। ময়দানদীঘি হাটের গাণ্ডি আদায় বন্ধ হল। ময়দানদীঘির জয় বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

ময়দানদীঘির পর গাণ্ডি বন্ধের কর্মসূচী নেওয়া হয় বোদা হাটে। হাটের মালিক ছিলেন কুচবিহারের রাজ-এস্টেট। হাটে গাণ্ডি আদায়ের বিরুদ্ধে প্রচারের সময়ে নায়েবের বরকন্দাজদের হাতে প্রহৃত হন চার-পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবক। রক্তাক্ত অবস্থায় তারা ফিরে

আসে ময়দানদীঘি কার্যালয়ে। মুহূর্তের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। দলে দলে কৃষক-কর্মীরা জমায়েত হন সমিতির কার্যালয়ে। দাবি ওঠে, নায়েবকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে, গাণ্ডি আদায় বন্ধ করতে হবে। কৃষকদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে বোদা হাইস্কুলের ছাত্ররা একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করল। বোদা হাটের পাশেই ছিল পাত্রাস নদী। নদীর অপর-পারে দিনাজপুর জেলা। সেই অঞ্চলের তিনটি ইউনিয়নে কৃষক-সমিতি তৈরি করে জলপাইগুড়ি জেলা নেতৃত্ব। তারা বলে, প্রয়োজনে পাল্টা হাট তৈরি করার জন্য জমির ব্যবস্থা তাদের অঞ্চলে করে দিতে তারা প্রস্তুত। স্থির হয়, দাবি না মানলে হাট স্থানান্তরিত হবে নদীর ও-পারে দিনাজপুর জেলায়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, হাট স্থানান্তরিত করে সুশৃঙ্খল জনতা। চার দিন পাল্টা হাট চলল। অবশেষে কুচবিহার এস্টেট-এর ম্যানেজার স্বয়ং এসে ক্ষমা চাইলেন নায়েবের পক্ষ থেকে। সেইসঙ্গে ঘোষণার মাধ্যমে গাণ্ডি আদায় প্রত্যাহার করলেন। এর পর পাঁচপীর হাট, করুর হাট, লক্ষ্মীর হাট, পচাগড় হাট প্রভৃতি অঞ্চলে একের পর এক গাণ্ডি আন্দোলন সাফল্য পেতে লাগল। এর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে লক্ষ্মীর হাটে। সেই হাটের মালিক ছিলেন এক মুসলমান। তিনি একদিকে এক মৌলবী এবং অন্যদিকে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে নিয়ে এসে বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক প্রচার শুরু করলেন কৃষক সমিতির বিরুদ্ধে। কৃষকদের এক সমাবেশে সেই-সব ধর্মীয় ব্যক্তিদের দিয়ে বলানো হল, এই আন্দোলন ধর্মবিরোধী। কৃষকসভার পক্ষ থেকে পাল্টা বক্তব্য রাখা হল কৃষকদের সামনে। সভা শেষে হিন্দু-মুসলমান কৃষক দলবদ্ধভাবে ঘোষণা করল কৃষক সমিতির প্রতি তাদের সমর্থন। ধর্মীয় জিগিরের বিরুদ্ধে সেই সময়কার কৃষকদের সম্মিলিত প্রতিরোধের সে-এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

গাণ্ডি আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে কালীর মেলা অভিযান। বিভিন্ন ইউনিয়ন কমিটি থেকে দাবি উঠল, কালীর মেলার অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। জলপাইগুড়ি সংলগ্ন দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ থানার দুমদুমায় প্রতি বছর কালীপূজার সময় কালীর মেলা হয়। মেলার মালিক দিনাজপুরের মুন্সী স্টেট তখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডস-এর অধীন। জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও রংপুর থেকে দলে দলে কৃষক এই মেলায় আসত প্রধানত গোরু ও মহিষ কেনার জন্য। লেখাই-খরচ বাবদ হাটের কর্তৃপক্ষ চার-পাঁচ টাকা আদায় করত (ধানের দাম তখন দুটাকা-আড়াই টাকা মণ)। গ্রাম পরিষদ ঠিক করল চার আনার বেশি লেখাই খরচ দেওয়া হবে না। ভুল্লী নদীর তীরে প্রায় তিন মাইল লম্বা এই মেলা। হাজার হাজার গোরু-মহিষ বিক্রি হয়। হাট-মালিকের আয় পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা। মেলার সময়ে অস্থায়ী থানা বসে। সব দিক দিয়েই শক্ত ঘাঁটি। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকেরা গাণ্ডি আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্বাসে সুদৃঢ়। আড়াই হাজার সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত ভলান্টিয়ারবাহিনী কৃষক সমিতির নেতৃত্বে প্রস্তুত হল।

জলপাইগুড়ির পাঁচপীরে বাছাই করা সাতশো ভলান্টিয়ার বিভিন্ন ইউনিয়ন কমিটি থেকে এসে জড়ো হলেন। মধ্য রাত্রে শুরু হল ভলান্টিয়ার মার্চ। কুড়ি মাইল রাস্তা বিউগল বাজিয়ে মার্চ করে, স্লোগান দিতে দিতে ভুল্লীনদীর এপারে জলপাইগুড়ি জেলায় তাঁবু গড়ল। সে-এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সংলগ্ন দিনাজপুর জেলার কৃষকেরা, যারা ছিল জলপাইগুড়ি সমিতির নেতৃত্বের অধীনে, তাদের উপর ছিল স্বেচ্ছাসেবকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও খাওয়ানোর দায়িত্ব। তারা দলে দলে এল। সম্মিলিত আওয়াজ উঠল—'কালীর মেলার কালা আইন চলবে না।' লড়াই শুরু হল স্বেচ্ছাসেবকেরা শৃঙ্খলার সাথে মেলায় ঢুকে কৃষক সমিতির 'আইন' জারি করল। মালিকপক্ষ দাবি না মানায়, কৃষক সমিতির তরফ থেকে বিনা পয়সায় লেখাই-এর কাজ শুরু হল! দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁ থেকে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী এল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে। সমস্ত হাটে ১৪৪ ধারা জারি করা হল। সশস্ত্রবাহিনীর মার্চ হতে লাগল। কৃষক সমিতি সরাসরি সংঘর্ষের পথে না গিয়ে, সমিতির নেতৃত্বে, হাজার হাজার কৃষক গোরু, মহিষ, দোকানপাট ইত্যাদি তুলে নিয়ে এসে নদীর এপারে জলপাইগুড়ি জেলায় 'দশের মেলা' বসালো। কৃষক সমিতির নামে লেখাই হতে লাগল। কালীর মেলা ফাঁকা হয়ে গেল। কৃষকদের দাবি আদায় হল। কৃষক সমিতির জয়ের আওয়াজ দিনাজপুর ও রংপুর জেলার কৃষকদেরও উদ্দীপিত করল। এবং গাণ্ডি আন্দোলন পরবর্তীকালে ছড়িয়ে পড়ে দিনাজপুর ও রংপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। কালীর মেলা লড়াই-এর পর দেবীগঞ্জ থানার সমস্ত কংগ্রেস কমিটি ভেঙে কৃষক সমিতি গঠিত হল। হলদিবাড়ি থেকে দেবীগঞ্জ পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ এলাকার সমস্ত ইউনিয়নে কৃষক সমিতির সংগঠন গড়ে ওঠে।

'নিজ খোলানে ধান তোলো'

কালীর মেলা জয়ের পর কৃষক সমিতি হল জেলার কৃষক সমাজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন। সমিতির কর্মীরা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, চেতনায় উদ্দীপ্ত। সংগঠন ছড়িয়ে পড়েছে জলপাইগুড়ি জেলা এবং সংলগ্ন রংপুর, দিনাজপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। কৃষক সমিতি এবং সংগ্রাম পরিষদের সভায় স্থির হয়, আধিয়ারদের দাবি নিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামার এটাই উপযুক্ত সময়। ময়দানদীঘি সম্মেলনের পূর্বে এবং গাণ্ডি আন্দোলনের সময়ে কৃষক সমিতি আধিয়ারদের উপর শোষণের ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরেছে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে। নিরবচ্ছিন্ন প্রচার চালিয়েছে 'বাজে আদায় বন্ধ করো' এবং 'কর্জা ধানের সুদ নাই'—এই দুটি স্লোগানকে সামনে রেখে। এইবার কৃষক সমিতি আওয়াজ তুলল, আর জোতদারের গোলায় নয়, এবার 'নিজ খোলানে ধান তোলো'। জোতদার-জমিদার আর তাদের পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামল কৃষক সমাজ। কৃষক সমিতির সভা, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজে চঞ্চল হয়ে উঠল সমগ্র এলাকা। দশ হাজার লিফলেট বিলি করা হল কৃষকদের মধ্যে। জোতদাররাও সক্রিয় হয়ে উঠলেন। সদরে, কলকাতায় আবেদন, মামলা ইত্যাদি দায়ের করা হল। বিভিন্ন থানায় পুলিস বাহিনীর ক্যাম্প বসল।

এল ধান কাটার মরশুম। জোতদারের শাসানি, সশস্ত্র পুলিসের হুমকি, কোনো কিছুই আধিয়ারদের মনোবলকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। দেখতে দেখতে সদর থানার কিছু অংশে, বোদা-পচাগড়-দেবীগঞ্জ থানার সমস্ত অঞ্চলে, দিনাজপুর জেলার আটোয়ারি থানার জলপাইগুড়ি-সংলগ্ন এলাকাগুলিতে, রংপুর জেলার ডোমার থানার

কিছু অংশে এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করল। সর্বত্র আধিয়াররা নিজ খোলানে ধান তুলতে লাগল। এই সময় পর্যন্ত শাসকশ্রেণীর সন্ত্রাস ও নিপীড়ন প্রত্যক্ষভাবে নেমে আসেনি কৃষক সমিতির ওপর। তা মূলত ভীতি প্রদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বরং সেই সময়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে, যাতে ছিল আংশিক সমঝোতার সুর। সেই বিজ্ঞপ্তি বলা হল—বাজে আদায় চলবে না, এবং কর্জা ধানের সুদ দশ শতাংশের বেশি নেওয়া চলবে না। কিন্তু ধান কার খোলানে থাকবে সে সম্পর্কে সরকার ছিল নীরব। বিজ্ঞপ্তি জারির পর জোতদাররা দাবি জানায়—ধান তাদের খোলানে নিয়ে আসতে হবে। কৃষকরা তা প্রত্যাখ্যান করল। নিজ খোলানে ধান তোলার যে স্লোগান কৃষক সমিতি দিয়েছিল তার তাৎপর্য ছিল এটাই যে, জোতদারদের খোলানের পরিবর্তে নিজ খোলানে ধান তুললে জোতদারের চাপিয়ে দেওয়া শর্ত ও শোষণের আওতা থেকে মুক্ত থাকবে আধিয়ার ; আধিয়ারের দাবি আদায় সহজসাধ্য হবে।

এই সময়ে জলপাইগুড়িতে এলেন নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য জলপাইগুড়ির নবাব মোশারাফ হোসেন, জোতদারদের ব্যাকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে। নবাব সাহেব জলপাইগুড়ি এসে জোতদারদের নিয়ে সভা করলেন ; নানা কমিউনিস্ট-বিরোধী বক্তব্য রাখলেন। তাঁরই উদ্যোগে শুরু হল কৃষকদের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ। সমস্ত এলাকায় ১৪৪-ধারা জারি করা হল। কৃষক নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হওয়ার সাথে-সাথে নেতৃত্ব গোপনে কাজ করতে লাগল। আন্দোলন পরিচালনা করতে লাগলেন অঞ্চলের স্থানীয় নেতৃত্ব। তারপর জোতদারদের সহায়তায় শুরু হল গ্রামে-গ্রামে পুলিসী নির্যাতন। তিনশোর বেশি কৃষককে গ্রেপ্তার করা হল। ময়দানদীঘি সমিতি অফিসের জন্য জমি দান করেছিলেন যে বৃদ্ধ নন্দকিশোর বর্মণ, তার অত বড়ো বাড়িটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল সার্কেল অফিসারের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র পুলিস। নন্দকিশোরকে প্রচণ্ড মারধর ক'রে তাকে দিয়ে চত্বরটি লাঙল দিয়ে চাষ করানো হল সর্ষে ছিটিয়ে দিয়ে। আন্দোলনের শেষের দিকে গ্রেপ্তার হলেন আন্দোলনের প্রধান নেতারা। নির্বিচার গ্রেপ্তার, দমন-পীড়ন ইত্যাদির সামনে আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এল সেই বিশাল আন্দোলন।

সেদিনের সেই আন্দোলন সাময়িকভাবে দমন করা হয়েছিল সত্য, কিন্তু লড়াইয়ের মাধ্যমে কৃষক আন্দোলনের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটল। আধিয়ার সমস্যা, ভূমি সমস্যার অন্যতম প্রধান সমস্যা—এ সত্যটাও কৃষক আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়াল।

উপসংহার

১৯৪০ সালে সারা বাংলার জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদকদের এক সভা হয় প্রাদেশিক কৃষকসভার অফিসে। গুরুদাস রায় ও মহম্মদ খিজিমুদ্দিন, জলপাইগুড়ি জেলার রিপোর্ট পেশ করেন। সেই সুদীর্ঘ রিপোর্ট গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল বিভিন্ন জেলার কৃষক নেতাদের মধ্যে। রিপোর্ট পর্যালোচনায় স্থান পেয়েছিল কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক।

অধিকাংশ জেলাতেই কৃষক আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে কংগ্রেসের আন্দোলনের পাশাপাশি, ধনী ও মধ্য কৃষকদের সামনে রেখে। এবং আন্দোলন মূলত সীমাবদ্ধ ছিল প্রচার-কার্যের মধ্যে। জলপাইগুড়ি জেলা, কংগ্রেস থেকে আলাদা কৃষকদের নিজস্ব শ্রেণীসংগঠন গড়ার দিকে নজর দেয় এবং আন্দোলনে ঘটায় জঙ্গী রূপান্তর। সভায় স্বীকৃত হয়েছিল, এভাবেই অর্থাৎ লড়াইয়ের মাধ্যমেই কৃষকদের শ্রেণীচেতনার উন্মেষ ঘটে। ভবিষ্যতের আন্দোলনগুলিকেও পরিচালিত করতে হবে এই পথে। বিশিষ্ট এক প্রাদেশিক নেতা বলেছিলেন, সংগ্রামী শ্রেণীপ্রতিষ্ঠান হিসেবে কৃষক সমিতিকে কেন্দ্রীভূত এলাকার মধ্যে গড়ে তোলা ও আন্দোলনের মধ্যে শিক্ষিত করার ব্যাপারে জলপাইগুড়ি জেলা সংগ্রামী কৃষক আন্দোলনের 'ভ্যানগার্ড'।

প্রসঙ্গত একটা বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। আধিয়ার আন্দোলন চলাকালীন প্রাদেশিক নেতৃত্বের একটা অংশের মধ্যে আশঙ্কা ছিল, এই আন্দোলন শহরের মধ্যবিত্তদের মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখেছি, এই আন্দোলনের সমর্থনে প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে এসেছিলেন জলপাইগুড়ি শহরের এক বড়ো অংশের মানুষ। শহরের গণ্যমান্য অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবীদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল ডিফেন্স কমিটি—আধিয়ারদের সমর্থনে। ছাত্ররা ধর্মঘট করেছেন, সক্রিয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বার বার। সরকার ও জোতদারেরা কৃষকদের বিরুদ্ধে যে অসংখ্য মামলা করেছে, সেগুলির বিরুদ্ধে লড়তে কৃষক সমিতিকে কোনোদিন পয়সা ব্যয় করতে হয়নি। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবীরা বিনা পারিশ্রমিকে সেই মামলাগুলি পরিচালনা করেছেন কৃষকদের সপক্ষে। অর্থাৎ আধিয়ার আন্দোলনের আবেদন গ্রামের গণ্ডি ছাড়িয়ে স্পর্শ করেছিল শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তকেও।

ইদানীংকালে কৃষক আন্দোলন নিয়ে ইতিহাসভিত্তিক যে লেখাগুলি পড়েছি, জলপাইগুড়ির আধিয়ার আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা সেগুলিতে আংশিক উপেক্ষিত। ইতিহাস চর্চা যাঁরা করেন, সমাজের প্রতি তাঁদের দায় অপরিসীম। অনুসন্ধিৎসা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে যদি তাঁরা সে দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন, ইতিহাসের পাতায় উপেক্ষিত সেই অধ্যায়গুলিকে সসম্মানে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব।

হেই সামালো, হেই সামালো

সলিল চৌধুরী

হেই সামালো, হেই সামালো
হেই সামালো, ধান হো
কাস্তেটা দাও শান হো
জান কবুল আর মান কবুল
আর দেবো না আর দেবো না
রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো।

চিনি তোমায় চিনি গো
জানি তোমায় জানি গো
সাদা হাতির কালো মাহুত তুমিই না।
পঞ্চাশে লাখ প্রাণ দিছি
মা-বোনেদের মান দিছি
কালো বাজার আলো করা তুমিই না।

মোরা তুলবো না ধান পরের গোলায়
মরবো না আর ক্ষুধার জ্বালায় মরবো না
তার জমি যে লাঙল চালায়
ঢের সয়েছি আর তো মোরা সইবো না
লাঙল ধরা কড়া হাতের শপথ ভুলো না।

দিনাজপুরে ঐতিহাসিক তেভাগা সংগ্রামের ক'টি কথা

ডঃ সুনীল সেন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা সেপ্টেম্বর ৪৬-এ তেভাগা সংগ্রামের ডাক দেয়। এটা ছিল বর্গাদারদের জন্য ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগের দাবি, ১৯৪০ সালে ভূমি রাজস্ব কমিশন এ দাবির সুপারিশ করেছিলেন। কিষান নেতারা এমন বহু জনসভায় বক্তৃতা করেন, যেখানে সব সময়েই খুব বেশি একটা জনসমাগম হত এমন নয়; অতি সহজ ভাষায় লেখা ইস্তাহার বিলি করা হতে থাকে; কোন কোন গ্রামে মিছিল বেরোয়, তাতে শোনা যায় 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ!' 'নিজ খোলানে ধান তোলো!' 'তেভাগা চাই!' প্রভৃতি ধ্বনি। কিষান সভা স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে, তারা স্লোগান দিতে দিতে এবং ইস্তাহার বিলি করতে করতে গ্রামে গ্রামে ঘোরে। সংগ্রামী তৎপরতার সময় আসে ফসল কাটার মরসুমে, আর কৃষক ও পুলিসের মধ্যে সর্বপ্রথম যে সংঘর্ষটি থেকে বর্গাদার-বিদ্রোহের সূচনা হয়, সেটি ঘটে দিনাজপুর জেলার আটোয়ারি থানায়।

......আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য সুশীল সেন যান আটোয়ারি থানার রামপুর গ্রামে। মনে হয় রামপুর অন্যান্য গ্রামের কাছে দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে, এরকম একটা আশা ছিল। রামপুরকে কেন্দ্র ক'রে কৃষক সভা সারা আটোয়ারি থানা এলাকায় গ্রামস্তরের কমিটি প্রতিষ্ঠিত করেছিল; রামপুর ছিল ১৯৩৯ সালের আধিয়ার সংগ্রামের কেন্দ্র, এই সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ—রামলাল সিং, পাথাল সিং, রাজেন সিং—এসেছিলেন লাগোয়া গ্রাম বালিয়া থেকে। রামলালের নাতি ভরেন সিং ও পাথালের ছেলে নব সিং ছিলেন কিষান কর্মীদের নূতন প্রজাতির প্রতিভূ। সুশীল সেন এক বৈঠক সভা করেন, তাতে প্রায় একশো কিষান কর্মী যোগ দিয়েছিলেন; এই সভায় সংগ্রাম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পরদিন সকালে স্বেচ্ছাসেবকরা যখন ফুলঝরি নামে একজন বর্গাদারের জমিতে ধান কাটতে যান, পুলিস এসে সেনকে গ্রেপ্তার করে। এর ফলে কেউ মুষড়ে পড়েন নি বা

থামকে যান নি ; পরদিন সকালে কৃষকরা সেই গ্রামেই ধান কাটতে যান। আবার পুলিস আসে এবং তারা কৃষকদের মারধর শুরু করতেই দিপসরি নামে একটি রাজবংশী বিধবা যুবতী লাঠি উঁচিয়ে পুলিসের দিকে তেড়ে যান এবং লাঠি হাতে স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁকে অনুসরণ করেন। একটা সংঘর্ষ হয়, পুলিস পিছু হটে।

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই জেলার নেতৃত্বস্থানীয় কর্মীরা ঠাকুরগাঁও শহরে ত্বরিতে ডাকা এক সভায় মিলিত হন। আটোয়ারির সংঘর্ষে জনসাধারণের যে-মেজাজের পরিচয় পাওয়া গেছে সে সম্পর্কে ভুলের কোন অবকাশ ছিল না। স্থির হয় যে নেতৃত্বস্থানীয় কর্মীরা গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য এখনই লুকিয়ে পড়বেন। স্লোগানগুলি অপরিবর্তিত রইল; সাধারণ নির্দেশ থাকল বর্গাদারের খামারে ধান তোলার।......আন্দোলনের প্রাথমিক নেতৃত্ব এসেছিল কিষান সভার কাছ থেকে আর বর্গাদারদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পেয়ে তা শীঘ্রই গতিবেগ সঞ্চয় করেছিল। আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ধারা কি হবে, তার পূর্বাভাস করা অসম্ভব ছিল, কিন্তু নেতৃত্বস্থানীয় কর্মীরা সাহসের সঙ্গে স্থির করেছিলেন যে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

.........এক পক্ষকালের মধ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে জেলার ৩০টি থানার ২২টিতে। আন্দোলন বিশেষ তীব্র হয়ে ওঠে ঠাকুরগাঁও মহকুমায়। কয়েক হাজার কৃষক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নাম লেখায়। এক গ্রামের কৃষকদের বলা হ'ল অন্য গ্রামের কৃষকদের সাহায্য করতে—ঢাক-ঢোল বাজিয়ে নয়, 'ইনকিলাব' চিৎকার ক'রে। লাঠি নিয়ে চলাফেরা করাটা স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল ; লাঠিয়াল বাহিনী এতকাল ছিল জমিদারদের পোষা চিরাচরিত ব্যাপার ; এখন এই স্বেচ্ছাসেবকরা হলেন কৃষক সভার "লাঠিয়াল"

.........কৃষক আন্দোলনের শক্তঘাঁটি সেই ঠাকুরগাঁও আবার আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল। দূর দূর গ্রামে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ায় অল্প কিছু মধ্যবিত্ত নেতার পক্ষে যোগাযোগ রাখাটা শারীরিকভাবেই অসম্ভব হয়ে উঠল, তাই তাঁরা কিষান কর্মীদের উপরেই নির্ভর করতে লাগলেন। ......আটোয়ারি থানা এলাকায় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন মধ্যবয়স্ক, গম্ভীর, স্বল্পবাক্ পাঁচ বিঘা জমির মালিক অভরণ সিং, এবং তরুণ, উৎসাহী, ছটফটে ছেলে ভবেন সিং, কোন দায়িত্ব পালনেই, তাতে যত ঝুঁকিই থাক, তার "না" ছিল না। বালিয়াডিঙ্গিতে নেতা ছিলেন মধ্যবয়স্ক অদম্য সাহসের অধিকারী, বেঁটে, শক্তসমর্থ; মাঝারি কৃষক কম্পরাম সিং। ইনি জীবনের সমস্ত সঞ্চয় কমিউনিস্ট পার্টিকে দান ক'রে সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে যান। আরেকজন নেতা ছিলেন ডোমা সিং — সুপুরুষ, হাসিখুশি। ইনিও মাঝারি কৃষক। এঁর গোটা পরিবারই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। সেই একই এলাকা থেকে এসেছিলেন পষ্টরাম সিং। ইনি দরিদ্র কৃষক, সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে যান এবং রানীসঙ্কাইলের স্থানীয় কৃষক তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য এক নেতা পাঠাতে গুরুদাস তালুকদারকে অনুরোধ করলে পষ্টরাম তাঁর স্ত্রী জয়মণিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে রানীসঙ্কাইলে কাজ করতে যান। জয়মণি ছিলেন লম্বা, মুখে বসন্তের দাগ। তিনি লেখাপড়াও শিখে নিয়েছিলেন এবং রাজবংশী মেয়েদের নেত্রী হয়ে ওঠেন।

.........ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে এগারটি জেলায়, লক্ষ লক্ষ বর্গাদার ফসল তোলেন নিজেদের খামারে। এটা ছিল আংশিক জয় ; বর্গাদারের খামারে ধান থাকার ফলে জোতদাররা আর বলপ্রয়োগ ক'রে বা জালিয়াতি ক'রে তাদের প্রাপ্য অংশ থেকে তাদের বঞ্চিত করতে পারল না। ইতোমধ্যে কৃষকদের উপর চলল নিপীড়ন। ১৩ ডিসেম্বর সারা ভারত কিষান সভার সভাপতি মুজফ্‌ফর আহমেদ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সভাপতি কৃষ্ণবিনোদ রায় সহস্রাধিক কিষান সভা কর্মীকে গ্রেপ্তার করার নিন্দা ক'রে এবং ময়মনসিংহ, দিনাজপুর ও যশোহরে সশস্ত্র পুলিস মোতায়েনের নিন্দা ক'রে এক বিবৃতি দেন।

৪ জানুয়ারি, ১৯৪৭ তারিখে দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দরের তালপুকুর গ্রামে এক কৃষক মিছিলের উপর পুলিস গুলি চালায়। তাতে শিবরাম নামে একজন সাঁওতাল ভূমিহীন কৃষক এবং সমিরুদ্দীন নামে আরেকজন ভূমিহীন কৃষক ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

......ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে পুলিসী নিপীড়ন শুরু হয় পুরোমাত্রায় এবং সরকার এটা স্পষ্ট ক'রে দেয় যে তার উদ্দেশ্য হ'ল চূড়ান্ত আঘাত হানা। ....২০ ফেব্রুয়ারি ভোরবেলায় সশস্ত্র পুলিসী বাহিনীর একটি দল খাঁপুরে যায় কয়েকজন স্থানীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করতে। .....নিকটবর্তী গ্রামগুলি থেকে কৃষকরা এসে জড়ো হন, সাঁওতালরা আসেন তাঁদের চিরাচরিত অস্ত্রশস্ত্র হাতে। খুব সম্ভবত পুলিসি নির্যাতনের ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রে তাঁরা পথের মাঝখানে একটা গর্ত খুঁড়ে রেখেছিলেন। যে ট্রাকটি ক'রে পুলিস আসছিল সেটি তার মধ্যে পড়ে যায়। পুলিস ট্রাক থেকে গুলি চালাতে শুরু করে। সাঁওতাল কৃষকেরা তীরধনুক নিয়ে লড়েন। ......চিয়ার সাই হাতে একটি বর্শা নিয়ে ট্রাকের দিকে ছুটে যান; তাঁকে গুলি করা হয়। তাঁর পেছনে যান যশোদা। সরল হাসিখুশি দুটি সন্তানের জননী এই প্রৌঢ়া রাজবংশীর স্বামী নীলকণ্ঠ আত্মগোপন অবস্থায় ছিলেন। পুলিস তাঁদের বাড়িতে হানা দিয়ে যশোদাকে ট্রাকের কাছে টেনে এনেছিল। গুলিবৃষ্টি হচ্ছিল, গুলি লেগে চিয়ার সাই পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও যশোদা এগিয়ে যান এবং গুলিবিদ্ধ হন। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী ১২১ রাউণ্ড গুলি চালানো হয়েছিল ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিলেন ২০ জন কৃষক। অনেকেই গুলির আঘাতে আহত হয়েছিলেন। তাঁরা নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে লুকিয়েছিলেন। পুলিসের তরফে কেউ হতাহত হয় নি।

['বাংলার কৃষক সংগ্রাম', পৃঃ ৫৯— ১০৩, সংক্ষেপিত, শিরোনামটি সংযোজিত]

তেভাগায় জেলার মেয়েরা

কল্যাণী দাশগুপ্ত

অবিভক্ত বাংলার উত্তরাঞ্চলের সমতল জেলাগুলির আদি অধিবাসীরা প্রধানত রাজবংশী এবং আর্থিক কাঠামো প্রধানত কৃষি-ভিত্তিক। ব্যতিক্রম জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স এলাকা যা প্রধানত চা-শিল্পের প্রাণকেন্দ্র।

জলপাইগুড়ি জেলার কৃষি-প্রধান এলাকাগুলিতে প্রধানত বোদা, পচাগড় দেবীগঞ্জ প্রভৃতির বিস্তীর্ণ কৃষক এলাকায় ১৯৩৮ থেকেই সাধারণ কৃষকদের মধ্যে তাদের শোষণের বিরুদ্ধে দুবেলা খেতে পাওয়ার দাবির ভিত্তিতে কৃষক আন্দোলন শুরু হয় কৃষক সমিতি তথা জেলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষকদের শ্রেণী-চেতনার প্রথম উন্মেষ সেই তখন থেকেই। এই আন্দোলন ক্রমে আধিয়ার আন্দোলন নামে দানা বাঁধে এবং এই আন্দোলনই পরবর্তী সময়ে আরো সংগঠিত আরো ব্যাপক চেহারা নিয়ে তেভাগা আন্দোলন নামে সমস্ত বাংলাদেশে, বাংলার বাইরেও স্বীকৃতি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আর আজও এই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি, নিষ্পত্তি প্রভৃতি একটি গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশে এমন-কি বিদেশেও। এই আন্দোলনের মূল প্রেক্ষিত ছিল শ্রেণীসচেতনতা এবং জোতদার ও তার সাহায্যকারী বিদেশী শোষকদের শাসনের হাত থেকে মুক্তি তথা স্বাধীনতা, তথা সর্বহারার নবজন্ম।

আক্ষরিক অর্থেই সাধারণ কৃষক শ্রেণী ছিল দারিদ্র্যসীমার সর্বনিম্নে। আর্থ সামাজিক পীড়নে, শিক্ষাহীনতায়, মানসিক পুষ্টিহীনতায় এক অন্ধকার জীবনযাপনে অভ্যস্ত ব্যাপক কৃষক সমাজ যখন পঙ্গু—সেই পরিস্থিতিতে—কৃষক রমণীরা যে আরো কত পশ্চাৎপদ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। এই প্রথম আধিয়ার আন্দোলনের সময় কৃষক রমণীদের প্রকাশ্যভাবে এবং ব্যাপকভাবে এই লড়াইতে দেখতে পাইনি। কিন্তু কয়েক বছরের ব্যবধানে—তেভাগার বার্তা নিয়ে যখন কর্মীরা ঘরে-ঘরে গ্রামে-গ্রামে প্রচার অন্দোলন শুরু

করেছিলেন তখন সবরকম বাধাবিপত্তি, প্রথার অবরোধ ভেঙে মেয়েরা প্রথম থেকেই সহজ অধিকারের ভঙ্গিতে পুরুষের পাশে এসে স্থান করে নিয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই এদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এরা ছিল সর্বরকমে সাম্রাজ্যবাদী এবং ধনী জোতদারের হাজার শোষণের বলি। কিন্তু শ্রেণী-শত্রুকে চিনে নিতে এদের দেরি হয়নি—সীমাবদ্ধ দৃষ্টিসীমা কোনো বাধা হয়নি। তাই দেখেছি ১৯৪২ সালে যে মেয়েরা আমার জুতো-জামা দেখে নানা অজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল তারাই অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিল সমিতি কী ও কেন তার প্রয়োজনীয়তা। ১৯৪২-এ এই শহরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয়ে গেছে। নানারকম তার কাজকর্ম—সেবামূলক, শিক্ষামূলক, কিছু অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা। সর্বোপরি রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা, এ ছাড়া মেয়েদের নিজস্ব দাবি-দাওয়াও ছিলই। এরই কিছু কিছু লক্ষ্য নিয়ে প্রথম সুন্দরদীঘিতে গেলাম বুড়িমা পুণ্যেশ্বরী বর্মণের বাড়ি। দিন-কয়েক পরে ফিরে এলাম আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতা নিয়ে পুঁথিপত্রে যার হদিশ মেলেনি। আমাদের রয়েছে কিছু শিক্ষা-দীক্ষা, বুড়িমারা নিরক্ষরা, আমরা ফরসা জামা-কাপড় পরি—বুড়িমাদের সম্বল—একটিমাত্র ময়লা ফোতা, আমাদের ঘরে কিছু খাবার দাবার—বুড়িমাদের একবেলা খাওয়া, তেলশূন্য পেলকা শাক সহযোগে, নিরাভরণ ঘরের মধ্যে বাঁশের মাচা, কাঁচা কুয়ো, নিষ্প্রদীপ রাত্রি পাঠশালা নেই, ডাক্তার নেই, গ্রামটুকুর বাইরে আরো একটা আলো ঝলমল জায়গা আছে—তার বার্তাও অজানা। কিন্তু এ সব কিছুর উপরে রয়েছে—আশ্চর্য এক প্রাণ, অদ্ভুত দরদে-ভরা এক মন, পার্টির ছেলেদের জন্য ভালোবাসা—যা কর্মীদের হাজারটা বিপদের সময়ে তাদের রক্ষা করেছে, সাহায্য করেছে।

এখানে সুন্দরদীঘির বুড়িমার কথাই আগে বলি। কৃষক কর্মীরা মিটিং করছে, হয়তো হঠাৎ জোতদারের কোনো দালালকে দেখা গেল—বুড়িমার শিক্ষায় গ্রামের মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যথাস্থানে খবর পৌঁছে দিল যাতে তারা লুকিয়ে পড়তে পারে। একদিন বুড়িমা সন্ধের পর সিনজা জ্বালিয়ে বাড়ি ফিরছে—দূরে দেখা যায় দুটো চৌকিদার-সহ পুলিস, বুড়িমার চিৎকার—'পালা পালা পুলিস আসিছে'। চৌকিদার-দুটো বুড়িমার মুখ চেপে ধরে—কিন্তু তার আগেই কাজ হাসিল। পালিয়ে গেল দুজন গ্রেপ্তারি পরোয়ানাওয়ালা কমরেড, রইল শুধু বীরেন নিয়োগী যার নামে কোনো ওয়ারেন্ট তখন ছিল না। তেভাগা আন্দোলনের সময়ে পুলিসী অত্যাচার যখন চরমে এই বুড়িমার নেতৃত্বে মাকড়ি, উজানী, বিদ্যা কমরেডরা আরো মেয়েদের নিয়ে ছামগাইন হাতে পুলিসের মোকাবেলা করেছে। যেখানে-যেখানে তেভাগা হয়েছে—এবারেও সেখানে উপস্থিত থেকে ধান ভাগ করা থেকে গোলায় তোলা পর্যন্ত কাজ করেছে। পচাগড়ের বুড়ি ও বুড়ির মা'র (শিখা নন্দী, তিলকতারিণী দেবী) কথা ইতিহাসে কোনোদিন লেখা হবে না জানি। কিন্তু আমরা নিজেরা দেখেছি—দিনের পর দিন এরা কিভাবে মেয়েদের মধ্যে কাজ করেছে—মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি অথবা কৃষক সমিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এক গ্রাম থেকে গ্রামে নেতাদের খবর পৌঁছে দেওয়া তো ছিল অবশ্যকরণীয়—তখন কিন্তু রাস্তা-ঘাট গাড়ি-ঘোড়া কিছু ছিল না। শুধু ভাত রেঁধে খাওয়ানো নয়, কর্মীদের লুকিয়ে রাখা, পালাতে সাহায্য করা এবং তেভাগা আন্দোলন চলাকালীন পুলিসী তাণ্ডবের মুখোমুখি হওয়া, ১৪৪-ধারা অমান্য করে লালঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে মিটিং-মিছিল করা—কিছুতেই এরা পেছপা হয়নি। পচাগড়ের দেবেন জোতদার খুব প্রভাবশালী এবং অত্যাচারী। কর্মীসভায় আলোচনা হচ্ছে—এর খোলানে যাওয়া হবে কিনা—কর্মীদের সংশয় প্রকাশ পাচ্ছে। এই মেয়েরা উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলেছে—'এখানে যেতে হবে' এবং বাস্তবে তাই ই হল। বীরেন পাল এবং আরো ২/১ জনের গ্রেপ্তারি হুকুম নিয়ে পুলিস হাজির, বুড়ি (শিখা নন্দী) দিদি (তিলকতারিণী দেবী)। এবং আশপাশের মেয়েরা এমন রুখে দাঁড়িয়েছে যে পুলিস হটে যেতে বাধ্য হয়। মাথের নন্তু যখন জোতদারের দালালদের হাতে আহত হয়েছিল তখন এই মেয়েরাই তো সমস্ত শাসানি ও ভয় দেখানো সত্ত্বেও এর চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছিল। বোদার পাঁচপীরে এস. ডি. ও. নিজে চলেছে জীপে করে, বন্দুকধারী পুলিস নিয়ে। কাশী কমরেডের স্ত্রী ও সব মহিলাবাহিনী নিয়ে রুখে দিয়েছে গাড়ি। এস. ডি. ও. ফিরে যেতে বাধ্য হয়। তৎকালীন 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় দেখা যায়—১-৪-৪৭ বাজগাঞ্জে মেয়েদের তাড়া খাইয়া পুলিসের পলায়ন', ... ৬০ বৎসরের বৃদ্ধা মা, পাইন লইয়া এবং বালিকা তরুণী অথবা সব বয়সী মহিলা যে যাহা হাতে পাইয়াছে তাহা লইয়াই পুলিস জোতদার ও দালালদের তাড়া করিয়াছে।' সদরের ১১ নং [illegible]তেও সেই চিত্র—'(২৪-১-৪৭ 'স্বাধীনতা') কৃষক মেয়েদের হাতের রামদাই সশস্ত্র পুলিসের যম।' প্রথমে অধিয়াররা জোতদারের খামারেই ধান জমা করেছিল, পরে তেভাগার খবর পেয়েই জোতদারের খামার ভেঙে আধিয়ারের বাড়িতে ধান জমা করে স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে। এখানেও মেয়েরা অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবিকা। '(২৫-১২-৪৬, 'স্বাধীনতা')। সুন্দরদীঘিতে পুলিসের আক্রমণের পাল্টা জবাবে জলপাইগুড়ির কৃষক মেয়েরা ধৃত স্বামীপুত্রের স্থান গ্রহণ করিয়া মাঠের ফসল ঘরে আনিলেন। নেতৃত্ব দিলেন কমরেড বিদার স্ত্রী নগেনী, খগেন বর্মণ ও পোস্তলের স্ত্রীরা, যাত্রা ও সুধাকর বৃদ্ধা মায়েরা, সবার আগে বুড়িমা। এদের নেতৃত্বে একদিনের মধ্যে ৫০ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা সংগঠিত হইয়া, "জান দিব তবু ধান দিব না" এই ধ্বনি দিয়া ধান ঘরে আনিল।' জেল গারদের ভয়, জোতদারের শাসানি বা প্রলোভন, কিছুই এই সমস্ত মেয়েদের দাবিয়ে রাখতে পারেনি। এমনি ধারা কত সাহস, কত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ঘটনা ঘটেছে যা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও এই-সব মেয়েদের পক্ষে সেই যুগে, সেই এলাকায়, সেই পরিবেশে মোটেই সহজ ছিল না।

শহরের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ও কমিউনিস্টপার্টির আমরা মহিলাকর্মীরা—কল্পনা, অমিয়া দে প্রমুখ এদের সাথে যোগাযোগ রেখেছে, সবরকম সাহায্য করেছে এবং সর্বোপরি নিজেরা শিক্ষিত হয়েছে। শহরে থেকেও নানাভাবে কাজ করেছে সবিতা সরকার, সুষমা দত্ত, সুরুচিদি, বীরেন দত্ত'র স্ত্রী নিভা বৌদি, মাসীমা অমিয়া ঘোষ, ব্রজকিশোরী কুণ্ডু, মৃণালিনী তলাপাত্র, ছেলেমানুষ মেয়ে মীরা এবং আরো অনেকে। কলকাতা থেকে এলেন মণিকুন্তলা সেন, পচাগড়ে ক'দিন থাকলেন – হাটসভা, প্রচার ইত্যাদি করে গেলেন। এর কয়েক

শিল্পী : চিত্তপ্রসাদ

মাস পরেই এল—দেশ-ভাগের দণ্ড। কৃষক সমিতি ও লালঝাণ্ডার বিপ্লবী এলাকাগুলি, সরল ও সাহসী যোদ্ধা মহিলারা সবাই চলে গেলেন ওপার বাংলায়, শুধু রয়ে গেল তাদের সংগ্রামের ইতিহাসটুকু।

এবারে আসি ডুয়ার্সের কথায়। চল্লিশের দশকের গোড়া থেকেই ডুয়ার্সে রেলকর্মী ইউনিয়ন সংগঠিত হয়েছে লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে। চা-বাগান শ্রমিকদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ ঘটেছে লালঝাণ্ডার। গ্রামের তেভাগার খবর পৌঁছে গেল তিস্তাপারের এপারের এই রেল, চা-বাগান ও সংলগ্ন কৃষক এলাকাতেও—কোমর বাঁধল মেয়েরাও। এই সময়ে রেলেরও ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান এত শক্তিশালী ছিল যে ইঞ্জিনের সামনে লালঝাণ্ডা লাগিয়ে দোমহনী থেকে ট্রেন চলছে—হামেশাই এ দৃশ্য চোখে পড়ত। কর্মীদের প্রয়োজনমতো ট্রেন এখানে-সেখানে থামছে সেটাও খুব অসম্ভব ছিল না। সম্পাদক কমরেড জ্যোতি বসু এই ইউনিয়ন থেকেই প্রথম বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন কংগ্রেসকে হারিয়ে। এই দৃঢ় সংগঠনের পিছনে মহিলা কর্মীদের ভূমিকা ছিল বিশেষ মূল্যবান। সেই-সব আন্দোলনে অংশ নেওয়া যমুনা ওরাওঁ আজো বৃদ্ধ বয়সে বেঁচে আছেন এবং লালঝাণ্ডার কাজ করে চলেছেন। ডুয়ার্সের এই পরিস্থিতিতে তেভাগার খবর এসে পৌঁছল। আন্দোলন প্রথম শুরু হল ওদলাবাড়ি, ক্রান্তি, ডামডিন অঞ্চল থেকে। মহিলাদের নেতৃত্ব দিলেন বুনি কমরেডের স্ত্রী নৈহারী ওরাওঁনি, ছোটোন, পোকো প্রভৃতি। নেওরা-মাঝিয়ালির কাছে মাধা চুলকাইতেও তেভাগা আন্দোলন প্রধানত পরিচালনা করেন দুই বোন পোকো ওরাওঁনী ও মহারানী ওরাওঁনী। পরে ১ মার্চ ১৯৪৭ তারিখে এঁদেরই একবোন আরো চারজনের সাথে পুলিসের গুলিতে মারা যান তেভাগা করার সময়ে। গুলি চালনা ও মৃত্যুর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল চালসা মঙ্গলবাড়ির গয়ানাথের খোলানে ৪ এপ্রিল '৪৭, যেখানে আবার মারা গেল আরো ৯ জন তারমধ্যে একজন মহিলা, একজন ১৩ বছরের বালক। এই-সব আন্দোলনের ভিত্তি কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না—এর সংগঠক ছিল লালঝাণ্ডা তথা কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা। তাই—যদিও তেভাগার আন্দোলন ছিল মূলত কৃষকদের আন্দোলন, কিন্তু রেল শ্রমিক বা চা-বাগান শ্রমিকদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ বা নেতৃত্ব দিতে ইতস্তত করতে হয়নি। কারণ এই আন্দোলন ছিল মূলত শোষণ তথা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ছিল সাম্রাজ্যবাদেরও বিরুদ্ধে ; কারণ চা-বাগিচার মালিকরা বেশির ভাগই বিদেশি, জোতদাররাও ছিল ঐ বিদেশি শক্তির তাঁবেদার। তাই বাংলাদেশের কোথাও যা হয়নি, এখানে, এই ডুয়ার্স এলাকায় দেখেছি কৃষক-শ্রমিক মহিলা-পুরুষ একসাথে শোষকের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ মালিকের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে সংগ্রামে নেমেছে। সে সংগ্রামে ব্রিটিশ মালিকদের শহর ছেড়ে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তও নিতে হয়েছিল।

৪ এপ্রিল '৪৭-এ বড়ো জোতদার গয়ানাথের খোলানে তেভাগা করার আগে আরো অনেক জায়গায় কৃষক-শ্রমিক মিলিতভাবে সাফল্যের সঙ্গে তেভাগা কায়েম করেছিল, অধিকাংশ জায়গাতেই মেয়েরাও নিয়েছিল অগ্রণী ভূমিকা। যেমন নেওরামাঝিয়ালির বড়ো বিরশার মেয়ে পোকো উরাইন, লাল শুক্রার বোন চুন্দিয়া উরাইন প্রমুখ। তখন এদের বয়স ছিল ১২ থেকে ২৫-এর মধ্যে। পোকো জানাল—তাদের সাথে প্রায় ২০০ মেয়ে ছিল—এরা মিছিল করে তেভাগায় যেত। একদিন বড়ো বিরশাকে ধরবার জন্য পুলিস তাদের বাড়িতে ঢুকে ঘরে ঘরে তল্লাশি চালাচ্ছিল—মেয়েরা ভয় পাওয়া দূরের কথা—দূর থেকে বড়ো বড়ো পাথর ছুঁড়তে শুরু করে, খানিক পরে পুলিস চলে যেতে বাধ্য হয়। একদিন সমর গাঙ্গুলী এক বাড়িতে আশ্রয় নেবার সময় খবর পেয়ে পুলিস হাজির। মেয়েরা চটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে—বাড়ির বাইরের দিকের একটা ভাঙা গোয়ালঘরে আগুন দিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। আশপাশের লোক জমা হয়ে যায়—সবাই লালঝাণ্ডার। পুলিস ভয় পেয়ে সমরকে না নিয়েই পালিয়ে যায়—সমরও সেই ফাঁকে সরে পড়ে। আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ঐ অঞ্চলের ঝিরিকাডাঙায় তেভাগার সময়ে পুলিসের সঙ্গে যে সংঘর্ষ হয় এবং কয়েকটি রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া হয়—তার মধ্যে মেয়েরাও ছিল। পরে দোমহনী থেকে পার্টির নির্দেশে ঐ রাইফেলগুলি জলে ফেলে দেওয়া হয়—বা ভেঙে ফেলা হয়।

এই-সব ছোটো-বড়ো ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই-সব মেয়েদের সাহস, ত্যাগ ও শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ পেত। এইজন্যই তো দেখতে পেয়েছি—১ মার্চ, ৪ এপ্রিল পুরুষের সাথে মেয়েরাও পুলিসী সন্ত্রাসের সামনে এগিয়ে গিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে। তারা তাদের সেদিনগুলি বিসর্জন দিল আজকের স্বাধীনতা ও মুক্তির ভগ্নাংশের জন্য। কিন্তু বাকিও রয়েছে অনেক, আরো অনেক পথ, আরো অনেক সংগ্রাম অপেক্ষা করছে দেশের আর্থসামাজিক পরিবর্তনের, সমাজতান্ত্রিক মুক্তির প্রভাতের আশায়। তারা তাদের যৌবন দিল, ভিটে মাটি দিল, একটি মাত্র প্রাণ-সম্পদও দিল—তাদের শিক্ষা সামনে রেখে প্রত্যহের বিপ্লবের পদাতিকরা সামনে হাঁটবে—আমাদের এই বিশ্বাস যেন অটুট থাকে।

শোন গো ও দূরের পথিক

প্রবীর মজুমদার

শোন গো ও দূরের পথিক! এপথে যেতে
একবার থেমে যাওগো ॥
এই যে সমাধি পরে তারার প্রদীপ জ্বলে,
কত শহীদ ঘুমে মগন এরই মাটির তলে।
আমার ক্ষেতের ধান বাঁচাতে যাদের খুনে রাঙলো মাটি
তাদেরকে আজ একটু আশা দাও গো ॥
এখানে এই বটের শাখে ভোরের পাখীর গাওয়া,
ধানের শীষের দোল জাগানো ঝিরঝিরি এই হাওয়া।
ওরাই এদের সান্ত্বনা দেয়, সারা দিনের ভাষা যোগায়
তোমার সুরে তাদেরই গান গাও গো ॥
রুধির রাঙা এই প্রাঙ্গণে ধূলিকণার মাঝে,
অহল্যা মার প্রসব ব্যথা আজও জেগে আছে (ভাইরে)
ঘরে ঘরে বধূ যখন সিঁথের সিঁদুর পরে,
অহল্যা মার রক্ত লেখায় সে দাগ যেন ভরে।
প্রতিরোধের যে আগুনে অহল্যা মার জ্বলল চিতা
সবার প্রাণে সেই আগুন জ্বালাও গো ॥

ডুয়ার্সের শ্রমিক কৃষক আন্দোলন ও তেভাগা

বিমল দাসগুপ্ত

ডুয়ার্সের চা শ্রমিকরা ক্রীতদাসের মত জীবনযাপন করত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ইংরেজ মালিকরা এক চা সাম্রাজ্য গঠন করেছিল। এরাই ছিল শ্রমিকদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। পুলিস ও সরকারী প্রশাসন এদের নির্দেশমত চলত। এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী, কালোবাজারী, মজুতদারী ; শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষ অর্দ্ধাহার ও অনাহারের সম্মুখীন হন। এই সময় সারাভারত জুড়ে, কৃষক, ছাত্র, নৌবাহিনী প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে প্রবল বিক্ষোভ ও গণআন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ গড়ে উঠে।

ডুয়ার্সে গণআন্দোলনের সূত্রপাত হয় রেল শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। কমিউনিষ্টপার্টির উদ্যোগে রেল শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে। ১৯৩৮ সালে রেল শ্রমিকদের B. A. Rail Road workers' ইউনিয়ন গঠিত হয়। দেবপ্রসাদ ঘোষ (পটলবাবু) ঐ ইউনিয়নের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। গ্যাং কোয়ার্টারে ঘুরে ঘুরে তিনি রেল শ্রমিকদের সংগঠনের কাজ করতেন এবং গ্যাংম্যানের সহায়তায় রেললাইনের কাছাকাছি চা বাগানগুলিতে চা শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ করতেন। চা বাগানগুলিতে তখন বাইরের লোকের প্রবেশ ছিল নিষেধ। সুতরাং গোপনে যোগাযোগ করা ছাড়া উপায় ছিল না। এই সময় সংগঠিত রেল শ্রমিকদের সাহায্যে কমিউনিষ্টপার্টি ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করে।

১৯৪৫ সালে ডুয়ার্সের মালবাজারে ডাক বাংলোর ময়দানে পার্টির নেতৃত্বে এক বিরাট প্রকাশ্য সম্মেলনের মাধ্যমে কেন্দ্রিয়ভাবে চা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। ঐ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং সভাপতি হন রতনলাল ব্রাহ্মণ। ইউনিয়ন লক্ষ্য করে যে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন ডুয়ার্সের চা

শ্রমিকদের প্রভাবিত করতে পারে নি। কারণ, এদের আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক অবস্থা ছিল খুবই সঙ্কটপূর্ণ। দেশের লোক হয়ে এরা ছিল পরদেশীর মত, পরিত্যক্ত, ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত। তাই আর্থিক ও সামাজিক মুক্তি ছাড়া পৃথকভাবে শুধু জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এদের কাছে ছিল অর্থহীন। তাই চা শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠন ও আন্দোলন শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দিকে। পার্টির নেতৃত্বে ডুয়ার্সের রেল শ্রমিক আন্দোলন এদের অনুপ্রাণিত করলো।

ইউনিয়ন থেকে শ্রমিকদের মজুরীবৃদ্ধি, পে-স্কেল চালু, বোনাস, গ্রাচুয়িটি, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, বাগিচা কানুন, প্রসূতিভাতা, সস্তাদরে রেশনের ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তৎকালীন বাংলাদেশের লেবর কমিশনারের নিকট দেওয়া হয়। লেবর কমিশনার I. T. P. A. এবং D. P. A. শ্রমিকদের ঐ দাবী সম্বলিত স্মারক লিপিটি কর্তৃপক্ষের নজরে দেয়। I. T. P. A. এবং D. P. A. তখন মালিকপক্ষের অনুগত ইউনিয়ন গঠনের জন্য তৎপর হয়ে পড়েন। (Reference : I. T. P. A. 1946 : 104 ; D. P. A. 1947, Appendix B : 105 ; December 1946).

পার্টির নেতৃত্বে চা শ্রমিকরা ছেচল্লিশের ঐ উত্তাল তরঙ্গে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের সাথে সাথে ঐ সব দাবীদাওয়া সহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বংশধর চা বাগিচায় ইংরেজ মালিকদের শোষণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে "বিলেতী মালিক লণ্ডন ভাগো" ইত্যাদি। ইংরেজ ম্যানেজাররা আইনকানুন কিছুই মানত না। তাদের কথাই ছিল আইন। থানা, পুলিস ও সরকারী অফিস ম্যানেজার বাবুদের কথামত চলতো। শ্রমিকদের উপর বিভিন্ন অত্যাচার ও পীড়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষের ফলে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়।

শ্রমিকদের একটা সাধারণ ধারনা ছিল যে, ইংরেজ মালিকরা তাদের আন্দোলন দমনের জন্য যে কোন পীড়ন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাই তারা যখন কোন দাবী নিয়ে ম্যানেজারের কাছে যেতো তখন মেয়ে-পুরুষ, বালক-বালিকা সমস্ত শ্রমিক পরিবার বিক্ষোভে ফেটে পড়তো এবং ম্যানেজারকে ঘেরাও করে সঙ্গে সঙ্গে দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত ছাড়তো না। সাহেব ম্যানেজার খারাপ ব্যবহার করলে শ্রমিকদের সহস্র হাত ঝাঁপিয়ে পড়তো তার উপর। শ্রমিকদের মরিয়া হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ তারা জানতো আইন কানুন, পুলিস, আদালত সবই মালিকের পক্ষে।

ঐসময় লক্ষীপাড়া বাগানে একটি ঘটনা ঘটে। শ্রমিকরা অতিরিক্ত কাজের ঠিকার জন্য বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ম্যানেজার পালিয়ে গেল তার কুঠিতে। শ্রমিকরা কুঠি ঘেরাও করল। কুঠির জানলা ও দরজার কাঁচগুলি ভেঙ্গে দিল। ঘরে ঢুকে টাকার তোড়াগুলি নিয়ে দা দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে ফেলে দিল। ম্যানেজারের মোটরগাড়ীটাও ভেঙ্গে দিলো। ফলে ধূমচি পাড়া বাগানের ম্যানেজার মিথ্যা কেস দিয়ে শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করালো। ঐ ঘটনায় বাগানের মেয়ে-পুরুষ সমস্ত শ্রমিক বাগানের মধ্যে পুলিসকে ঘেরাও করে রাখে। তাদের দাবী, হয় নেতাদের ছেড়ে দাও নয়তো সকলকে জেলে নিয়ে যাও। পুলিশ বাধ্য হ'ল ম্যানেজারকে জামিন করে নেতাদের ছেড়ে দিতে। হায় হায় পাথার, মীনগ্রাম, বাগরাকোট, ভগতপুর, ডেঙ্গুয়াঝাড়, কালচিনি প্রভৃতি বহু বাগানে এরকম ঘটনা ঘটে।

ঐ সময় রেলশ্রমিকদের সহায়তায় চা শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ আরো জোরদারভাবে শুরু হয়। গোপনে ঝাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাতের অন্ধকারে বাগানের সাথে যোগাযোগ করতেন পটলবাবু। লক্ষীপাড়া চা বাগানের ম্যানেজার জানতে পারে পটলবাবু বাগানে আছেন। তখন ঐরাতে ম্যানেজার কয়েকজন চৌকিদার পাঠিয়ে দেয় পটলবাবুকে ধরে আনার জন্য। চৌকিদার সব লাইনে গেলে লাইনের শ্রমিকরা বেরিয়ে চৌকিদারদের ঘেরাও করে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে শ্রমিকরা পটলবাবুকে আড়াল করে বাগানের বাইরে নিয়ে যায় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামে এক কৃষকের বাড়ীতে তাঁকে নিরাপদে রেখে দেয়।

ডায়না বাগানে অবস্থানকালে কমরেড অনিল গুপ্তকে চৌকীদার পাকড়াও করে বেঁধে ম্যানেজারের কাছে নিয়ে যায়। অনিল গুপ্তকে প্রচণ্ড মারধোর করে পুলিসের হাতে দেয়। কমরেড শচীন দাসগুপ্তকে ডেঙ্গুঝাড় বাগানে অনুরূপ ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম করে পুলিসের হাতে তুলে দেয়। উল্লেখ্য যে, কমরেড পটল ঘোষ জীপগাড়ীতে করে একদিন মীনগ্রাম বাগানে ম্যানেজারের কুঠির সামনে দিয়ে সহজ রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন। ঐ সময় ম্যানেজার গাড়ী থামিয়ে তাকে গালাগাল করে এবং তার প্রাইভেট রাস্তা দিয়ে কেন আসা হয়েছে বলে চার্জ করে। পটলবাবু বলেন, প্রাইভেট রোড বলে কিছু আইনে নেই। প্রাইভেট রোড মানি না। দূর থেকে পটলবাবুকে বাগানের শ্রমিকরা দেখতে পেয়ে সেখানে এসে জড় হয়। বেগতিক দেখে ম্যানেজার কুঠিতে চলে যান। এরকম বহু ঘটনা শ্রমিকদের মনে রেখাপাত করে।

১৯৪৬-৪৭ সালে চা শ্রমিকদের আন্দোলন আরো জোরদার হয়। এই সময় রেলশ্রমিক, চা শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তঃ ঐক্য গড়ে উঠে এবং কৃষকদের তেভাগার দাবীতে হাজারে হাজারে মিছিল করে গ্রামে বড় বড় জোতদারের খোলানে তেভাগা করে।

রেলশ্রমিক আন্দোলন : বি-ডি রেলের হেড অফিস ছিল প্রথমে বার্নিশ জংশনে, পরে দোমোহিনীতে আনা হয়। এটি ছিল বিলেতী কোম্পানী। ইংরেজ সাহেবদের দাপট ছিল পুরোমাত্রায়। ভারতীয়দের নেটিভ ভেবে ইংরেজ সাহেবরা দাসসুলভ ব্যবহার করতো। বিভিন্ন আইন ছিল এদের সুবিধামতো। লালমনির হাট থেকে মাদারী হাট, মালজংশন থেকে বাগরা কোট। এরপরে আর কোন রেললাইন ছিল না। আসামে যাওয়ার লাইন ছিল লালমনির হাট দিয়ে। আর শিলিগুড়ি দার্জিলিং যাওয়ার লাইন ছিল পার্বতীপুর, জলপাইগুড়ি দিয়ে।

এই ছোট্ট ২০০ মাইলের রেল কোম্পানীর আয় ছিল ভারতের সমস্ত বড় বড় রেল কোম্পানির সারিতে তৃতীয় স্থানে। চা শিল্প ও ফরেস্ট বিভাগের প্রয়োজনে আমদানি রপ্তানির জন্য এই রেল লাইনের প্রতিষ্ঠা। নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্যের আমদানি রপ্তানি এবং যাত্রী চলাচলও ভালো ছিল। খালাসী অর্থাৎ গ্যাংম্যানদের মাইনে ছিল ১২ টাকা, দক্ষ শ্রমিক ও মাঝারী কর্মচারীদের ৩০।৪০ টাকা থেকে শুরু। আর উপরের কর্মচারীদের ৫০।৬০ টাকা থেকে। ১৯৩৮ সালে বিলেত থেকে মিষ্টার স্লেইন নামে হোম বোর্ডের একজন প্রতিনিধি এলেন। উদ্দেশ্য শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই করা, মাইনের স্কেল আরো

কমিয়ে দেওয়া। কৈফিয়ৎ আয় কম। সাদা চামড়ার সামনে যারা কথা বলতে ভয় পেতো তারা রুখে দাঁড়ালো।

অফিসে, কারখানায়, স্টেশনে, গ্যাং কোয়ার্টারে প্রতিদিন শ্রমিকেরা জড়ো হতে লাগল। তাদের আওয়াজ, সাহেবদের একথা মানবো না। গোপনে সভাসমিতি হতে লাগল। গণদরখাস্তে শ্রমিকরা স্বাক্ষর করল। ইউনিয়ন গঠিত হল। বীরেন দাসগুপ্ত সম্পাদক এবং জে এন দাসগুপ্ত সভাপতি। ম্যানেজার রিড সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ultimafum দিলেন সভাপতি। যদি দাবি না মানো তবে, 'one fine morning you will see your wagons are standing in as it is and wheels are not moving শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্য ছিল বলিষ্ঠ। সকলেই এককথায় উঠে বসে। ইউনিয়নের নির্দেশ ২০০ মাইল রেলপথে জানিয়ে দিতে সময় লাগে ২০।২৫ মিনিট। কোম্পানী ভয় পেল। চেয়ারম্যান এলো বিলেত থেকে। দাবী মানতে বাধ্য হল। শুধু নতুন যারা চাকরীতে ভর্তি হবেন তাদের জন্য নিউস্কেল থাকলো।

১৯৩৮ সালে বি-ডি-রেল নিয়ে বেঙ্গল ও আসাম রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয় দোমোহানীতে। দোমোহানীতেই ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল। সম্পাদক বীরেন দাসগুপ্ত, সভাপতি জে-এন দাসগুপ্ত। পয়েন্টম্যান, গ্যাংম্যান থেকে শুরু করে স্টেশন মাষ্টার, টি, আই' অফিসের কেরানী সকলেই ইউনিয়নের সভ্য ছিলেন।

দোমোহানীই ছিল উত্তরবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলন তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পীঠস্থান। এখান থেকে দার্জিলিং ও আসামে স্কোয়াড যেত ইউনিয়নের প্রচার করতে। ষ্টেশন মাষ্টার কালী পাল ও কালী ঘোষের নেতৃত্বে একটি স্কোয়াড যায় দার্জিলিং'এ ইউনিয়ন গঠনের প্রচার করতে। ইউনিয়নের কাজে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল প্রচুর। দোমোহানীতে কমরেড পটল ঘোষ, পরিমল মিত্র ও বীরেন দাসগুপ্ত সহ ইউনিয়নের কাজে যাদের সর্বদাই সক্রিয় ভূমিকা পাওয়া যেত তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, যদুনাথ সিং, পরিচ্ছন্ন মিস্ত্রি, ইয়াকুব মিঞা, অপরেশ রায়, হীরালাল, রেবতী মোহন বসু, রামচরির মিস্ত্রী, ইন্দু দাসগুপ্ত, বারীন বিশ্বাস, রামেশ্বর সিং, নিতাই রায়, শিবেশ্বর আচার্য্য, মোহিত বাগচী, অনিল মুখার্জী, গদাধর, অনিল মিত্র, মান সিং, লালবাহাদুর ছেত্রী, নিখিল, বিনয়, বীরেন, আব্দুল সামাদ, সীতানাথ, দীনবন্ধু চ্যাটার্জী, রামস্বরূপ মিস্ত্রী, রণেন ঘোষ দস্তিদার, অরুণ বিকাশ সিংহা, জগন মাহাতো, সোনেলাল, সীতারাম, রামনাথ, খোদাবক্স, মহাবীর মিস্ত্রী, নিতাই ব্যানার্জী, সুভাষ বালো, অমূল্য সেন, পি. লাহিড়ী, সান্যালবাবু, প্রভাত সেন, পরেশ সেন, রামানন্দ ঝাঁ, রামাশীষ, সত্য চ্যাটার্জী, মৃণাল চক্রবর্তী, বুধন, যমুনা কুর্মী, ফাগুয়াস, মোর্চা মেখু প্রমুখ আরো অনেকে। ইউনিয়ন রেল কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি পেয়েছিল।

প্রসঙ্গত জানাই মাননীয় জ্যোতি বসু যিনি এই ইউনিয়নের পরে জেনারেল সেক্রেটারী হন, তিনি বিলেত থেকে প্রথমে কাচরাপাড়াকে কেন্দ্র করে বি. এ. রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নামে একটি রেল শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করেন ১৯৪৪ সালে। সেই ইউনিয়নের স্বীকৃতি ছিল না। কমিউনিষ্ট ইউনিয়ন বলে রিকগনিশন পাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। আমরা দোমোহানীতে বি. এ. রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে ভেতর থেকে নানাভাবে সংগঠিত করে জ্যোতিবাবুর ঐ ইউনিয়নের সাথে সংযুক্ত করেছিলাম। এ কাজ করার জন্য বহু প্রচেষ্টা ও আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হয়েছে এবং জ্যোতিবাবুকেও অনেকবার তিস্তা ভেঙ্গে দোমোহানীতে আসতে হয়েছে। দুটি ইউনিয়নের সংযুক্তির পর দোমোহানীর বি. এ রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নাম থেকে যায় এবং জ্যোতিবাবুর ইউনিয়নের নাম তুলে দেওয়া হয়। সংযুক্তির পর বাংলা-আসাম জুড়ে বিরাট রেলশ্রমিক ইউনিয়ন রেল কর্তৃপক্ষের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে। সংযুক্তির পর এই ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী হন জ্যোতি বসু এবং জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী হন বীরেন দাসগুপ্ত, সভাপতি বঙ্কিম মুখার্জী। ইউনিয়নের সাথে আলোচনা না করে কর্তৃপক্ষের কিছু করার উপায় ছিল না। ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত বিকল্প রেল প্রশাসনের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। আন্দোলনের কিছু ঘটনা এখানে উল্লেখ করি। রেলের গ্রেনশপ থেকে সস্তাদরে সরিষার তেল দেওয়া হতো। হঠাৎ ঐ তেলের সঙ্কট তৈরী হয়। বাজারে বেশি দামে তেল পাওয়া যায়। গ্রেনশপে তেল নেই। সঙ্গে সঙ্গে পোষ্টার পড়ে গেল ষ্টেশনে ডিপার্টমেন্টে, রেলগাড়ীতে। তারিখ ঘোষণা করে বলা হলো ঐ নির্দিষ্ট দিনে শ্রমিক কর্মচারীরা নিজ নিজ ডিপার্টমেন্টের অফিসারের সামনে সমবেত হবেন। সরিষার তৈল ও অন্যান্য জিনিসের সরবরাহ নিয়মিত হলে তবেই কাজে যোগ দেওয়া হবে ; নচেৎ কাজ বন্ধ থাকবে। সবাই তৈরী হয়ে গেল। যথাসময় হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী দোমোহানী ডিস্ট্রিক্ট অফিসের সামনে হাজির হলেন। কাজ বন্ধ। সুশৃঙ্খল ও সংগঠিত সমাবেশ। মাঝে মাঝে শ্লোগান দেওয়া হয়। রেলের বড় অফিসাররা লালমনির হাট ও কলকাতার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন। পরে ইউনিয়নকে জানিয়ে দিলেন, আগামীকাল থেকে সরিষার তেল ও অন্যান্য জিনিস দেওয়া হবে ঃ ইউনিয়নের প্রতিনিধি সঙ্গে করে বার্নিশ বাজার থেকে সরিষার তেল ক্রয় করা হয়।

দ্বিতীয় ঘটনা জনৈক হারাধন ড্রাইভার একটি মেমো হাতে করে এসে ইউনিয়ন অফিসে জানালেন, অসুস্থ অবস্থায় সিক রিপোর্ট দিতে ফোরম্যান সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি ডাক্তার সাহেবকে মেমো লিখে দিয়ে বলছেন, কাজ করতে হবে। মেমোতে লেখা আছে, Please advise this driver to work with medicine. রুগী সম্পর্কে ডাক্তারকে এমন নির্দেশ দেবার ঘটনা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। ফোরম্যানের কাছে যাওয়া হল। ফোরম্যান সাহেব অল্পদিন হলো এসেছেন। তিনি হুকুমের দ্বারা কাজ চালাতে চান। কাজের খুব বিশৃঙ্খলা। তার অফিসঘরে আরো ৭।৮ জন ড্রাইভার তাদের নানা অসুবিধার কথা ফোরম্যানকে বলছেন। ফোরম্যান টেবিল চাপড়িয়ে গরম গরম কথা বলছেন। ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি বাইরে বেরিয়ে লোকো শেডের জপফদের সঙ্গে খানিক চেঁচামেচি করে এসে চেয়ারে বসলেন। ঐ মেমোটা দেখিয়ে বলা হল, This is irregular memo you can Simply direct for medical advice. সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বল্লেন, I am right. My order will stand. Get out from my

office. ইউনিয়ন নেহি মাঙ্গতা। আমরা বেরিয়ে এসে সোজা শেডের মধ্যে কর্মরত শ্রমিকদের সামনে উপস্থিত হলাম, কথা বল্লাম। কাজ বন্ধ হয়ে গেল। ফোরম্যান চাকা বন্ধের আওয়াজ শুনে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করে একা একাই চেঁচাতে লাগলেন "চাক্কা চালু"। পরে বেগতিক দেখে সোজা বাংলোতে চলে গেলেন। সর্বত্র খবর পৌঁছে গেল। সহকর্মীরা সব এসে হাজির। সব ডিপার্টমেন্ট থেকে কাজ ছেড়ে শ্রমিক কর্মচারীরা চলে এলেন। ষ্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। ইঞ্জিনের সামনে শত শত লোক দাঁড়িয়ে গেলেন ঃ ড্রাইভার, ফায়ারম্যান ইঞ্জিন থেকে নেমে এলেন। লাইনে লাল নিশান পোতা হলো। ট্রেনের যাত্রীরাও সমবেত শ্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গে দাবী করলেন, এখনি বিচার চাই। অপদার্থ ফোরম্যানকে অপসারিত করো। বড় সাহেবেরা এলেন। ফোরম্যানকে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা হলো সিক মেমো বাতিল করা হলো। অপরাপর ড্রাইভারদের অসুবিধাগুলি দূর করার আশ্বাস দেওয়া হলো। ঘণ্টা চারেক পরে আবার রেলের চাকা চালু হলো।

প্রসঙ্গত জানাই, ইউনিয়ন শুধু রেল শ্রমিক কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছে এমন নয়। ১৯৪২-৪৩ সালে "মা, একটু ফ্যান দাও" বলে যখন গ্রাম বাঙলার মায়েরা দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে লাগলেন তখন, ইউনিয়ন অফিসে লঙ্গরখানা খুলে প্রতিদিন শতশত নরনারীকে খাওয়ানো হতো। প্রায় দুই মাস যাবৎ শ্রমিক কর্মচারীদের সাহায্যে এই লঙ্গরখানা চালানো হয়। গান বাঁধলেন শ্রমিকরা। কমরেড পাঁচুতুরী'র লেখা গান,

> ইউনিয়ন জিন্দাবাদ হাঁমরা ইউনিয়ন জিন্দাবাদ
> এক হামারা দুখ্ হ্যায় ভাইয়া ভাইয়া এক হামরা সুখ
> এক হামারা ঘর দরবাজা কেইসে হোগা ফুট
> হামসে কেইসে হোগা ফুট—
> মগর হোমসে রহনা মজদুর তুমহে ফুট না আওয়ে,
> সেই সে তুমহে ফুটনা আওয়ে—
> ধনীয়োঁকা দালাল সেইসে তুমহে ঘুসনা যাওয়ে।
> তুহি ভাই রেল চলাকর অনচলাচল কিয়া
> লঙ্গরখানা খোল তুহিনে মা বহিন বাঁচায়া
> আব্ তুহিনে আপনি হালৎ জনতাকো জানাও
> আপনি মাঙ্গো পিছেয়োতু জনতায়োকো লাও,
> তব তুমহারা জান বাঁচেগা আউর তুমহারা মাঙ্গ—
> তব যাকর যা বাঙাল বাঁচেগা আউর সারে জাহান।

জলপাইগুড়ির রেডক্রস ও কলকাতার পিপলস্ রিলিফ কমিটির সহায়তায় রেলের মহিলা সমিতি মারফৎ শিশুদের জন্য দুধ, নানা প্রকার ভিটামিন ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

রেলশ্রমিক ও রেল ইউনিয়নের কর্মীরা চা শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সংগঠক। রেলের পয়েন্টসম্যান, গ্যাংম্যানরা চা শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। রেলশ্রমিকদের আন্দোলনে সাফল্য দেখে চা শ্রমিক ও কৃষকেরা উৎসাহিত হন।

বি-এ রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় লামডিং-এ ১৯৪৬ সালের ৬।৭।৮-ই ডিসেম্বর। ঐ গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে যে প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয় তার মধ্যে ৪র্থ নম্বর প্রস্তাব হলো তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে। প্রস্তাবে বলা হয় যে, "বাঙলা ও আসামের কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য অংশ পাওয়ার জন্য যে তেভাগা আন্দোলন শুরু করিয়াছেন এই সম্মেলন তাহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইতেছে। এই সম্মেলন মনে করে যে, যে সমস্ত জমির মালিকেরা ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থায় তাঁহাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণ করেন না তাহারা ফসলের এক তৃতীয়াংশের অধিক পাইবার অধিকারী নহেন। এই দাবীর অনুকূলে আইন পাশ করিবার জন্য সম্মেলন বাঙলা সরকারের প্রতি আবেদন জানাইতেছে।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জীবনযাত্রার ব্যয় ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৪৬ সালে সারা ভারত জুড়ে রেলের চাকা বন্ধের আওয়াজ ওঠে। ১৯৪৬ সালের ২৭শে জুন সারাভারত রেল ধর্মঘট ঘোষিত হয়। A. I. R. F. থেকে এই ঘোষণা করা হয়। দাবী ছিল বেতন বৃদ্ধি, মাগ্গীভাতা, গ্রেনশপ, পে-কমিশন ও এডজুডিকেসন। সারা ভারত জুড়ে রেললাইনে এই প্রথম সংগঠিত আন্দোলন। জাতীয় জাগরণ দেখা দিল ইংরেজ মালিকদের বিরুদ্ধে। ইংরেজ মালিকরা দাবি মানতে বাধ্য হলো। এই জয়ে ডুয়ার্সের সমস্ত শ্রমিকরা লাল ঝাণ্ডা উঠিয়ে বিজয় উৎসব পালন করলেন ও প্রতিটি ষ্টেশন এবং গ্যাং কোয়ার্টারে অভিনন্দন জানানো হল।

তেভাগা ঃ তিস্তা নদী জলপাইগুড়ি জেলাকে দু'ভাগ করেছে। পশ্চিম পারে জলপাইগুড়ি জেলা শহর এবং সংলগ্ন গ্রাম। পূর্ব পার থেকে ডুয়ার্স। ডুয়ার্সে চা বাগান এলাকাও গ্রাম। চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে তপসীলী উপজাতি উরাও, মুণ্ডা, খারিয়া বেশী। নেপালী শ্রমিকও আছেন। অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের বাঙালীরাই অধিকাংশ।

পটল ঘোষ, মান সিং, যদুনাথ সিং, বুধন জুলিয়াস, ফাগুরাম ওঁরাও, জগন্নাথ ওঁরাও প্রমুখ চা শ্রমিক, রেলশ্রমিক ও কর্মীদের চেষ্টায় কৃষকদের মধ্যে তেভাগার হ্যাণ্ডবিল বিলি হতে থাকে এবং মিটিং মিছিল শুরু হয়। গ্রামের গরীব আধিয়ারদের তেভাগার দাবীকে চা শ্রমিক, রেল শ্রমিক প্রভৃতি সকলে একটা সামগ্রিক বাঁচার দাবী হিসাবে গ্রহণ করেন। তাই রেল শ্রমিক, চা শ্রমিক ও কৃষকদের অভূতপূর্ব ঐক্যের সেতু বন্ধনে ডুয়ার্সে তেভাগা সংগ্রাম শুরু হয়। মালবাজার, ওদলাবাড়ী, নেওড়ামঝিয়ালী, মহাবাড়ী, বাতাবাড়ী, মঙ্গলবাড়ী, তেশিমলা, সুলকাপাড়া, সাঁওগা, কলাগাইতী, সরুগাঁ প্রভৃতি এলাকায় এই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে।

> "তুলব না ধান পরের গোলায়
> মরবো না আর ক্ষুধার জ্বালায়, মরবো না
> পঞ্চাশে লাখ প্রাণ দিছি, মা বোনেদের মান দিছি
> সাদা হাতির কালো মাঁহুত তুলি না"

তরাইয়ে তেভাগার লড়াইয়ে জোতদারের ভাড়াটিয়া গুণ্ডার লাঠিতে কমরেড মাধব দত্তের মাথা ফেটেছে। ধানের গায়ে অন্নদাতা কৃষকের রক্ত ঝরেছে। ডুয়ার্সের গ্রামে গ্রামে। চা বাগানে ও রেল লাইনে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল। কালবাজারে রেলের ইউনিয়ন অফিসে মিটিং চলছিল। সেখানে কয়েকজন উপজাতি কৃষক এসে বলল, 'একঠো ঝাণ্ডা দিজিয়ে'। ওদের হাতে লাল একটা ঝাণ্ডা দিজিয়ে, পহিলা মার্চ দোমোহানী মিটিংসে জায়গা'। ঠিক ওরা দল বেধে

মিটিং-এ গেল। কিন্তু সে যাওয়া সাধারণ মিছিল মিটিং-এ যাওয়া নয়। ডুয়ার্সের কৃষক, চা শ্রমিক ও রেল শ্রমিকের উত্তাল তরঙ্গ।

লালমনির হাট থেকে মাদারীহাট ২০০ মাইল রেলপথের উপর যেন ডুয়ার্সের জনজীবন ঝাঁপিয়ে পড়লো। ট্রেনে জায়গা নেই, গাড়ি চাই, স্পেশাল ট্রেন চাই। দোমোহানীতে রেলের বড় সাহেবরা ছুটাছুটি শুরু করলেন। ষ্টেশনে ষ্টেশনে চা চালান দেওয়ার জন্য যেসব খালি মালগাড়ি ছিল সেগুলি জুড়ে দেওয়া হলো। কিন্তু তাতেও বহু লোক পড়ে থাকলো। ইউনিয়নের নেতাদের কাছে বড় সাহেবরা অনুরোধ করলেন, "প্লীজ ম্যানেজ।" গাড়ি অভাবে বহুলোক পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। মায়েরা পিঠে বাচ্চা বেঁধে চলেছেন, ছেলেদের কাঁধে তীর ধনুক, টাঙ্গি, কিছু চিড়া মুড়ির পোটলা। বালকদের হাতে ঝাণ্ডা. গোটা গোটা পরিবার চলেছেন।

জেলাশাসক দোমোহানীতে ১৪৪ ধারা জারী করে জনসভা নিষিদ্ধ করে দিলেন। কিন্তু সেদিন ডুয়ার্সের যে গণদেবতা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তাকে শাসন করার ক্ষমতা জেলাশাসকদের ছিল না। শুধু দোমোহানী নয় সারা ডুয়ার্স জুড়ে শ্রমিক-কৃষক ঐক্যযুদ্ধ আওয়াজ তুল্লেন, "বিলেতী মালিক লণ্ডন ভাগো", "জমিদারী খতম কর", "তেভাগা দাবী মানতে হবে" ইত্যাদি। ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে বিশাল সভা হ'ল। কমরেড জ্যোতি বসু ঐ সভায় ভাষণ দেন। সকলেই উৎসাহিত হয়ে ফিরে চললেন। যারা গাড়ীর অভাবে দোমোহানী মিটিং-এ আসতে পারেন নি তারা দলে দলে উপস্থিত হয়ে তেভাগা করতে লেগে পড়লেন।

মহাবাড়ি বস্তির বড় জোতদার গয়নাথের খোলানে তেভাগা একটি স্মরণীয় ঘটনা। মেটেলী থানার মহাবাড়ী বস্তি থেকে মাল থানার পনোয়ার বস্তিতে অবস্থিত কৃষক সমিতির অফিস পর্যন্ত ৫।৬ মাইল রাস্তায় যোগাযোগ রক্ষা করে কৃষক শ্রমিকরা তেভাগা করছিলেন। পুলিস বাহিনী জোতদারের পক্ষ হয়ে তেভাগাকারী কৃষক শ্রমিকদের উপর গুলি চালায়। গুলিতে ৯ জন ঘটনাস্থলে মারা যান। সাতজন গুরুতর আহত হন। গুলি খাওয়া আহতদের মধ্যে ছিলেন বাতাবাড়ি চা বাগানের পাতরাশ ওঁরাও, ওদলাবাড়ি চা বাগানের জিতু কুমার, হোসনা ওঁরাও, মঙ্গরু ওঁরাও, সাওগাঁ বস্তির ভুলন ওঁরাও, দক্ষিণ ওদলাবাড়ি বস্তির বুধু ওঁরাও, শুকরা ওঁরাও প্রভৃতি। আহতদের কাঁধে করে নিয়ে মাল জংশন রেল হাসপাতালে ফার্স্ট এড এর ব্যবস্থা করেন। নিখিল, বিনয় প্রমুখ লোকো শেডের শ্রমিকরা আহতদের স্ট্রেচারে করে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। নিহতের মধ্যে ছিল একজন আট বছরের বালক। হাতে ছিল লাল ঝাণ্ডা। পুলিসের গুলিতে যখন বালকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখনও তার হাত থেকে লাল ঝাণ্ডা ছাড়েনি।

রেলের পয়েন্টস্ ম্যান মান সিং। সাত দিনের ছুটি নিয়ে তেভাগা করতে বেরিয়েছিল। মান সিং চলতো আধা মিলিটারী বেশে। পায়ে বুট ও ফুলমোজা, খাঁকি হাফ প্যান্ট। গরম ওভারকোট আর একটা বড় সাহেবী টুপি। কোমরে থাকতো ভোজালী। ওভারকোটটি ছিল তার শীতের বিছানা। এক সন্ধ্যায় মান সিং বল্লো, একমাস ধরে তার পায়ের বুট খোলার অবসর হয়নি। মিটিং আর ভলান্টিয়ার বাহিনী নিয়ে তেভাগা এই ছিল একমাস ধরে নিয়মিত কাজ।

রানারহাট বিন্নাগুড়ি অঞ্চলে চা বাগান সংলগ্ন গ্রামগুলিতে তেভাগা শুরু হয়েছে। কৃষকেরা সরুগাঁ বস্তিতে তেভাগা করে ভলান্টিয়ার নিয়ে নেওড়ামাঝিয়ালী প্রবেশ করেন। ব্রহ্মধুয়ায় বড় বিরসার দল পুলিসদলকে তাড়া করে পিছু হটিয়ে দেয়। নেওড়া মাঝিয়ালীতে এই ভলান্টিয়ার দলের নেতৃত্বে ছিলেন ট্রাইবাল মেয়ে পোকো ওঁরাও ও তার বোনেরা। ফরেষ্টের মধ্যে শিবির হয়েছে, সেখানে খাবার জন্য ধানের গোলা খুলে দিয়েছেন ট্রাইবাল ধনীকৃষক বন্দেভগত, বিজলাভগত প্রমুখ। অত্যাচারী জোতদারকে গাছের সঙ্গে বেঁধে মেয়েরা শাস্তি দিয়েছে। খুশি মহাম্মদের খোলানে তেভাগা করতে গিয়ে নেতৃত্ব দেন বন্দেভগতের মা, লেধরা বুড়া, সরবরু মহাম্মদ প্রমুখ।

তেভাগার সময় মাদল বাজানো হতো। মাদলের বাজনা রিলে করা হতো গ্রামে গ্রামে ও চা বাগানে। মাদলের বাজনা শুনে তীর ধনুক সজ্জিত হয়ে শ্রমিক কৃষকেরা চলতেন তেভাগায়। বিশ্বস্ত নেতা ও কর্মী ছাড়া অন্য কেউ লাল ঝাণ্ডা বাড়িতে ওড়াতে পারত না। যার বাড়ীতে লাল ঝাণ্ডা উড়ত তার খুব সম্মান ছিল।

তেভাগার সময় 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সাংবাদিক ননী ভৌমিক ডুয়ার্সে এসেছিলেন। ঐ সময় কমরেড পটল ঘোষ ও ননী ভৌমিক গ্রেপ্তার হন। সংগ্রাম দমন করার উদ্দেশ্যে ১৪৪ ধারা জারী করে পুলিস ছেয়ে ফেললো মালবাজার ও তার চতুর্দিকে। ধরপাকড় শুরু হলো। অপরদিকে, চা বাগানের শ্রমিকদের তেভাগা আন্দোলন থেকে নিরস্ত করার জন্য কয়েক পয়সা হাজিরা বাড়িয়ে দালাল লাগিয়ে শ্রমিকদের বোঝাতে শুরু করলো, তেভাগা কৃষকেরা পাবে, তোমাদের সেখানে গিয়ে লাভ কি? ব্যাপক দমন পীড়ন সত্ত্বেও শ্রমিক কৃষকদের মনোভাব অটুট ছিল। আমাদের আন্দোলনের ফলেই ১৯৫৬ সালে ডুয়ার্সের বড় জোতদার ফতেচাঁদ মহেশ্বী, কাউচার আলম, রমণী রাহুত, জমিরুদ্দিন, নিজামউদ্দিন, ইসলাম পণ্ডিত, মুকুট প্রসাদ প্রভৃতির অতিরিক্ত জমি খাস হয়।

পরিশেষে জানাই, ডুয়ার্সের তেভাগা সংগ্রামের নেতা ও বীর সৈনিকদের মধ্যে অনেকে আজ জীবিত নেই। কমরেড পটল ঘোষ মারা গেছেন ১৯৭২ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর, মালবাজারে। কমরেড মানসিং সাতদিনের ছুটি নিয়ে আর রেলের চাকুরীতে ফিরে আসেন নি। তেভাগা আন্দোলনের শেষে চলে গিয়েছিলেন ভুটানে। কয়েক বছর পরে একবার দেখা হয়েছিল। বললেন ভুটানেও কৃষকদের মধ্যে লাল ঝাণ্ডার কথা চলছে। গুলি খাওয়া কমরেড পুরিয়া মানকি মুণ্ডা মারা গেছেন। রেলশ্রমিক যদুনাথ সিং ১৯৪৮ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি বেআইনি ঘোষণা হলে আত্মগোপন অবস্থায় টি. বি. রোগে আক্রান্ত হন। শেষ অবস্থায় জলপাইগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে মারা যান। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাস। বালাবাড়ি চা বাগান থেকে মিটিং করে বাস ধরার জন্য বালাবাড়ি মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম হঠাৎ দেখলাম এক বৃদ্ধ কঙ্কালসার চেহারা, চোখ দুটি কোটরস্থ, খালি গা, পরনে ছেঁড়া ময়লা এক টুকরা কাপড়। দূর থেকে আমাকে দেখে হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়ালো। সন্দিগ্ধ মনে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি পাতরাম না? হেসে বললো, হ্যাঁ। কোথায় থাকো, কি কর? বল্লো, যেখানে যখন যে কাজ পাই করি, দিন মজুরী খাটি। পাতরামের বৃদ্ধ বয়সে এই অবস্থা দেখে মন বড় খারাপ লাগলো। মনে হলো আমরা, উত্তরসূরিরা অপরাধী। পরে জানতে পেলাম পাতরাম মারা গেছেন।

সাম্প্রতিক মূল্যায়ন

মৌভোগ

বিষ্ণু দে

জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কৃষাণের বউ পইছে বাজু বানায়।
যাত্রা তাদের কঠিন পথে রাখীবাঁধা কিশোর হাতে—
রাক্ষসেরা বৃথাই রে নখ শানায়।

নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে
তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল,
লাল তিলকে ললাট রাঙা, ঊষার রক্তরাগে
—কার এসেছে কাল?

চোরডাকাতে মুখোশ পরে, রাক্ষসেরা ছাড়ে
চোরাই মাল, ঢাকে কালো কানায়।
মরিয়া যত রানীর জ্ঞাতি কঙ্কালী পাহাড়ে
মড়ক-পূজা নরবলিতে জানায়।

এদিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে
ভায়ের মিলে প্রাণের লালনিশান।
তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামারশালে মজুর ধরে গান ॥

[সন্দীপের চর]

তেভাগা ও কৃষক আন্দোলনের প্রবাহ

বিনয় কোঙার

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার সংগঠিত কৃষক আন্দোলনগুলির মধ্যে তেভাগা আন্দোলন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ বছর সেই তে-ভাগা আন্দোলনের ৫০ তম বর্ষ পালন করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ—দু'বাংলাতেই। অনেক আলোচনা হচ্ছে, বিশ্লেষণ হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার আজকের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ স্বয়ম্ভু নয়, অতীতের ঐতিহ্যের ধারা বেয়েই তার বিকাশ। সেইজন্য 'অতীতের সুখ স্মৃতি বিলাসের' জন্য নয় বিকাশের ধারা বা গতিকে উপলব্ধি করার জন্য এ আলোচনা চলছে।

২

কৃষক বিদ্রোহ ভারতে বা বাংলায় নূতন কিছু নয়। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দিতে বাংলায় অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। ইতিহাসের পরিহাস যে ইউরোপে সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের গর্ভোদ্ভূত নূতন বুর্জোয়া বা মধ্যশ্রেণী যখন পুঁজিবন্দী বিকাশের স্বার্থে ক্ষমতা দখলের জন্য 'রাজতন্ত্র, জমিদারতন্ত্র নিপাত যাক, কৃষকের হাতে জমি চাই' এই আওয়াজে কৃষকদের সংগঠিত করছিল, মাতিয়ে তুলছিল, প্রায় সেই সময়েই ব্রিটিশ বেনিয়ারা নিজেদের ক্ষমতাকে পোক্ত করার জন্যই পূর্বভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বা জমিদারী ব্যবস্থার পত্তন করে। জমিদারদের রাজস্ব নির্দিষ্ট থাকলেও কৃষকদের খাজনার কোনও সীমা রইল না। জমিদাররাই হয়ে দাঁড়াল সমাজের প্রভু, জমিদারী হল মর্যাদার প্রতীক। জমিদারদের স্তর বাড়তেই লাগল। বড় জমিদাররা তাদের বিশাল জমিদারী তুলনায় ছোট জমিদারদের মধ্যে পত্তনি ছিল, তারা আবার নিজেদের পত্তনীর এলাকা তাদের নীচের কয়েকজনকে পত্তনি দেওয়া শুরু করল। প্রত্যেকেই নিজেকে যা দিতে হয় তার চেয়ে বেশি আদায় করতে থাকল। কৃষক ও সরকারের মধ্যে বহু স্তর সৃষ্টি হল। বাখরগঞ্জ মহকুমায় সর্বাধিক ৫২টি স্তর তৈরি হয়েছিল।

খাজনাই শুধু বাড়তে থাকল, তাই নয়, তার চেয়েও বেশী বাড়ল নানারকম আবওয়াবের জুলুম।

কৃষি উৎপাদনও কমতে থাকল। পুরানো নবাবী আমলে রাজস্ব আদায় হত উৎপন্ন ফসলের অংশে। রাজস্ব বৃদ্ধি নির্ভর করত ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর। উৎপাদনের স্বার্থে পুকুর, দীঘি কাটতে হত, নিকাশি খালগুলির নাব্যতা বজায় রাখার কাজ করতে হত। নূতন জমিদারদের এ দায় রইল না। প্রখ্যাত জলপ্রযুক্তিবিদ স্যার উইলিয়ম উইলক্স সাহেব তাঁর 'বাংলার প্রাচীন সেচ ব্যবস্থা' নামক পুস্তকে কিভাবে এগুলি ধ্বংস হল এবং তার মর্মান্তিক পরিণতি মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

কুটিরশিল্প ধ্বংস হল বিলাতি পণ্যের স্বার্থে। ব্রিটিশ হাউস অব কমান্স-এর সিলেক্ট কমিটির সদস্য চার্লস ট্রিভল্যানের ১৮৪০ সালের ভাষায়—'আমরা (ভারতের) ম্যানুফ্যাকচারকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছি। এখন কৃষি ছাড়া কোন গতি নাই।' গ্রামীণ কুটির শিল্পগুলি ধ্বংস হল, কিন্তু এই উৎখাত হওয়া মানুষের শিল্পে স্থান হল না, ফলে কৃষির উপর চাপ বাড়তে থাকল। এ প্রক্রিয়া বিংশ শতাব্দি পর্যন্ত চলে। ১৮৮১ সালের সেন্সাসে কৃষি-জনসংখ্যার পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায় না। ১৮৯১-এ কৃষি-জনসংখ্যার হার ছিল ৬১.১%, বাড়তে বাড়তে ১৯২১ সালে তা দাঁড়ায় ৭৩ শতাংশে। শুরু হল কৃষির বাণিজ্যিকরণ। ভারতের কৃষি বিশ্বপুঁজিবাজারের অন্তর্ভুক্ত হল। খাদ্য ফসলের উৎপাদন কমতে থাকল, শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার হয় এমন কৃষি পণ্যের উপর জোর পড়তে থাকল। দুর্ভিক্ষ হতে থাকল নিয়মিত। পণ্য বিনিময় কেন্দ্র হিসাবে গঞ্জগুলি গড়ে উঠতে থাকল, উদ্ভব হল কৃষকদের ধনী অংশ থেকে উঠে আসা একটা বেনিয়া শ্রেণী। কৃষকের ঋণ বাড়তে থাকল, বেনিয়ারাই হয়ে উঠল সুদী মহাজনের কারবারী। সুদের হার তখনকার দিনে টাকায় মাসে ১ আনা বা তারও বেশি অর্থাৎ সুদের হার ৭৫% এরও বেশি। নিরক্ষর পশ্চাৎপদ কৃষকরা হত হিসাবের বাইরেও লুণ্ঠিত।

৩

এইসব প্রক্রিয়ার ফলে ভূমিহীনের সংখ্যা ও জমির কেন্দ্রীভবন বাড়তে থাকল। অনাহার-অর্ধাহার ছিল নিয়মিত। ক্ষোভ ফেটে পড়তে লাগল নানা বিদ্রোহে। উনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত এই বিদ্রোহগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন ও স্বতঃস্ফূর্ত। নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কোনও উদীয়মান শ্রেণী ছিল অনুপস্থিত। কৃষক কোনও অখণ্ড শ্রেণী নয়, প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজের একটা বর্গ, যা পুঁজিবাদী বিকাশের পথে অনিবার্যভাবেই বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। তাই সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রামে পরবর্তী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দুই শ্রেণীর কোনও একটি-বুর্জোয়া বা শ্রমিকশ্রেণীই নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। ইউরোপে বুর্জোয়া শ্রেণীই নেতৃত্ব দিয়েছিল। ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল তখনও অপরিণত। নবজাগরণের প্রতিভূ বলে চিহ্নিত করা হয়, বাংলায় এমন দিকপালদের তখন সমারোহ। আধুনিক ইউরোপীয় যুক্তিবাদী ধ্যানধারণায় অনুপ্রাণিত এই সব চিন্তানায়করা শিক্ষা, সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা-সংস্কৃতির জগতে নূতন আলোড়ন আনার চেষ্টা করেছেন, পুরানো মধ্যযুগীয় কূপমণ্ডুকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন কিন্তু এই সব পশ্চাৎপদতার ভিত্তি যে সামন্তসমাজ-তার বিরুদ্ধে আঘাতকারী কৃষকের বিদ্রোহগুলিতে নেতৃত্ব দেওয়া তো দূরের কথা, তাকে সমর্থনও করতে পারেননি, বিরোধীতা করেছেন। তাঁদের শ্রেণী উৎসের দ্বারাই তাঁরা চালিত হয়েছেন। আশু সংকীর্ণ স্বার্থের প্রভাবে তাঁদের কাছে ব্রিটিশ শাসনের নেতিবাচক দিকগুলি অপেক্ষা ইতিবাচক দিকগুলিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের মতো বিদ্রোহগুলি তো দূরের কথা, নীল বিদ্রোহের মতো বিদ্রোহ যা জমিদারদের বিরুদ্ধে চালিত ছিল না, শুধুমাত্র ব্রিটিশ নীলকরদের বিরুদ্ধে ছিল—তাকে সমর্থন করার জন্য হরিশ্চন্দ্র-দীনবন্ধু মিত্রের মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে ছাড়া কাউকে পাওয়া যায়নি। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর তার জন্য আক্ষেপের অন্ত ছিল না। এর ফলে এই সব আঞ্চলিক খণ্ড বিদ্রোহগুলি বিশেষ ব্যাপকতা পেল না, নির্মম অত্যাচার ও হত্যালীলায় দমিত হল, সংস্কৃতির জগতে নবজাগরণও রয়ে গেল অসম্পূর্ণ। সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার দায় আজও আমরা বয়ে চলেছি। তবে এই সব বিদ্রোহগুলি দমিত হলেও, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ও দখলদার কৃষকদের (রাইয়ত) অধিকার সম্প্রসারণে এগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

৪

এই শতাব্দির শুরু হতে বুর্জোয়া শ্রেণী সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও সামন্ততন্ত্রবিরোধী কৃষক সংগ্রামে তাদের ছিল অনীহা। শিল্প বিকাশের জন্য, পুঁজিবাদী বিকাশের জন্য, প্রয়োজন পুঁজির দ্রুত সঞ্চয়, কাঁচামালের বর্ধিত জোগান ও শিল্প পণ্যের বর্ধিত বাজার। সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের অবসান ও ভূমিসংস্কার তার অপরিহার্য শর্ত। ভূমিসংস্কারের দাবি প্রাথমিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীরই দাবি। ইউরোপে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতায় আসার জন্য সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণীর লক্ষ্য ছিল কেবলমাত্র ব্রিটিশ শাসনের অবসান।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে তবেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম গতিবেগ পেত ও পূর্ণতা লাভ করতে পারত। কিন্তু ইতিমধ্যে দুনিয়ার শ্রমিক কৃষকের ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও চেতনার প্রসারের পটভূমিকার সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রামী ক্ষমতার বিকাশকে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী ভবিষ্যৎ স্বার্থের পক্ষে নিরাপদ বলে মনে করেনি। তাই ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততন্ত্রবিরোধী কোনও সংগ্রামে কখনই প্রশ্রয় দেয়নি, বরং জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে আপস করতেই চেয়েছিল এবং সে আপস আজও চলছে।

ভারতে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনকে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত হওয়া ও সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবশ্রেণী শোষণের পক্ষে একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল। হাজারো বাধা সত্ত্বেও তার বাণী নানাভাবে ভারতে পৌঁছাতে লাগল। ১৯২০ সালে এ আই টি ইউ সি-র প্রতিষ্ঠা হল। সাম্রাজ্যবাদের নানা ষড়মূলক আক্রমণ সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বিপ্লবী অংশগুলি নিজেদের সংহত করার প্রক্রিয়া শুরু করল। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই শতকের দুই এর দশকের

শেষভাগ হতে আঞ্চলিকভাবে কৃষক সংগঠন গড়ে ওঠার পথ ধরে ১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষক সভার প্রতিষ্ঠা। বাংলার তেভাগা আন্দোলন তারই ফসল।

৫

উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগ থেকেই বর্গাপ্রথার প্রচলন শুরু হয়। আগেই বলা হয়েছে জমিদারী ব্যবস্থা, মহাজনী ব্যবস্থার ফলে ভূমিহীন ক্রমেই বাড়ছিল, অথচ শিল্পে তাদের স্থান হচ্ছিল না। কুটির-শিল্প ক্রমেই অবলুপ্ত হচ্ছিল। বংশানুক্রমিক বিভাজনে জমিদারীর আয়তন ক্রমেই ক্ষুদ্র হতে থাকায় আয় কমছিল, অন্যদিকে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে আগে যা জানা ছিল না, এমন সব নূতন নূতন পণ্যের আমদানী জমিদারদের ক্ষুধাকে বাড়িয়ে তুলছিল। নানা বিদ্রোহের ফলে নগদ খাজনা বাড়ানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। ফসলের দামও বাড়ছিল। ১৮৪২ সালে চালের দাম ছিল ১ টাকায় ৪০ সের (১ সের সমান আনুমানিক ৯৩৭ গ্রাম), ১৮৫২ সালে তা হয় টাকায় ৩০ সের, ১৮৭২ সালে টাকায় ২৩ সের, ১৯২২ সালে তা হয় টাকায় ৫ সের (ডঃ রাধাকমল মুখার্জি)। আগে জমিদাররা পুরনো প্রজা উৎখাত হলে সেই জমি সেলামি নিয়ে নূতন প্রজাকে বিলি করত। এখন তারা নূতন প্রজাকে বন্দোবস্ত দেওয়ার বদলে নিজ মালিকানায় জমি রেখে তা বর্গায় বিলি করাই অধিকতর লাভজনক বলে মনে করতে থাকল। অন্য দিকে মহাজনী প্রথার কল্যাণে জমি কৃষকদের হাত থেকে মহাজনদের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে লাগল। সেগুলিও বর্গায় চাষ হওয়া শুরু হল। এইভাবে পুরনো জমিদার থেকে ভেঙে আসা এবং ধনী কৃষকের একটা স্তর ও মহাজনদের থেকে গড়ে ওঠা এক নূতন ধরনের জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হল যাদের কাছে খাজনায় বিলি করা অপেক্ষা, ভাগে জমি চাষ করানোই লাভজনক হয়ে উঠল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভারতের অন্যান্য অংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা না থাকলেও বিবর্তনের মধ্যে সেখানেও একইরকম কেন্দ্রীভবন ও একই রকম প্রথা গড়ে উঠেছিল। একটা প্রথা চালু হলে তা সমাজে ক্রমেই সার্বজনীন হয়ে ওঠে। গরিব বিধবা, চাকুরিজীবী নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত তারাও বর্গায় জমি দিত, কিন্তু সেটা প্রধান ছিল না। পতিত জমি উদ্ধার করার জন্য আদিবাসীদের নিয়ে আসা হত, প্রজাস্বত্বের আসায় সেই জমি অমানুষিক পরিশ্রমে উদ্ধার করার পর বর্গাদারে পরিণত হত। এই শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ হতে বর্গাদারের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে।

৬

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে মহামন্দার কালে ফসলের দর ৫৫ শতাংশ কমে যায়। দেনা বাড়ে, জমি বিক্রি ও বন্ধকী বাড়তে থাকে। ১৯৩১ সালে আদমশুমারিতে মন্তব্য করা হয় যে জমি ক্রমেই অকৃষকের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত জমির বিক্রয় কোবালা দলিল হয় ৩৮৩৮৭৩৫ টি ও বন্ধকী দলিল হয় ৩৭৪৪৫০৩টি। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বিক্রির দলিল ছিল কম (১১১৫৭৩১), বন্ধকী দলিল ছিল বেশি (২৬০১৪৫৬)। কিন্তু তার পর হতে বন্ধকী দলিল কমে যায় কিন্তু বিক্রির দলিল বেড়ে যায়। কারণ ইতিমধ্যে জমিদার এবং বলা-বাহুল্য কংগ্রেসের বিরোধীতা সত্ত্বেও ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টির মন্ত্রিসভা কৃষিঋণ সম্পর্কে আইন পাশ করায়, তার বিধান ছিল ঋণের সুদ আসলের বেশি হতে পারবে না, সুদের হার চক্রবৃদ্ধি হবে না, এবং ঋণ অনেক বছরের কিস্তিতে শোধ করা যাবে। এর ফলে তখনকার ঋণগ্রস্ত কৃষকরা খুবই উপকৃত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালের ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে মহাজনরা বন্ধকী দলিলের বদলে বিক্রি দলিল করার উপরই জোর দিতে থাকে। যুদ্ধের সময়ে বর্গাদার, গরিব মাঝারী চাষী, খেতমজুরদের দুর্দশা চরমে ওঠে। কম দরে ফসল বিক্রি করার পর মজুতদারীতে তার দাম দশগুণ বেড়ে যায়। এদেরই মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ আকালে মারা যায়। ১৯৪৩-৪৪ সালে মাত্র ১ বছরেই বাংলার ১৫ লক্ষ ৯০ হাজার কৃষক তাদের জমি বন্ধক দিতে বা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়।

৭

অর্থশাস্ত্র অনুসারে ভাগচাষ প্রথাকে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের অন্তর্বর্তীকালীন প্রথা বলা হয়, কিন্তু বাংলার ভাগচাষীরা ছিল কার্যত ভূমিদাস বা গোলাম। অর্ধেক ফসল গোলায় তুলে দেওয়া ছাড়াও 'খামার চাঁচানী', 'দারোয়ানী', 'কাকতাড়ানী' ইত্যাদি নামে নানারকম আদায় হত। জীবনভরই ঋণে জড়িয়ে থাকত ভাগচাষীরা। ধান ওঠার পর নিজের অংশ সব দিয়েও অনেক সময় পুরনো ঋণ শোধ হত না, নূতন ঋণ করতে হত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একমন ধান বাড়ী বা ধার করলে দেড়মণ শোধ করতে হত। ১৯৪৩ সালের পর মজুতদারী চালু হওয়ায় ধানের দরে ওঠানামা বেড়ে যায় এবং ধান ধারের নূতন প্রথা চালু হয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ধানের বাজার যখন দ্বিগুণ তখন সেই দামে ধান নিয়ে পৌষ-মাঘ মাসে ধানের দর অর্ধেক কমে গেলে দ্বিগুণ পরিমাণ ধান দিয়ে শোধ করতে হত। উচ্ছেদের ভয়ে ভীত ভাগচাষীদের দিয়ে নানারকম বেগার খাটানো হত। দূর স্টেশনে শহর থেকে আসা ছেলেকে আনার জন্য বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাবার জন্য গরুর গাড়ি নিয়ে যাওয়া বা কুটুম এলে পুকুরে মাছ ধরাই হোক—ভাগচাষী ছিল বাঁধা গোলাম। দেনা শোধের কোনও আশা যখন থাকত না, তখন অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রাতের অন্ধকারে গ্রামের ভিটা ছেড়ে দূরস্থানে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও বিরল ছিল না।

৮

১৯৩৩ সালেই ডঃ রাধাকমল মুখার্জি তাঁর 'ভারতের ভূমি সমস্যা' গ্রন্থে বলেছিলেন "ছোট চাষীদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে, জমিদার ও উৎখাত হওয়া কৃষকদের মধ্যে বৈপরীত্য বাড়ছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষকদের শ্রেণীচেতনার মৃদু স্পন্দন বর্তমান কৃষিব্যবস্থার মোকাবিলার সামনে দাঁড়াচ্ছে।" এই পটভূমিতে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের উদ্যোগে কৃষকসভা প্রতিষ্ঠিত হলেও তা ছিল খুবই দুর্বল। পেশোয়ার-কানপুর-মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আঘাত কাটিয়ে এ কাজ করতে হচ্ছিল। জমিদারী ব্যবস্থার কুফল এবং তা উচ্ছেদ করে কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার দাবি শুরু থেকেই প্রচারের মধ্যে থাকলেও সংঘশক্তির সাহায্যে তাকে কার্যকরী করার মতো পরিস্থিতি তখন ছিল না। রাষ্ট্রশক্তির আঘাতকে মোকাবিলা করার

মতো শক্তি না থাকলে প্রচলিত সম্পত্তি-সম্পর্কের উপর আঘাত করা যায় না। মূল দাবিকে প্রচারে রেখে ছোটখাটো আংশিক দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষকসভার প্রভাব বাড়তে থাকে। বাংলার অনেক বিপ্লবী আন্দামানে বন্দী ছিলেন এবং জেলখানাতেই মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের চেতনায় দীক্ষিত হয়ে ওঠেন। ১৯৩৭ সাল নাগাদ তাঁদের একাংশ মুক্তি পান, যাঁদের অনেকে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন, ফলে কৃষক আন্দোলনের কর্মী বাড়ে। হাটগুলিও ছিল জমিদারদের দখলে। হাটে চাষীদের কাছে তোলা (এক ধরনের কর) আদায়ের নামে জুলুম চলত, গরু-ছাগল কেনাবেচায় চড়া হারে লেখাই খরচ আদায় হত। ১৯৩৯ সাল নাগাদ হাটে হাটে তোলা আদায় ও লেখাই খরচের জুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয়। জমিদারদের নিজস্ব বাহিনীর দাপট ও প্রশাসনের হুমকি উপেক্ষা করে এ আন্দোলন বিশেষভাবে উত্তরের জেলাগুলিতে ব্যাপকতা লাভ করে। কোনও কোনও জায়গায় কৃষকসভার উদ্যোগে নূতন হাটের প্রবর্তন হয়। বারীধানের সুদ কমানোর আন্দোলনও এই সময়ে কোনও কোনও জায়গায় শুরু হয়। এই আন্দোলনে কৃষকসভার প্রভাব বাড়ে, সংগঠনও কিছুটা বিস্তৃত হয়। ইতিমধ্যে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার নিযুক্ত ভূমিরাজস্ব কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ হয়। তাতে বর্গাদারদের প্রজা বলে স্বীকার করার ও খাজনা ফসলের ১/৩ অংশ ধার্য করার সুপারিশ থাকে। এই সুপারিশের ভিত্তিতেই ১৯৪০ সালে কৃষকসভার পাঁজিয়া (যশোর জেলা) সম্মেলনে তে-ভাগার দাবিতে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু কোনও কার্যকরী আন্দোলন গড়ে ওঠে না।

৯

১৯৩৪ সাল থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। কমিউনিস্ট নেতারা কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই ও নানা মঞ্চ ব্যবহার করে কাজ করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ শুরু হতেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করার অপরাধে কমিউনিস্টদের উপর প্রথমে এলাকা হতে বহিষ্কারের আদেশ জারী করা এবং পরে তাদের গ্রেপ্তার করা হতে থাকে। তারপর এল আকালের তাণ্ডব। যুদ্ধের পর দেশ বিদেশের পরিস্থিতি উত্তাল। ফ্যাসিবাদ পরাজিত হয়েছে, ফ্যাসিবাদী আক্রমণকে চূর্ণ করে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজয় মুকুট নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, জাপানি আক্রমণকে পর্যদুস্ত করে চীনের লাল ফৌজ চূড়ান্ত মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছে, ভিয়েতনামে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে, দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি আন্দোলনে জোয়ার এসেছে। ভারতেও তার প্রভাব পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উন্মাদনা তুঙ্গে। আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তির দাবিতে রশিদ আলী দিবসে কোলকাতা অস্থির ও রক্তাক্ত, করাচী ও বোম্বাই-এ খোদ ব্রিটিশ ফৌজের অংশ নৌবাহিনীতে রক্তাক্ত বিদ্রোহ ও বিদ্রোহের সমর্থনে শ্রমিকদের সমাবেশ, বিহারে, পুলিশ বাহিনীতে বিদ্রোহ, কলে-কারখানায় ধর্মঘট, ডাক ও তার কর্মীদের ধর্মঘট—ব্রিটিশের আসন্ন বিদায়ের পূর্বাভাস। কিন্তু এই দুর্বার তরঙ্গের আদর্শ ও শ্রেণীচেতনাগত ভিত্তি ছিল দুর্বল। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত অতি সহজেই এই গণতরঙ্গকে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম হল। শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণীচেতনার জাগরণে অনিচ্ছুক, যেমন করে হক আপসে শাসক শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব বুর্জোয়া নেতৃত্ব এ ভাতৃঘাতী রক্তপাত ঠেকাতে ব্যর্থ হল। গণ-আন্দোলন হল বিপর্যস্ত। এই পটভূমিতে কমিউনিস্ট পার্টি অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও সামন্ততন্ত্রবিরোধী কৃষক সংগ্রামকে আগিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে মহারাষ্ট্রের ওয়ারলিতে আদিবাসীদের বিদ্রোহ, কেরালার পুন্নাপ্রা ভায়লার কৃষক বিদ্রোহ, অন্ধ্রের তেলেঙ্গানায় কৃষক বিদ্রোহ ও বাংলার তেভাগার লড়াই—সবই সমসাময়িক।

১০

কৃষক সংগ্রাম গড়ে তোলার এই সিদ্ধান্তের সূত্র ধরেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তেভাগার সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। প্রাদেশিক কৃষকসভার পক্ষ হতে একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। তাতে বাংলার কৃষিব্যবস্থা, ভাগচাষীদের সমস্যা ও দুর্দশা, ভাগচাষীদের তেভাগার দাবির যৌক্তিকতা, সমাজের অগ্রগতি ও বৃহত্তর স্বার্থে ভাগচাষীদের দাবির সমর্থনে কেন মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য অংশের মানুষের এগিয়ে আসা দরকার—সে সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া ছিল। এই প্রচার পুস্তিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভাগচাষীর সমর্থনে জনমত-গড়ে তোলার চেষ্টা করা। আন্দোলনের প্রসারের পর তেভাগা আন্দোলন কেমনভাবে পরিচালিত করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রকাশ করা হয়। তাতে দাবির চরিত্র কী হবে, আন্দোলন কিভাবে রক্ষা করতে হবে, শত্রু কৌশল কী এবং তাকে কিভাবে পরাস্ত করতে হবে, মধ্যবিত্তদের কাছে কী বক্তব্য হবে, কেমন করে সমিতিবদ্ধ করতে হবে, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের কাজ কী হবে, সংগঠনের কাঠামো কী হবে, সে সম্পর্কে নির্দেশাবলী দেওয়া ছিল। 'জান দিব তবু ধান দিব না', 'তাড়াতাড়ি ধান কাটো, নিজ খামারে ধান তোলো', 'তেভাগার কমে আপোষ নাই', 'সমিতির বাইরে কৃষক নাই', 'বাড়ি বাড়ি ভলান্টিয়ার চাই' ইত্যাদি আওয়াজগুলি এই নির্দেশনামা থেকেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলাগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভার ভাল সংগঠন ছিল। আন্দোলন প্রথম শুরু হয় এই এলাকাতেই। পরে তা মালদা, যশোর, খুলনা, বগুড়া, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালি, পাবনা ইত্যাদি অন্তবিস্তর ১৯টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণের মেদিনীপুর ও ২৪-পরগনা জেলার অংশ-বিশেষেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। খুব অল্প এলাকা হলেও নদিয়া, হুগলি, হাওড়া, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলাতেও এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আগে ধান তোলা হত জোতদারের খামারে, কিন্তু জোতদারের খামারে ধান তুলে তেভাগা অর্থাৎ তিনভাগের দুভাগ ফসল আদায় করা অবাস্তব। সেইজন্য নিজ খামারে বা বর্গাদারদের এক্তিয়ারভুক্ত খামারে ধান তোলার আওয়াজ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আন্দোলন শুরু হবার আগেই প্রথম দিকে যারা জোতদারের খামারে ধান রেখে এসেছিল তারাও সে ধান আবার নিজেদের খামারে নিয়ে চলে আসে। সভা, সমাবেশ, মিছিলে ভাগচাষীরা মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনে খেতমজুরদের কোনও প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল না, কিন্তু আন্দোলনে ভাগচাষী ও খেতমজুরের মধ্যে পার্থক্য ছিল না।

সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ব থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা খেতমজুর ও বর্গাদারের মধ্যে সীমারেখা মুছে দিয়েছিল। এই আন্দোলনের প্রথম শহিদ দিনাজপুরের চিরির বন্দরের সমিরুদ্দিন ও শিবরাম মাঝির একজন ছিল ভাগচাষী, অন্যজন খেতমজুর।

আন্দোলন করতে হলে অর্থ চাই, লোকবল চাই, সাহস চাই। সেইজন্য আন্দোলনের মধ্য থেকে আওয়াজ ওঠে—এক টাকা, এক লোক ও একটা লাঠি। আধুনিক অস্ত্রের কাছে লাঠি কিছু নয়, কিন্তু লাঠি ছিল সাহসের প্রতীক। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে তেভাগা আন্দোলন হয়ে উঠেছিল ঐক্যের প্রতীক। আন্দোলনকে ভাঙার জন্য হিন্দু ও মুসলমান জমিদাররা প্রচুর অর্থব্যয় করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বান ডাকাবার চেষ্টা করে, সেই উদ্দেশ্যে খুন খারাপিও সংগঠিত করে। কিন্তু আন্দোলনের জোয়ারে জাতপাত, ধর্মের সীমারেখা মুছে যায়, আদিবাসী, রাজবংশী, মুসলমান সব একাকার হয়ে যায়। জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রাম গান্ধীজি কখনও সমর্থন করেননি, কিন্তু দাঙ্গা প্রতিরোধে বেদনার্ত হৃদয়ে যখন নোয়াখালি সফর করছেন তখন দাঙ্গা প্রতিরোধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তেভাগা আন্দোলনের গৌরবময় ভূমিকাকে তিনি সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেননি।

এই সংগ্রামে গরিব মহিলাদের ভূমিকা ছিল বিস্ময়কর। জমায়েত করা, মিছিল করা, ধানকাটা, খবরাখবর দেওয়া, পুলিশ বা জোতদারদের গুণ্ডা এলে সতর্ক করা, নেতৃত্বকে নিরাপদে রাখা—সব কাজে মহিলারা পুরুষের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে এসেছিল। আন্দোলনের নেতৃত্বের ভাষায় পরিবার ও সমাজের ভিতরে নারীদের হীনম্মন্যতার সম্পর্কও দূরে সরে গিয়েছিল।

পুলিশ ক্যাম্প, জোতদারদের গুণ্ডা বাহিনীর চোরাগোপ্তা আক্রমণ, হত্যা সত্ত্বেও আন্দোলন এত বিস্তৃত ও বেগবান হয় যে মুসলীম লীগ সরকার ১৯৪৭ সালে ২২ শে জানুয়ারি বর্গাদারদের স্বার্থে 'বঙ্গীয় বর্গাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল' কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করে; এই বিল বর্গাদার আন্দোলনে যেমন উৎসাহের সঞ্চার করে, তেমনই আন্দোলন সম্পর্কে একটা সহজ মনোভাবও গড়ে ওঠে। জমিদাররা প্রবল বিরোধিতা করে এবং শেষ পর্যন্ত লীগ, কংগ্রেস-উভয়ের চাপে এই বিল আইনে পরিণত করা তো দূরের কথা দমননীতিকে তীব্র করা হয়। হাজার হাজার গ্রেপ্তার ও গুলি চালনার ঘটনা ঘটতে থাকে। সবচেয়ে মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটল ১৯৪৭, ২০শে ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরের খাঁপুর গ্রামে। একদিনে ১৩১ রাউণ্ড গুলি চালিয়ে ২২ জনকে হত্যা করা হয়। এই হত্যালীলা ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং শেষপর্যন্ত ৮৬ জন শহিদ হবার পর প্রথম পর্যায়ের এ আন্দোলন স্তব্ধ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে স্বাধীনতার পর পঃ বাংলায় ১৯৪৮-৫০ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ের যে তেভাগা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং সরকারকে ভাগচাষ আইন পাশ করতে বাধ্য করেছিল, তা ছিল প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনেরই ক্রম যদিও তা পরিচালিত হয় শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী ক্ষমতা দখলের ভ্রান্ত লক্ষ্য দ্বারা।

১১

পণ্ডিতজনেরা তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে নানা বিশ্লেষণ করেছেন ও করছেন। কিন্তু তেভাগার লড়াইকে বিচার করতে হবে সেই সমকালের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে। আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বিচার করতে গিয়ে এমন মূল্যায়নও করা হয় যে নেতৃত্ব আন্তরিক হলে ও ইচ্ছা করলে এ আন্দোলন রাষ্ট্রশক্তিকে পরাস্ত করে জাতীয় মুক্তিআন্দোলনে পরিণত হতে পারত। এক হাস্যকর ও নেতৃত্বের প্রতি বিদ্বেষপরায়ন সিদ্ধান্ত! মুক্তি আন্দোলনের সর্ত শ্রেণী সচেতন শ্রমিকশ্রেণীকে কেন্দ্র করে কৃষক ও অন্যান্য জনগণের ব্যাপক সমাবেশ। শ্রমিক শ্রেণীর চেতনা এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব তখন তার ধারেকাছেও ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি ছিল খুবই দুর্বল, ১৯৪৬ এর নির্বাচনে মাত্র ৩টি আসন পায়। আপসে স্বাধীনতার সুফলের সুখস্বপ্নে জনগণের বড় অংশ আচ্ছন্ন। তেলেঙ্গানায় নিজামশাহী ও জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকদের সশস্ত্র প্রতিরোধকেও প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল। তেভাগা আন্দোলনের লক্ষ্যও ছিল সীমিত, সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ নয়, কিছুটা সংস্কার মাত্র। স্বাধীনতার প্রাক্কালে এরকম একটা নমনীয় দাবির ক্ষেত্রে জমিদাররা ক্ষিপ্ত হলেও লীগমন্ত্রিসভা হয়ত রাষ্ট্রশক্তিকে নির্মমভাবে প্রয়োগ করবে না, এমন ভ্রান্তি থাকা অবাস্তব ছিল না। আন্তরিকতা ও আত্মত্যাগ সত্ত্বেও এ আন্দোলনের আশু সাফল্যের কোনও বাস্তবতা ছিল না।

আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, কোনও পরিকল্পনা ছিল না—এমন কোনও ধারণাও যে ভ্রান্ত, তা কৃষকসভার তদানীন্তন দলিলে সুস্পষ্ট। তবে এটা বাস্তব যে, শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণীসংগ্রাম জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের চালিকাশক্তি হিসাবে বিকশিত না হলে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সফল পরিণতিতে পৌঁছায় না এ উপলব্ধির ঘাটতি ছিল। শ্রমিক শ্রেণীর তুলনায় বুর্জোয়ারা ছিল অনেক সংগঠিত এবং শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়া প্রভাবের গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারেনি। এখানেই ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুর্বলতার উৎস। কিন্তু এ দুর্বলতা সত্ত্বেও এটাও সত্য যে সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করা ও তাদের চেতনা বৃদ্ধির কাজে তখনকার কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা ছাড়া অন্য কোনও শক্তি আগিয়ে আসেনি।

তাৎক্ষণিক ফলের বিচারে তেভাগা আদায় করা যায়নি, কিন্তু কৃষক আন্দোলনের বহত্তর বিচারে এ আন্দোলন বিফলে যায়নি। পরবর্তীকালে পশ্চিমবাংলায় কৃষক আন্দোলনের এবং বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশে তেভাগা আন্দোলনের দান অস্বীকার করার পথ নাই। তেভাগা আদায় হয়নি, কিন্তু কৃষকদের আর পুরনো গোলামীর জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়নি এবং জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে দরিদ্র কৃষকরা অনেক শিক্ষিত হয়েছিল এবং সে শিক্ষা আন্দোলনের এলাকার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৫২ সালে পঃ বাংলায় প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্টদের আসন সংখ্যা যে এক লাফে উনত্রিশে উঠে গিয়েছিল—এটা কোনও আকস্মিক ঘটনা বা ম্যাজিক ছিল না। এটা ছিল শ্রেণী চেতনা বিকাশেরই প্রতিফলন। বাংলা বিভাগের ভিতর দিয়ে দেশ স্বাধীন হল। সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে হাজারে হাজারে উদ্বাস্তুর স্রোত আসতে লাগল। বাংলায় হিন্দুমহাসভার প্রভাব কম ছিল না। তা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতার কারণে উদ্বাস্তু হওয়া এই দরিদ্র

মানুষেরা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে পড়েন নি, তেভাগা আন্দোলনের শিক্ষায় তাঁদের আস্থাভাজন বামপন্থী নেতৃত্ব ও আন্দোলনকেই পুষ্ট করেছিলেন। প্রতারণামূলকভাবে হলেও, ভূমি সমস্যা যে শাসকশ্রেণীর কর্মসূচিতে স্থান করে নিতে পেরেছিল ও আইনকানুনের কিছু পরিবর্তন হয়েছিল, তার পিছনে ছিল তেভাগা সহ স্বাধীনতাপূর্ব কৃষক আন্দোলনগুলির দান। পশ্চিমবাংলার কৃষক আন্দোলন তেভাগা আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে নূতন নূতন আন্দোলন দ্বারা আরও পুষ্ট করেছে। ১৯৬৭-৭০ এর জমির আন্দোলন, আজকের বামফ্রন্ট সরকারের অবস্থান নূতন নূতন আন্দোলনে পুষ্ট সেই বহতা ধারারই ফসল।

পুরানো অবস্থা এখন নাই। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক অনেক শিথিল হয়েছে, যদিও বিলুপ্ত হয়নি। পুঁজিবাদী সম্পর্ক অনেক প্রসারিত। শ্রেণীবিন্যাসে বদল ঘটেছে। নূতন দ্বন্দ্ব বিকশিত হচ্ছে। ভূমিসংস্কার না করে, কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার কাজ না করে, পুঁজিবাদী বিকাশ আজ সংকটের মুখে। ব্যাপক মানুষের দারিদ্র্যজনিত বাজারের অভাবে শিল্প সংকট। দেশ ঋণভারে জর্জরিত। অভ্যন্তরীন বাজার ও সমগ্র দেশের অর্থনীতির উপর নয়া উপনিবেশবাদীদের আধিপত্য চেপে বসছে।—কৃষি উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণের উপর বহুজাতিক করপোরেশনগুলির আধিপত্য। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির চাহিদামত আমাদের কৃষি উৎপাদনের বিন্যাসে বদল ঘটানো হচ্ছে। বেকার সমস্যা তীব্র, জীবিকা অনিশ্চিত, কৃষি ভারাক্রান্ত। অতীত থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে আজকের পরিস্থিতি অনুযায়ী কৃষকদের সচেতন করা, সংগঠিত করার দায় বর্তমান প্রজন্মের।

শিল্পী : চিত্তপ্রসাদ

তেভাগার লড়াই

হেমন্ত ঘোষাল

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কৃষকসভার কাউন্সিল থেকে তেভাগার দাবীতে জেলায় জেলায় আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৫ সালে কৃষকসভা জোতদার ও চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল। কৃষকসভার আহ্বানে এবার জেলায় জেলায় স্বেচ্ছাসেবক ট্রেনিং এবং প্রচার আন্দোলনের কাজ শুরু হল। আর কাজে নামার সঙ্গে সঙ্গেই তেভাগার দাবী সারা বাংলাদেশের কৃষকের মনে বিদ্রোহের জোয়ার নিয়ে এল।

মনে রাখতে হবে, তিনভাগের একভাগ জমির মালিক পাবে এ দাবী শুধুমাত্র চাষীর ফসলের ভাগ পাওয়ার দাবী ছিল না, এ ছিল জমির উপর চাষীর স্বত্ব কায়েম করার লড়াই। এ যাবৎকাল চাষী জমিতে ফসল ফলিয়েছে, সেই গায়ের রক্তজলকরা ফসল কেটে জমিদারের খামারে তুলে দিয়েছে, তারপর মিথ্যে দেনা আর খাজনার দায়ে সেই ফসল জমিদার-মহাজনের গোলায় রেখে ঘরে ফিরেছে আর সারা বছর পরিবারশুদ্ধ প্রস্তুত থেকেছে জমিদার-মহাজনের বেগার খাটার উদ্দেশ্যে। এই প্রথম তেভাগা আওয়াজ তুলেছে, "লাঙ্গল যার জমি তার।" আওয়াজ তুলেছে, "আধি নয় তেভাগা চাই", অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বলেছে, "নিজ খোলানে ধান তোলো, দখল রেখে ভাগ করো।" তেভাগা তাই শুধু ভাগ আদায়ের লড়াই নয়, কৃষকের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। তেভাগার লড়াইতেই ভাগচাষী প্রথম জমিদারদের ভাগ জমিদারদের দিয়ে মাঠ থেকে নিজের প্রাপ্য ধান নিজের খামারে তুলেছে। তাই স্রষ্টা চাষীর সবল দু'হাত এই আন্দোলনের রক্তপতাকাকে বুকে আঁকড়ে ধরেছে, রক্তের বিনিময়েও রক্ষা করেছে তার সম্মান।

উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে ও ময়মনসিংহে প্রথমে 'তেভাগার দাবী'—লড়াই হিসেবে দেখা দিল। কারণ বিশ্লেষণ করলে হয়তো দেখা যাবে, আমরা যেসব রাজনৈতিক বন্দীরা ওই ময়মনসিংহ ও দিনাজপুরে ডেটিনিউ হিসেবে ছিলাম, তাদের প্রভাবও এক্ষেত্রে কাজ করেছিল। বলা বাহুল্য, এসব জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবও ছিল শক্তিশালী।

ছেচল্লিশের ফসল কাটার মরশুম আসার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল তেভাগাকে কার্যকর করার লড়াই। জমিদারদের লেঠেলবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে 'জান দেবো, তবু ধান দেবো না'—এই আওয়াজ উঠল বাংলার খেতখামারে। সরাসরি ধানকাটা থেকেই শুরু হল দু'ভাগ চাষীকে দিয়ে একভাগ জমির মালিককে পৌছে দেওয়ার লড়াই।

উত্তরবঙ্গেই প্রথম এই আন্দোলন শুরু হয়। দিনাজপুর ও ময়মনসিংহে জোতদার ও লেঠেলদের শক্তিকে প্রতিহত করে কৃষকসভা তেভাগার দাবী-আদায়ে সমর্থ হয়। প্রথম পর্যায়ের এই আন্দোলনে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল, জোতদারদের সমস্তরকম সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত উপেক্ষা করে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মুসলীম লিগের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'—ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় ১৯শে আগস্ট পর্যন্ত এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সে সময় সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ছিল। কৃষকসভা এই সংকটজনক মুহূর্তে দাঁড়িয়েই তেভাগার লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে, অর্থনীতিতে সমাজজীবনে সংকট যতই তীব্র হচ্ছিল, বিদেশি শাসক আর দেশীয় সামন্তপ্রভুরা ততই বিক্ষোভের মোড় সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঘোরাতে চেষ্টা করছিল। অন্যদিকে, কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সহযোগী গণসংগঠনগুলি সঠিকভাবেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের চেহারাটিকে চিহ্নিত করেছিল এবং শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন গড়ে তোলার সার্বিক প্রয়াস চালাচ্ছিল। তারা উপলব্ধি করেছিল, সঠিক সময়োপযোগী স্লোগানের ভিত্তিতে গড়ে তোলা শ্রেণীসংগ্রামই সাম্প্রদায়িকতার আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে।

আগেই উল্লেখ করেছি, ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরে কৃষক-কাউন্সিল থেকে সিদ্ধান্ত হওয়ার পর থেকেই জেলায় জেলায় প্রচার আর সংগঠিত ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমরা এটা স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করেছিলাম, সংগঠিত জঙ্গী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী ছাড়া জমিদারদের লাঠিয়ালদের মোকাবিলা করে আন্দোলন পরিচালনা করা অসম্ভব ব্যাপার।

প্রাথমিকভাবে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর আর রংপুরে এই কাজ শুরু হল। প্রথমদিকে, কিছু ভাগচাষীদের মধ্যে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু কিষাণসভার সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবীবাহিনী লালঝাণ্ডা নিয়ে হাটসভা, মিছিল সংগঠিত করল, প্রয়োজনে দলবেঁধে ধানকাটায় অংশগ্রহণ করল। জমিতে ঝাণ্ডা, নিয়ে দলবেঁধে এই ধানকাটা ক্রমশ উৎসবের চরিত্র অর্জন করল। প্রতিদিন দলে দলে কৃষক কৃষকসভার স্বেচ্ছাসেবীদলে নাম লেখাতে শুরু করল।

জোতদাররা প্রাথমিকভাবে কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়েছিল, পরে তারা কোথাও লেঠেলবাহিনীকে, কোথাও পুলিশ প্রশাসনের মিথ্যা মামলার ওয়ারেন্টকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করল। কিন্তু হাজার হাজার কৃষকের সামনে এসমস্ত অস্ত্রই নেহাত অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ল। এমনকি, কৃষকসভার নেতৃত্বে 'নারী-বাহিনী' কোথাও কোথাও পুলিশকে খেদিয়ে দিল, কোথাও কোথাও পুরুষদের অনুপস্থিতিতে মেয়েরাই ফসল কেটে ঘরে তুলল।

ক্রমশ এই আন্দোলন বাংলাদেশের সমস্ত প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। অবিভক্ত চব্বিশ-পরগনার কাকদ্বীপ, মথুরাপুর, সাগরে প্রথম কৃষকসভার নেতৃত্বে তেভাগা আদায়ের লড়াই শুরু হল। জলা-জঙ্গলে ঘেরা এই দ্বীপগুলিতে যোগাযোগ বজায় রাখাই ছিল কঠিন। কিন্তু প্রাথমিক হতচকিত ভাব কাটিয়ে পুলিশ-মিলিটারি এবার সরাসরি কৃষকদের বিরুদ্ধে লড়াইতে নেমে পড়েছিল। উত্তর ময়মনসিংহে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্-এর বিরুদ্ধে বীরত্বব্যঞ্জক সংগ্রাম পরিচালনা করে শহিদ হয়েছিলেন হাজং-রমণী রাসমণি। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স থেকে আরম্ভ করে বহু-এলাকায় প্রকৃতপক্ষে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পুলিশ-মিলিটারির প্রবেশাধিকার ছিল না সেসব এলাকায়। কিন্তু কাকদ্বীপের ক্ষেত্রে বিষয়টা ছিল একেবারেই আলাদা। লড়াই শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত সেখানে কৃষকসভার সদস্য ছিল দু'-তিনশো। কিন্তু লড়াই শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এইসব গ্রামের চেহারা পালটে গেল। স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী ফসল কাটতে শুরু করল এবং পুলিশ-মিলিটারির সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ফসলের ওপর তাদের অধিকার কায়েম রাখল। চন্দনপিঁড়িতে জান দিয়েও ধান রাখলেন গর্ভবতী অহল্যা, বাতাসী, কৃষকসভার নেতা সুরেনসহ সাতজন শহিদ।

আমরা যারা জেলায় কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করছিলাম, তারা সিদ্ধান্ত করলাম—সেকেন্ড ফ্রন্ট খুলতে হবে। পুলিশ-মিলিটারিকে কয়েকটা বিন্দুতে সীমাবদ্ধ হতে দেওয়া যাবে না, ছোট ছোট লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ব্যস্ত, বিব্রত, পর্যুদস্ত করে তুলতে হবে। পুলিশ ইতিমধ্যেই আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শাণিত করেছে। ধরপাকড় চলছে সর্বত্র। তাই আত্মগোপনে থেকে মঠের দিঘিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করলাম। ঘাঁটি গড়ে উঠল মঠের দিঘি, দিঘির পাড়, লাউখালি, পাথরঘাটা, রাজবাড়ী, বয়েরমারি, বেড়মজুর, জেলেখালি, কানমারি, বিশপুর-বায়লানি, হাটগাছি, সরবেরিয়া, শাকদা, উচিলদা, বামুনিয়াতে।

ইতিমধ্যেই মাঠ থেকে ধান উঠে গেছে জমিদার-জোতদারের খামারে, গাদা করা আছে। মাঠে ব্যাপারটা যতটা কঠিন ছিল, জমিদার-জোতদারের নিজের আওতায় দাঁড়িয়ে সে ভাগ আদায় ছিল তার চেয়ে আরও অনেক কঠিন ব্যাপার। তাই লড়াইয়ের কায়দা পালটাতে হল। প্রথমেই সমস্ত খামারে ধান ঝাড়া বন্ধ করে দেওয়ার স্লোগান দেওয়া হল। ফলে খামার থেকে ফসল তুলে গোলাজাত করার ক্ষমতা আর জোতদারের রইল না।

এবার গ্রামে গ্রামে প্রচারাভিযান সংগঠিত হল, বলা হল, তেভাগার লড়াইতে নামতে গেলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে—পরিবারপিছু একজন যুবক, একটি টাকা ও একটি লাঠি দিতে হবে। অদ্ভুত সাড়া পাওয়া গেল—২০ দিনের মধ্যে ১২০০ জওয়ান ছেলে, ১২০০ টাকা ও ১২০০ লাঠি সংগৃহীত হল। আর আমাদের সামনে অনমনীয় দৃঢ়তা

নিয়ে এগিয়ে এল গ্রামের মেয়েরা। পরিবারের শক্ত, সমর্থ পুরুষটিকে লড়াইয়ের ময়দানে পাঠিয়েই তারা ক্ষান্ত হল না, ঘাঁটি আগলানোর জন্য ২০ দিনের মধ্যেই ১৫০০ জনের সংগঠিত নারী প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তুলল। পুলিশ-মিলিটারির আক্রমণের মুখে তারা গ্রামে গ্রামে সংগঠিত প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলল।

তেভাগা আদায়ের লড়াইকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় কমিটি সংগঠিত হল—সেনাপতি হেমন্ত ঘোষাল, সেনাধ্যক্ষবাহিনীতে ছিলেন হরিধন চক্রবর্তী (সোনারপুর), বরুণ পাত্র (মঠের দিঘি), ফৌজদেল মোল্লা, আলতাফ মোল্লা, রামকমল মণ্ডল, প্রবীর মণ্ডল (রাজবাড়ী), গুণধর জাগুলিয়া, শরৎ সর্দার, শিরীষ মণ্ডল (উচিলদা), যতীন পাত্র, রাম ভুঁইএঞা (পাঠানখালি), ললিত সিং, মধু মাহাতো সহ বিভিন্ন গ্রামের বলিষ্ঠ সেনানীরা, এছাড়াও ছিলেন নারীবাহিনীর নেত্রীরা।

সবাই মিলে বসে সিদ্ধান্তে নেওয়া হল তেভাগা আদায়ের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ বাড়ি ফিরব না। যা জুটবে সবাই মিলে ভাগ করে খাব। এ লড়াই আমাদের ন্যায় ও সত্যের লড়াই, খামারে গাদা ভেঙে দুভাগ নিয়ে একভাগ জমির মালিকের জন্য রেখে আসব। এ ব্যাপারে কোনও জাল-জুয়াচুরি বা লুটপাট চলবে না। গ্রামে গ্রামে আমাদের সংগঠিত বাহিনী এই গাদাভাঙার কাজ করবে। আর এ ব্যাপারে কোনও অন্যায় হচ্ছে কিনা এ দেখার জন্য আটজনের তদন্তকারী দল থাকছে। তারা সমস্ত বিষয়টাতে কোনও অন্যায় হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখবে ও সেনাধ্যক্ষ পরিষদের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করবে। মাত্র দশদিনের মধ্যে বিরাট এলাকা জুড়ে একাজ শেষ হয়ে গেল, বিরাট এলাকা জুড়ে প্রায় চল্লিশহাজার কৃষক এই লড়াইতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করল।

যেটা সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো বিষয় সেটা হল কৃষকসমিতির নেতৃত্বে এই আন্দোলন সমগ্র কৃষকসমাজের মধ্যেই নিজের অধিকার বুঝে নেওয়ার তীব্র আশা-আকাঙ্ক্ষা তৈরি করল। যে অবর্ণনীয় অনাচার-অত্যাচারের মধ্যে তারা দিনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছিল, যা ছিল তার পক্ষে অসহনীয় কিন্তু অনিবার্য, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার সামান্যতম ইঙ্গিতেই তারা মরিয়া হয়ে উঠল। আগেই উল্লেখ করেছি, যে সময়টায় আমরা এই আন্দোলন সংগঠিত করছিলাম। সে সময় কৃষকসভার কর্মীরা সমস্ত অঞ্চলে তাঁদের কথা পৌঁছে দিতে পারেননি। আমাদের ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু তেভাগার লড়াই শুরু হবে—এই সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে গ্রাম-গ্রামান্তর অতিক্রম করল। 'একটি টাকা, একটি লাঠি, একটি যুবক'—এই শ্লোগানকে কেন্দ্র করে শেষপর্যন্ত স্বেচ্ছাসেনাবাহিনী দশহাজারে গিয়ে পৌঁছল। বহুদূর-দূরের গ্রাম থেকে তারা নিজ উদ্যোগে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করল, কৃষকসভার নেতৃত্বে তেভাগার লড়াইতে সংগঠিতভাবেই অংশগ্রহণ করল।

আন্দোলনের এই ব্যাপ্তি ও বিস্তৃত আমাদের একদিকে যেমন বিস্মিত করল, তেমনই ন্যায়ের সপক্ষে এই আন্দোলনে বিজয় অর্জনের প্রতিজ্ঞায় আমাদের অবস্থান দৃঢ়তর হল।

মনে রাখা দরকার, তেভাগার এই আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ছিল জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকসমাজের তীব্রতম আঘাত। যে জমিতে চাষ করে, ফসলের উপর তারই অধিকার কায়েম হচ্ছে, এটা মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার-জোতদারের পক্ষে মেনে নেওয়া ছিল একান্ত অসম্ভব ব্যাপার। তাই তারা তাদের পক্ষের সরকারের নেতৃত্বে সমগ্র প্রশাসনকে এই কৃষক-আন্দোলন দমন করার কাজে নিযুক্ত করল। কারণ, তারা অনুভব করেছিল, এই আন্দোলন থেকে অনিবার্যভাবেই জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের শ্লোগান উঠে আসবে, বাস্তবে হলও তাই।

প্রথম থেকেই জমিদাররা তাদের কাছারি বাড়ির কর্মচারী-পাইক-লেঠেলদের কৃষকদের উপর যাবতীয় অত্যাচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। তাই আন্দোলনের বিরোধিতা করামাত্রই বহু এলাকায় জমিদাররা তাদের কর্মচারীসহ কাছারিবাড়ি থেকে বিতাড়িত হল। সমস্তরকম প্রশাসনিক প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও বহু এলাকায় পুলিশ প্রায় একবছর অবধি ঢুকতে পারেনি। পুলিশ ঢোকার চেষ্টা করামাত্রই শাঁখ কাঁসর-ঘণ্টার সংকেত এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে ছড়িয়ে পড়ত। আর হাজারে হাজারে মহিলা-পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী পথে নেমে এসে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করত পুলিশের বিরুদ্ধে।

পুলিশ শেষ পর্যন্ত নেতৃবৃন্দের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল। মিথ্যা অভিযোগে এক-একজনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা জারি করল। ফলে, আমাদেরও কোথাও কোথাও লড়াইয়ের কায়দা পালটাতে হল। নেতৃবৃন্দ অবস্থাবিশেষে আত্মগোপনে থেকে পুলিশের নজর এড়িয়ে আন্দোলন পরিচালনা করতে লাগলেন। কমরেড প্রভাস রায় মূলত এই আন্ডারগ্রাউন্ড অপারেশনের দায়িত্বে ছিলেন।

আমরাও এই গ্রেপ্তার এড়াতে প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী থানা ভাঙড়ের তাঁটদা, মৈশালে এলে আশ্রয় নিতাম। হাঁটাপথে এই যাতায়াতে প্রায় ৬ ঘণ্টা লাগত, সারাদিনবাদে শুধু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য এই পথহাঁটা কখনও কখনও আমাদের অসহনীয় মনে হত, শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে, চাইত, তবু আন্দোলন বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থেই একাজ আমাদের করতে হত। এ সময় এমনও হয়েছে, পর পর ৩/৪ দিন অনাহারে থাকতে হয়েছে, কখনও আবার হয়েছে ভূরিভোজ। চাষীঘরের মেয়ে-বৌরা তাঁদের ঘরে যা খাবার আছে তা খুব যত্নেই আমাদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছেন—হয়তো তাঁরা থেকেছেন উপবাসী। আবার এই মা-বোনেরাই আমাদের জন্য পাহারা দিয়েছেন সারারাত, ঘরের ছেলেদের অনুপস্থিতিতে পুলিশের মোকাবিলা করেছেন সাহসের সঙ্গে, অপূর্ব রণকুশলতায়। এই আন্দোলনের অংশীদার ছিল সকলেই। বৃহৎ জমির মালিক থেকে খেতমজুর সকলেই এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল, যদিও নেতৃত্বের রাশ ছিল ভূমিহীন খেতমজুরের হাতে। তেভাগার লড়াইতে অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার ভিত্তি নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এ লড়াই ছিল অত্যাচারিত, অবদমিত কৃষকের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। আমিও যে মানুষ, আমারও যে এ বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে—এ বিশ্বাস কৃষকসভাই প্রথম তার মনে সঞ্চার করেছিল। তেভাগার লড়াইতে এ বিশ্বাস বাস্তবে চেহারা পেল—কৃষকের কাছে তেভাগার প্রকৃত তাৎপর্য ছিল এখানেই।

একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শ্রীনাথ দাস ছিলেন সরবেড়ের বড় জোতদার—স্বভাবতই এ

আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধী। তেভাগার দাবী আদায় করতে গিয়ে তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হল। জমিদারের চাকর, পালকি বেহারা, রাঁধুনি—সকলেই এই বয়কটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করল। চাষীর ঘরের ছেলে, যে বৃত্তিতেই যাক না কেন, তার শ্রেণীস্বার্থকে অস্বীকার করবে কেমন করে?

বাধ্য হয়ে শ্রীনাথ দাস কয়েকদিন পর আত্মসমর্পণ করলেন। তিনি সমঝোতার প্রস্তাব পাঠালেন। কৃষকসভার পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি শর্ত আরোপ করল—পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনী আলোচনাস্থল থেকে ১০ মাইল দূরে থাকবে এবং আমাদের সেনাপতি ১০,০০০ কৃষকসেনানী নিয়ে আলোচনায় যাবে। শর্ত মঞ্জুর হল। আমরা দল বেঁধে চললাম শ্রীনাথ দাসের কাছারি বাড়িতে। সেখানে যথারীতি জমিদারের জন্য বসার চেয়ার আছে—বাকিদের দাঁড়িয়ে কথা বলাটাই সাধারণ নিয়ম। কেন্দ্রীয় কমিটি এই পরিস্থিতিতে আলোচনা চালাতে অস্বীকার করল। তাদের দাবী, জমিদার ও সেনাপতি সমান-সমান চেয়ারে বসবেন, বাকী প্রতিনিধিদলের জন্য বেঞ্চি আসবে—তবেই আলোচনা হবে, নতুবা নয়। তখন জমিদারের শিরে সংক্রান্তি। তাই বাধ্য হয়ে তারা মেনে নিল এ দাবী। সেনাপতির জন্য চেয়ার ও অন্যান্য নেতাদের জন্য বেঞ্চ এল। দশহাজার কৃষকফৌজ উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। যে জমিদারের সামনে দিয়ে জুতা পায়ে হেঁটে যাওয়ার অপরাধে তাদের বেত্রদণ্ড, জরিমানা সবাই দিতে হয়েছে, তারা এই সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে পেরে আত্মপ্রতিষ্ঠার আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। সমঝোতা হল না—আলোচনা শেষ করে আমরা ফিরে এলাম। দাবী আদায় না হওয়া সত্ত্বেও আমরা বিজয়গর্বেই ফিরে এলাম। তেভাগার লড়াই জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে কৃষককে প্রথম মাথা তুলে বাঁচতে শেখাল। তাই এই কৃষক সংগ্রামকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার নিরিখে বিচার করলে এর সঠিক ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না।

এর আগেই বলেছি, তেভাগা ছিল চাষী-মজুরের নিজের লড়াই। এতদিন ধরে তারা যা চেয়েছে, যা না-পাওয়ার ব্যথায় গুমরে কেঁদেছে, তেভাগার লড়াই সেই ব্যথা-বেদনা-প্রতিবাদকেই ভাষা দিল। তাই এই লড়াইতে আমরা যারা তাদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম, যারা বাইরে থেকে গিয়েছিলাম, গ্রামের সমস্ত পরিবার তাদের প্রাণের মানুষ বলে গ্রহণ করেছিল।

এমন কিছু ঘটনা এখানে উল্লেখ না করা অন্যায় হবে। মঠের দিঘিতে সেদিন আশ্রয় নিয়েছি। হঠাৎ খবর এল পুলিশ গ্রাম ঘিরে ফেলেছে। তার আগেই গ্রামের পাহারাদার পুরুষকর্মীদের গ্রাম পার করে দিয়েছি। কেবল আমি রয়ে গেছি এক বাড়িতে। একটু ভিতরের দিকের গ্রামের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা সকলেই জানেন, গ্রামের শৌচকার্যের জন্য মাঠটি থাকে গ্রামের এক প্রান্তে, পুলিশ সেখানেও পাহারায় ছিল। ভোরবেলা, মাসীমা সহজ সুযোগটি গ্রহণ করলেন। পুলিশ অফিসারকে গিয়ে যাচ্ছেতাই গালাগালি শুরু করলেন পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রামের একমাত্র শৌচকার্যের মাঠটি পুলিশ আটকে রাখার অভিযোগ তুলে। বিব্রত পুলিশ অফিসার ওখান থেকে পুলিশদের সরিয়ে নিলেন। লাল শাড়ী পরে বউ সেজে অন্য বউদের সঙ্গে রওনা হলাম মাঠের দিকে আর এরপর পাঁচ মাইল হেঁটে মঠের দিঘি থেকে চলে এলাম হাড়োয়া থানার বারগাঁতে।

ঐ মঠের দিঘিতেই আর একদিন রয়েছি নিরঞ্জন পাত্র-র মায়ের বাড়ীতে। দাওয়ার ওপর মা যত্ন করে বিছানা পেতে দিয়েছেন, মশারি টাঙিয়ে দিয়েছেন। খাওয়া-দাওয়াও জুটেছে ভালো—ফলে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছি অনেকক্ষণ। মাঝরাতে হঠাৎ অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল। মশারির উপর ভারী কি যেন নড়াচড়া করছে। হাতের পাশে ছোট টর্চটা ছিল। জ্বালিয়ে দেখি, মশারির চালে কুলোপানা চক্র নিয়ে ফোঁস ফোঁস করছেন বিশাল এক সর্পদেবতা। ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ হতে লাগল। সেই আওয়াজে অথবা টর্চের আলোয় আকর্ষিত হয়ে মা উঠে এসেছিলেন। সাপ তখন মশারির উপর দিয়ে ক্রমাগত ছোবল মারতে চেষ্টা করছে আমার মাথায়। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে কী হল তা আমার কিছুই মনে নেই। সম্বিৎ ফিরল লোকজনের আওয়াজে, দেখলাম উঠোনে সাপ মরে পড়ে আছে আর মা কাছে এসে সস্নেহে গায়ে হাত দিয়ে কুশল প্রশ্ন করছেন। ছোট্ট শিশুকে মা যেমন সস্নেহে সযত্নে সদাজাগ্রত দৃষ্টি মেলে সব বালাই থেকে বাঁচিয়ে বড় করে তোলেন তেমন করেই আন্দোলনের শিশুটিকে এই আন্দোলনের কর্মীদের বড় করে তুলেছেন এমনই মা-বোনেরা ঘরে ঘরে। গভীর কোনও রাজনৈতিক তত্ত্ব হয়ত তাঁদের পড়া হয়নি, অনেকেরই এমনকি অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত ছিল না, কিন্তু জীবনের কঠোর কঠিন অভিজ্ঞতায় নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থটি চিনে নিতে তাদের ভুল হয়নি। তাঁরা খুব সহজেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায় বুঝে নিয়েছিলেন তাদের বন্ধু কে এবং শত্রু কে আর অনায়াসে সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছিলেন তাঁদের ইতিহাস নির্দিষ্ট ভূমিকা। তেভাগা আন্দোলন পর্যালোচনায় আমরা যেন এই অবদানের কথা কখনও বিস্মৃত না হই।

মনে পড়ছে, মঠের দিঘিরই অন্য একটি ঘটনার কথা। লড়াই তখন চূড়ান্ত পর্যায়। হাজার হাজার কৃষক প্রতিদিন এসে যোগ দিচ্ছে আমাদের সঙ্গে। দু'-একজন বিশ্বাসঘাতক কি এখানে ঢুকে পড়ছে না? সম্ভবত এমনই কেউ পুলিশকে আমার রাতের আশ্রয়ের খবর পৌঁছে দিয়েছিল। দারোগা সাহেব বিরাট পুলিশবাহিনী নিয়ে অতর্কিতে সমস্ত বাড়ীটি ঘিরে ফেললেন। যে বাড়িতে ছিলাম—সে বাড়ীর গৃহিণী এগিয়ে এলেন। তার বিবাহিতা কন্যা কয়েকদিন হল বাপের বাড়ি এসেছেন—তার সঙ্গে আমাকে মশারির ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। বললেন, যেমন বলছি, তেমনটি কর। তুমি ধরা পড়লে আমাদের সর্বনাশ, তোমাকে বাঁচাতেই হবে। মেয়েকে বললেন, 'সেনাপতি, তোর বাপ, মাথায় জলপটি দে মাথা কোলে নিয়ে।' এরপর পুলিশকে দরজা খুলে দিলেন। পুলিশকে নিয়ে যখন ফিরে এলেন, তখন অন্য চেহারা। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "দেখো বাবা, জামাই দু'দিনের জন্য এসে কি বিপদ। দে মা, ভাল করে জলপটি দে।" দু'একজন পুলিশ বোধ হয় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, মাসীমা সহজেই বললেন, "যাচ্ছ যাও, তবে এ মায়ের দয়া, মা তোমাকে কৃপা করলে আমারে দোষ দিওনি।" মহামারী বসন্তের নাম শুনে আর পুলিশ দাঁড়ায় সেখানে, দু'চারটে ধমক-ধামক দিয়ে পগার পার। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই ঘটনার পিছনে যে কতখানি ঝুঁকি তা উপলব্ধি করা

যাবে না। যে মেয়েটি সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীল গ্রাম্য সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে একজন পরপুরুষের সঙ্গে মশারির নীচে রাত কাটাতে এসেছিল, সে বা তার মা কেউই জানতো না এই অপরাধে তার শ্বশুরঘর করা চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে কি না। তার মনেও কি দ্বিধা আসেনি, নিশ্চয়ই এসেছিল। কিন্তু সেইসব দ্বিধাদ্বন্দ্ব অতিক্রম করে তারা বেছে নিয়েছিল লড়াইয়ের সেনাপতিকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরি দায়িত্ব। অন্য সব কাজ পিছনে ফেলে তারা একাজে তাদের বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকা পালন করেছিল।

সমকালীন প্রেক্ষাপট উল্লেখ করা না হলে তেভাগার লড়াইয়ের একটি দিক নজরের আড়ালে থেকে যাবে। তত্ত্বগতভাবে আমরা বহুক্ষেত্রেই বলি, সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতিকে সঠিকভাবে পর্যুদস্ত করতে চাই শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশ। শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ কখনই দাঙ্গার ফাঁদে পা দেয় না। তেভাগার লড়াইকে এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে যখন চলছে তেভাগার লড়াই, ঠিক তখনই সারা দেশে দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠেছে। ১৯৪৬-এর ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-কে কেন্দ্র করে কলকাতায় বীভৎস বিস্ফোরণ ঘটেছে। আর, আমরা এই যে তেভাগার লড়াইয়ের কথা বলছি, সেই লড়াই চলছিল ১৯৪৬ সালেই এবং বলা বাহুল্য ৪৫-সাল পেরিয়ে ১৯৪৬ সালে এসে তা তীব্র, সংগঠিত আকার নিয়েছিল। আর সেই তেভাগার লড়াইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে নীচের তলা পর্যন্ত নেতৃত্ব ছিল সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমান ফৌজের হাতে। আরও স্পষ্ট করে বললে একথা বলতে হয়, কে কোনও ধর্মে বিশ্বাস করে এ প্রশ্নটা সেদিন ছিল অবান্তর, প্রশ্ন ছিল, তেভাগার লড়াইয়ে সে বিশ্বস্তভাবে সংগ্রাম করতে, জীবন দিতে প্রস্তুত কিনা। তাই দাঙ্গার আগুন সেদিন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলকে বিশেষ স্পর্শ করতে পারেনি। এক্ষেত্রে, বিজয় অর্জন করেছিল মানুষের সংগ্রামী চেতনা। কিন্তু, কংগ্রেসের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ সরকারি প্রশাসন জমিদার-জোতদারের স্বার্থরক্ষায় সরাসরি নেমে পড়েছিল।

মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে মন্ত্রী হংসধ্বজ ধাড়া ঘোষণা করেছিলেন, তেভাগার লড়াই না এটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আর নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা দায়ের করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে দিয়েছিলেন। নেতাদের মাথার দাম উঠেছিল ১০০০০ টাকা পর্যন্ত। মানুষ কিন্তু এসব প্রশাসনিক সন্ত্রাসের কাছেও মাথা নত করেনি। যাবতীয় প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও বহু গ্রামেই পুলিশবাহিনী ঢোকার সাহস করত না। এমনই এক সন্ধিক্ষণে ঘটেছিল, বেড়মজুরের গুলিচালনার ঘটনা। কৃষক-ফৌজের কাছে হঠাৎ খবর এল, তাদের এক নেতা পুলিশের অতর্কিত আক্রমণে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাকে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে বেড়মজুরের কাছারিতে। জমিদারের লেঠেলবাহিনী, থানার দারোগার নেতৃত্বে ছোটখাটো পুলিশবাহিনীকে মোকাবিলা করে কৃষক-ফৌজের সাহস বেড়ে গিয়েছিল। বেড়মজুরে যে কেন্দ্রীয়ভাবে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী জমায়েত হয়েছে, তা কৃষকফৌজের পক্ষে বোঝা অথবা তাদের শক্তি সম্পর্কে আন্দাজ করা সম্ভব হয়নি। হাজার হাজার কৃষকবাহিনী বেড়মজুর কাছারি ঘিরে ফেলে। আমি একটু দেরিতে খবর পেয়েছিলাম। এসে পৌঁছে দেখলাম, লড়াইতে বেকায়দায় পড়ে গেছি। বেড়মজুরের কাছারিটি একেবারে নদীর পাড়ে উঁচু জায়গায়। আর সেখানেই সশস্ত্র বাহিনী Position নিয়েছে। জলে-জঙ্গলে পালিয়ে লড়াই করার—Strategic Retreat করার কোনও সুযোগ নেই। সন্ধেও হয়ে এসেছে। এই অবস্থায় কাছারি থেকে ফায়ারিং শুরু হল। স্বভাবতই লড়াইয়ের নেতারা অনেকেই আহত হলেন। ২০ জন সংগ্রামী কৃষক নিহত হলেন। শহিদের মৃত্যুবরণ করে অমর হলেন—রবিরাম, রতিরাম, পাগলু, চামু বিশাল। আমরা বুকে করে আহত মানুষদের বয়ে নিয়ে গেলাম খানিকটা দূরের মন্দিরতলায়। আহতদের চিকিৎসা চলল, স্বজনহারা মানুষের দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। আমি বুলেটে আহত, রক্তক্ষরণ হচ্ছিল বহুক্ষণ ধরে, নিঃশব্দে ঘুম নেমে এল আমার দুচোখ জুড়ে।

বেড়মজুর কাছারির আঘাত আমাদের সামলে ওঠা কঠিন হল। আগেই বলেছি, তখন দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া চলছে। দেশ বিভাজনের মতলবে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন দেশের কংগ্রেস নেতারা। এই পরিস্থিতিতে অকস্মাৎ আমাদের আন্দোলন প্রত্যাহত হল। এর আগেই আহত অবস্থায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলাম। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট যখন স্বাধীনতার সূর্য উঠল দেশজুড়ে, তখন আমরা বসিরহাট সাবজেলে আলোর আকাঙ্ক্ষায় প্রহর গুনছি।
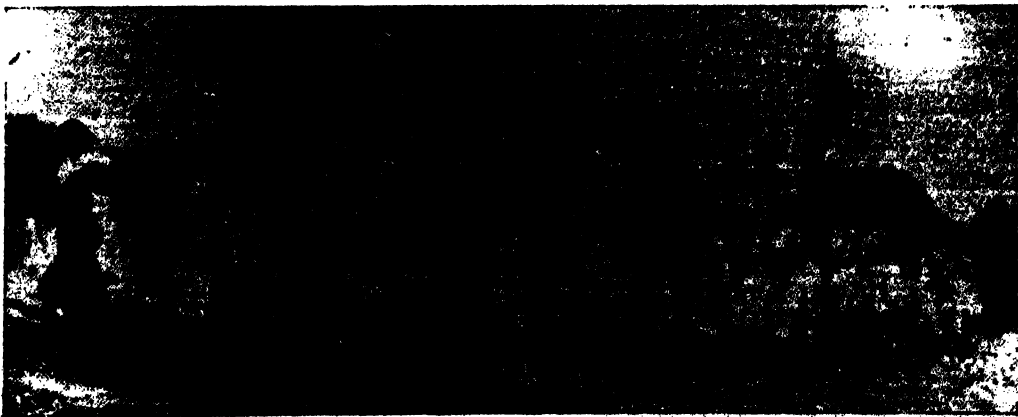
অহল্যা মা তোমার সন্তান জন্ম নিল না

বিনয় রায়

আর কতকাল বল কতকাল
সইবি এ মৃত্যু অপমান
এ আর সহে না।

শহর বন্দরে চাষীর কুটিরে
নরখাদক দলের অভিযান
এ আর সহে না

কমলাপুর শহিদ ডাকে আয়রে আয়রে
ডোঙাজোড়ার শহিদ সুবেন তোদের পানে চায়রে
চন্দনপিড়ির সরোজিনী অহল্যা মা
তাদের খুনের তর্পণ হল না
এ আর সহে না।

সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে
ফলাল যে সোনা
তার মা বোনের রক্তে হল
সোনার মাটি লোনা
রক্তের ধার বেঁধে মোদের
প্রতি গ্রাসে গ্রাসে
কবে বল কবে শুধবো তা।
এ আর সহে না

অহল্যা মা তোমার সন্তান জন্ম নিল না
ঘরে ঘরে সেই সন্তানের প্রসব যন্ত্রণা
শত কংস ধ্বংস করে যে শিশু জন্মিবে
মাঠে মাঠে তারই জল্পনা
প্রাণ আর মানে না ॥

বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তেভাগা-সংগ্রাম

গোলাম কুদ্দুস

তেভাগা-সংগ্রামের অসাধারণ গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করলেই তাকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনার প্রয়োজন অনুভূত হবে।

লক্ষ করুন অবস্থার কী দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল!

১৯৪৬-এর আগস্টের দাঙ্গার এক মাসের মধ্যেই সেপ্টেম্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিল তেভাগা-সংগ্রামের ডাক দেয়। মাত্র দুমাসের প্রস্তুতির পর সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়! তার কিছু আগে হাসনাবাদের কৃষকরা শৌর্য, সাহস, সংগঠনশক্তি ও সুদক্ষ নেতৃত্বের সাহায্যে নোয়াখালির দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়ার পথে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধের প্রাচীর সৃষ্টি করে নিজেদের হিম্মত দেখিয়ে দেয়। উদ্বুদ্ধ হয় গোটা কৃষক-নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী। অচিরে তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে বিরাট এলাকায় বিপুল সংখ্যক কৃষকদের মধ্যে। নির্যাতিত নিপীড়িত কৃষকদের এমন দ্রুত জাগরণ ও কার্যক্রমের জন্য জোতদাররা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সংগঠিত কৃষক-এলাকায় কৃষকরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় বিনা বাধায় ঝটিকার বেগে ধান কেটে নিজ নিজ খোলানে তুলতে সক্ষম হয়। অবস্থা আয়ত্তে আনতে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা 'তেভাগা বিল' রচনা করে। তাতে হল হিতে বিপরীত, আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। কৃষকসভার সভাপতি কৃষ্ণবিনোদ রায়ের ভাষায়, "তেভাগা আইন চালু হতে যাচ্ছে এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর অসংগঠিত এলাকার ভাগ-চাষীরা মরিয়া হ'য়ে উঠল, তাদের মনে হল তারা ঠকে গেল। তারা সব জোতদারদের বাড়ির পুঁজ (ধানের গাদা) ভেঙ্গে জোর ক'রে নিজেদের হেফাজতে আনতে লাগল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সুবিশাল অসংগঠিত এলাকায় সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ল।"

আন্দোলনের সাফল্যের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে! কিন্তু কৃষকসভার সভাপতির কণ্ঠে আনন্দের বদলে ধ্বনিত হচ্ছে প্রায় আক্ষেপ ও আতঙ্কের সুর :

সংগ্রাম বিদ্যুৎগতি-বিস্তৃতি কৃষক সভার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল।" যাওয়াই তো কাম্য, এতে ক্ষতি কী? বড় বড় আন্দোলন, বিদ্রোহ ও বিপ্লব তো এইভাবেই হয়। কৃষকসভা কি চেয়েছিল সংগঠিত এলাকার মধ্যেই তেভাগা-সংগ্রামকে সীমাবদ্ধ রাখতে? অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থার বদলে হা-হুতাশ কেন? দমননীতির সম্ভাবনায়?

আন্দোলনের বিপুল বিস্তার শাসক এবং শোষকশ্রেণী সহজে মেনে নেবে কেন। নির্মম দমননীতি চালু হয়ে গেল, হাজার হাজার কৃষক নেতা, কর্মী ও বর্গাদারকে গ্রেপ্তার করা হল, তাদের উপর চলল লাঠি-গুলি। শহিদ ও পুলিশ ক্যাম্পের সংখ্যা বাড়তে লাগল সমানতালে। তারপর কালরাত্রির মত নেমে এল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটেলির ভারতের স্বাধীনতা আলোচনার্থে ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের ঘোষণা। স্বাধীনতালব্ধ ফল, ফসল এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য বেয়াড়া বর্গাদারদের বাগে আনতে উঠেপড়ে লাগল মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস। তারা এবার নিজেদের মুখোশ খুলে ফেলে প্রকাশ্যে জোতদারদের পক্ষাবলম্বন করল, তেভাগা আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমে পড়ল। অন্যদিকে, কৃষকসভার নেতৃবৃন্দ 'তেভাগা বিল' প্রকাশের পর আত্মসন্তুষ্ট হয়ে সক্রিয় কর্মোদ্যোগে ঢিলে দিয়েছিলেন, এ-কথা তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত সামনে না থাকায় এই কাণ্ড ঘটেছিল। এক সঙ্গে জোতদার-পুলিশ-লীগ-কংগ্রেস এবং দেশবিভাগের খড়্গ ঝলসে উঠল অপ্রস্তুত নিরস্ত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে। পরে আমরা দেখব, কেন সংগ্রামের আঙিনায় এসেও কৃষক মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক হতে পারল না। তার আগে একনজরে দেখে নেওয়া যাক তেভাগা-সংগ্রামের মূলশক্তির উৎস ছিল কোথায়, আর তার অগ্রগতির সম্ভাবনাই বা ছিল কতটা।

কৃষকদের কাছে তেভাগা-সংগ্রামের ডাক এসেছিল তাদের এমন একটা মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তে যখন তাদের সামনে ছিল মাঠভরা পাকা সোনার ধান, আর পিছনে ছিল ভয়ঙ্কর মন্বন্তরের বিভীষিকা। সর্বাপেক্ষা দুর্ভিক্ষপীড়িত বিরাট বিরাট অঞ্চলই হয়ে উঠেছিল তেভাগা-সংগ্রামের ঝটিকাকেন্দ্র। তখনো গ্রামে গ্রামে অজস্র কবরের ঢিবি আর শ্মশানের ভয়াবহ চিত্র কৃষকদের সামনে তিলে তিলে মৃত্যুবরণের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে উপস্থিত ছিল, তাদের স্মৃতিতে জড়িয়ে ছিল অসহায় মানুষের নিষ্ফল ক্রন্দন এবং নির্দয় জোতদার-মজুতদারদের নগ্ন অর্থলালসা। কোন পরিবারের কতজন দুটি অন্নের অভাবে প্রাণত্যাগ করে, তা গ্রামসুদ্ধ লোকের জানা ছিল। তেভাগা-সংগ্রামের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে নিলফামারীর ডোমার-ডিমলা এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, সোনার ফসলের মায়া ছেড়ে কেউ কেউ "ভোটাং যাত্রা" করেছে বা করতে উদ্যত হয়েছে। ভোটাং যাত্রা মানে ভুটানের দিকে চলে যাওয়া, জীবিকার সন্ধানে। কারণ এই বর্গাদাররা হিসাব করে দেখেছে জোতদার-মহাজনদের দেনাপাওনা মিটিয়ে দেওয়ার পর হাতে একদানা শস্যও থাকবে না। বেআইনি আদায়পত্র কি একটা-দুটো? মার্চা, তহুরী, খোলান-চাঁচা, মহলদারি, গোলা-পুজো, বরকন্দাজি, মণ্ডপসেলামি, সন্ন্যাসী, হাতি-খোওয়া (হাতির খোরাক), মাহু-খোওয়া, গাজন, থিয়েটার দিশারি.....রাক্ষসদের এত রকমের ভোগ জুগিয়ে অতঃপর বর্গাদাররা আধমরা বউ আর ন্যাংটো ছেলে-মেয়েগুলোর হাত ধরে একমাত্র ভাঙা কড়াইটা কাঁধে নিয়ে গ্রাম, জমি এবং ফসলের বন্ধন কাটিয়ে অনির্দিষ্ট জীবনের পথে রওয়ানা দিচ্ছে! এমন সময় কেউ যদি তার সামনে এসে বলে, তোমার ধান তোমারই হাতে থাকবে, বরং একভাগ বেশি পাবে?

আমার স্মৃতিতে ভেসে এল পঞ্চাশ বছর আগেকার এক নিভৃত পল্লীর নিশুতি রাত। শীতের ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কৃষকের জীর্ণ কুটিরকেও মনে হচ্ছে মনোরম। ক্ষুদ্র আঙিনার এক পাশে ক্ষুদ্র একটি ধানের পুঁজ। তার প্রায় গা-ঘেঁষে কঞ্চির বেড়া দেওয়া একচালা ঘরে খড়ের বিছানায় শুয়ে শীতে কাঁপছি। সামান্য একটু শব্দে উৎকর্ণ হলাম। উঠে বসলাম। কী অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। ধানের গাদায় মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক ছায়ামূর্তিসম কৃষক-রমণী! মাথা তুলে মৃদু স্বরে শুধু বলল, মা-লক্ষ্মী! মা-লক্ষ্মী!

সেই মুহূর্তে ফেলে আসা অতীত থেকে আমার কানে ভেসে এল, ফ্যান দাও! ফ্যান দাও! সেই মুহূর্তে পঞ্চাশের মহামন্বন্তরের লক্ষ লক্ষ মৃত মানুষের হাত যেন ছুঁয়ে গেল ওই ধানের পালা।

কেন, কেন আমি ভুলতে পারি না মন্বন্তরের করুণ দৃশ্যগুলি, কেন? কেন এই নীরব নিশীথে কেবলই আমার মনে হচ্ছিল, যুদ্ধরত ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছা করলেই সামরিক কায়দায় দুদিনেই মজুতদার-জোতদারদের গ্রেপ্তার করে ধানচালের বিলিবণ্টন দ্বারা মহামৃত্যুর বিজয়োল্লাস থামিয়ে দিতে পারত? হায়, এদের শাসনের প্রথম দশকেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গিয়েছিল, অনেক গ্রামাঞ্চল বনে-জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছিল। আবার এদের জোতদার-মজুতদার তোষণ, ভূমি-ব্যবস্থা এবং অমানবিক যুদ্ধনীতিই ডেকে এনেছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। এদের বিরুদ্ধে কেন তেভাগা-সংগ্রামের একটা বর্শাফলক উদ্যত হবে না?

ভারতীয় শাস্ত্রে নারী আদ্যাশক্তি। তাকে সেই জ্যোৎস্নাময় রজনীতে দেখেছিলাম এবং বুঝেছিলাম তেভাগা-সংগ্রামের শক্তির মূল উৎস কোথায়। কৃষক যদি হয় অন্নদাতা, কৃষক-বধূ অন্নপূর্ণা। তার হাতেই ভাতের হাঁড়ি। সে জানে কত ধানে কত চাল, ঘরে ধানচাল না থাকলে কী হয়। স্বামী মরে, পুত্রকন্যা মরে, নিজেকেও মরতে হয়। কেন যে তেভাগা-সংগ্রামে কৃষক-নারীরা তাদের পুরুষদের পিছনে ফেলে নিজেরা সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। মশালের মত জ্বলে উঠেছিল ঠাকুরগাঁর রাজবংশী ভাগুণী, দীপশ্বরী, খাঁপুরের শহিদ যশোদা বর্মণী, হাজং বীরাঙ্গনা রাসিমণি, শঙ্খমণি, রেবতী, নড়াইলের দুর্ধর্ষ নেত্রী সরলা এবং তাঁর তিনশ মেয়ের বিখ্যাত "ঝাঁটাবাহিনী"...

আর ক্ষেতমজুররা? তারা কেন দাঁড়িয়েছিল তেভাগা-সংগ্রামের সামনের সারিতে? তাদের তো তেভাগার একভাগ পাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না! তাদের কী স্বার্থ? তারা কেন গুলি খেয়ে বিরাট সংখ্যায় শহিদ হল, জেলে গেল, তেভাগা-সংগ্রামের সব ঝড়ঝাপটায় অটুট হয়ে টিকে রইল বর্গাদারদের পাশে? তারা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি এবং নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝেছিল তেভাগা-সংগ্রামের সঙ্গে তাদের ভাগ্য জড়িত। তাদের অনেকেই যুদ্ধকালের আগে ছিল বর্গাদার বা স্বল্পজমির মালিক। জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য এবং দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়ে তারা জমিজমা, গবাদি পশু ঘটিবাটি বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে ক্ষীণ প্রাণটুকু বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু অনেকেই পারেনি,

তারাই বেশির ভাগ মৃত্যুর শিকার হয়েছিল। এদের মধ্যে যারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, তারা সদ্য হাতছাড়া জমি ও হালের গরুর কথা ভুলতে পারেনি। তারা জানে কাদের গ্রামে গেছে তাদের জমিজমা, এমন কী ভিটেমাটি। লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুর লক্ষ লক্ষ বিঘা হারানো জমি ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। তারা চোখের সামনে লক্ষ করেছিল, যে-জোতদার-মহাজনদের দখলে গেছে তাদের যথাসর্বস্ব, তাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছে তেভাগার সংগ্রাম। চেতন বা অবচেতন সত্তাতে তারা নাড়া খেয়েছিল, ভেবেছিল এই সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে জমির লড়াই, তেভাগা-সংগ্রামের সাফল্য তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করবে। তেভাগা সংগ্রামের নেতাদের ভাষণে তারা যে জমি ফেরত পাওয়ার ন্যায্য দাবির কথা শোনেনি আদৌ, তা তো নয়। তেভাগা-সংগ্রাম কেন কৃষি-বিপ্লবে রূপান্তরিত হতে পারল না সে-আলোচনা করতে গেলেই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতের কথা এসে পড়ে।

গবেষকদের অনেকেই সংখ্যাতত্ত্বের লম্বা ফিতে দিয়ে আন্দোলনের পরিমাপ করেন। তাঁরা আন্দোলনের প্রাণ-প্রক্রিয়া বা 'ডাইনামিজম' দেখতে পান না। যেমন, কেউ কেউ আন্দোলনে মুসলিম চাষীদের কম সংখ্যায় যোগ দেওয়ার প্রশ্ন তুলে গোড়া থেকেই এ-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ছিল বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁরা আন্দোলনের প্রাণ-প্রক্রিয়াটাই ধরতে পারেননি। শুধু সংখ্যাতত্ত্বের উপর নির্ভর করে তাঁরা কি হিসাব করে তেভাগা সংগ্রামের অংশগ্রহণকারীদের সঠিক সংখ্যাও গণনা করতে পারবেন? একটা হিসাবে হয়তো দেখা গেছে যে, সংগঠিত এলাকায় ৬০ লক্ষ কৃষক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু অসংগঠিত এলাকায় যখন আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল, তখন অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা কীভাবে তাঁরা গণনা করবেন? মুসলিম কৃষকদের ব্যাপারেও সে-কথা খাটে। মুসলিম লিগের প্রভাব কাটিয়ে তারা যে একটু বিলম্বিত লয়ে চলবেন এ তো স্বাভাবিক। দু-একটা ঘটনার কথা বলা যাক। তেভাগা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যই এই যে, যাদের হাতে ভাতের হাঁড়ি, সেই মুসলিম মেয়েরাও কিন্তু একইভাবে সাড়া দিতে শুরু করেছিল। কৃষক ও কমিউনিস্ট নেতা মণি সিং লিখেছেন :

"একটি ঘটনা জ্বলজ্বল করিয়া মনে ভাসিতেছে। নিত্যানন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ভাগচাষী মুসলিমদের মেয়েরা গরীব হইলেও পর্দানসীন। ওদের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নিত্যানন্দকে গরু-পেটানোর জন্য ইহারাও বিক্ষুব্ধ হইয়া এমন কাণ্ড করিতে পারে ইহা আমরা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবি নাই। এই সময় দুইজন সশস্ত্র পুলিশ খুব দাপাদাপি করিয়া এক গরীব কৃষকের বাড়ির এক গাছতলায় বিশ্রাম করিতেছিল। এমন সময় দুইটি মুসলমান যুবতী-বধূ বাহির হইয়া আসিল। তাহারা সামাজিক রীতিনীতি ভুলিয়া গেল, উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিয়া নিজেদের ভাষায় বলিল, ওরে বান্দীর পুতরা, আমাদের নুকেরে মারিছ কেন? এই দাও দিয়া তরারে জব করিয়া ফেলবাম। যুবতীদ্বয়ের দা আর রণমূর্তি দেখিয়া পুলিশ পুরুষদ্বয় যে যে-দিকে পারিল রাইফেল দুইটি ফেলিয়া ভোঁ দৌড়ে পলাইয়া গেল। যুবতীদ্বয় এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাহারা হতভম্ব হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।"

গবেষকদের অনেকেই সংখ্যাতত্ত্বের লম্বা ফিতে দিয়ে আন্দোলনের পরিমাপ করেন। তাঁরা আন্দোলনের প্রাণ-প্রক্রিয়া বা 'ডাইনামিজম' দেখতে পান না। যেমন, কেউ কেউ আন্দোলনে মুসলিম চাষিদের কম সংখ্যায় যোগ দেওয়ার প্রশ্ন তুলে গোড়া থেকেই এ-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ছিল বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁরা আন্দোলনের প্রাণ-প্রক্রিয়াটাই ধরতে পারেননি। শুধু সংখ্যাতত্ত্বের উপর নির্ভর করে তাঁরা কি হিসাব করে তেভাগা-সংগ্রামের অংশগ্রহণকারীদের সঠিক সংখ্যাও গণনা করতে পারবেন।

এ থেকে অনুমান করা অন্যায় নয় যে, তেভাগা-সংগ্রামকে তার নিজস্ব গতি অনুসারে চালাতে পারলে মুসলিম লীগের কৃষক-গণভিত্তি বেশিদিন চিড় না খেয়ে পূর্ববৎ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারত না। বাস্তবে ঘটছিলও তাই। ঠাকুরগাঁ-র অসংগঠিত এলাকার মুসলিম বর্গাদাররা প্রথমে কৃষক নেতা হাজী মহম্মদ দানেশের অনেক ভাষণ শুনেও সাড়া দেয়নি, পরে তারাই তেভাগা-সংগ্রামের সাফল্য দেখে হাজী দানেশের কাছে এসে হাজির হল তেভাগা আদায়ের কাজে তাঁর "হুকুম" নিতে। সংগঠিত কৃষক এলাকার চেহারা গোড়া থেকেই ছিল ভিন্ন, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তেভাগার শ্রেণীসংগ্রাম ছিল জোঁকের মুখে নুনের ছিটের মত। আর সম্প্রসারিত শ্রেণীসংগ্রামের জোয়ারের মুখে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ খড়কুটোর মত ভেসে যেতে শুরু করেছিল অসংগঠিত এলাকাতেও। জাতিগত ভেদাভেদের মূলেও প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল তেভাগা আন্দোলন, ভেঙে দিয়েছিল "মুসলিম, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য প্রভৃতি কৃষকদের দুর্লঙ্ঘ্য সামাজিক ব্যবধান।"

কিন্তু এই মহান শ্রেণীসংগ্রাম ভাঙতে পারেনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের অশুভ আঁতাত, দেশবিভাগের ষড়যন্ত্র ও নির্মম শোষণের জাঁতাকল। এবং এককভাবে সে কর্তব্যসাধনের ক্ষমতা বা দায়িত্বের কোনোটাই বর্তায় না এই ধরনের সংগ্রামের উপর। কী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া শুরু হলে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে সোনায় সোহাগার মত এই আন্দোলন বিরাট রাজনৈতিক-সামাজিক রূপান্তরসাধনে বিপুল অবদান যোগাতে পারত?

জঙ্গি ভিয়েতনামের নেতা ১৯৪৬-এর কলকাতার দাঙ্গার আগে মার্চ মাস নাগাদ ফরাসি-সরকারের আমন্ত্রণে প্যারিসে যাচ্ছিলেন

আলোচনা জন্য। পথে একদিনের জন্য তাঁকে কলকাতায় থামতে হয়। আমাদের সৌভাগ্য, তাঁকে ক্ষণকালের জন্য আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির ডেকার্স লেনের প্রাদেশিক দপ্তরে আনা গিয়েছিল। তিনি যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিলক্ষণ অবগত ছিলেন তা বোঝা গেল যখন তিনি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে একটিমাত্র ইংরেজি বাক্যে সবই পরিষ্কার করে দিলেন—'We are at the fighting stage, while you are at the talking stage, অর্থাৎ, আমরা সংগ্রামের স্তরে আছি, তোমরা আছ বাক্য-বিলাসের স্তরে।"

কমরেড চো-চী-মিন নিশ্চয়ই সংগ্রাম বলতে শুধু কৃষকের লড়াই বোঝাতে চাননি, সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী মুক্তিযুদ্ধের কথাই বলতে চেয়েছিলেন, যে-মুক্তিযুদ্ধের একটা প্রধান অঙ্গ কৃষক-সংগ্রাম এবং কৃষি-বিপ্লব। এটাই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভিয়েতনামের সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। প্রায় অনুরূপ কথা আমাকে বলেছিলেন কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী। তাঁর মতে, স্তালিনগ্রাডের যুদ্ধে লালফৌজের বিজয়ের পর যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বার্লিন-দখল বিঘ্নসঙ্কুল হলেও সুনিশ্চিত হয়েছিল, যখন হিটলারের সাতদিনের শোক-দিবস পালনের ঘোষণা বিশ্ববাসীর সামনে নাৎসি-দম্ভের ধূলিশয্যাগ্রহণের করুণ চিত্র এঁকেছিল, তখন আমাদের জনযুদ্ধের জোয়াল ছেড়ে সংগ্রামের নতুন পথ ধরা উচিত ছিল, ফিরে আসা উচিত ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের রাজপথে। এর ছমাস পরে ১৯৪৩-এর জুনে পৃথিবীর বৃহত্তম ট্যাঙ্ক-যুদ্ধ 'ব্যাট্‌ল অফ কুর্স্কে' নাৎসিবাহিনীর একেবারে মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল, মিত্রশক্তি কর্তৃক দ্বিতীয় ফ্রন্ট না-খোলা সত্ত্বেও তখন লালফৌজ অনায়াসে একার শক্তিতেই প্যারিস পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার অবস্থায় এসেছিল, দ্রুত বার্লিনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। অন্তত তখন আর 'জনযুদ্ধ' নীতি আঁকড়ে থাকার কোনও হেতুই ছিল না। কিন্তু পার্টি নেতৃত্ব নিশ্চয়ই ভিন্ন মত পোষণ করতেন। শুধু কি তাই? তাঁরা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্বলাভের প্রস্তুতির পরিবর্তে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের অদ্ভুত আওয়াজ আউড়ে যাচ্ছিলেন। 'জনযুদ্ধ' নীতি পরিত্যাগ তো দূরের কথা, এই সময়ে তাঁরা পিচ্ছিল পথে আরও একধাপ গিয়ে বললেন, কেবল যুদ্ধকে সমর্থনই নয়, যুদ্ধের প্রয়োজনে কলে-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রামের পথে পরিচালিত করা নয়, তাকে যুদ্ধযন্ত্রের অঙ্গ হিসাবে দেখতে হবে। এই ভূমিকা শ্রমিকশ্রেণীকে মুক্তিযুদ্ধে তার যথাযথ স্থানলাভের প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখার নগ্ন সংস্কারবাদী কার্যক্রম। এর ফলে দেখা গেছে, যুদ্ধশেষে যে-সব নির্বাচন হয়েছে, তাতে অনেক লালঝাণ্ডার সমর্থক শ্রমিকরাও লালঝাণ্ডাকে ভোট না দিয়ে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে, 'রুজি-রুটির লড়াইয়ের জন্য লালঝাণ্ডা, আর আজাদীর জন্য কংগ্রেস।" এই তামাশা কমিউনিস্ট পার্টির সময়মত 'জনযুদ্ধ'-নীতি বদল না করার শাস্তি ছাড়ার কী হতে পারে।

কিন্তু মুহূর্তের তরেও এ-কথা বিস্মৃত হলে অন্যায় হবে যে, তখনকার পরিস্থিতিতে ফ্যাসিস্ট সামরিক জোট ছিল গোটা সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের ঝটিকা বাহিনী, তাদের পরাজিত ক'রে সোভিয়েত ইউনিয়নকে জয়যুক্ত করতে পারলে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা দুর্বল হতে বাধ্য। তাই যে-কোনও মূল্যে, এমন কী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করার মিথ্যা অপবাদ মাথায় নিয়েও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মিত্রপক্ষের জয়ের জন্য 'জনযুদ্ধ' নীতিগ্রহণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভুল ছিল। এই নীতিগ্রহণকালে সঠিকভাবেই ভাবা হয়েছিল, শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়ের ফলে যুদ্ধশেষে সারা বিশ্বে শ্রমিক-কৃষকের বিপুল আলোড়ন, জাগরণ, সংগ্রাম, এমন কী গণ-অভ্যুত্থানের সিংহদ্বার উন্মুক্ত হবে। স্ট্রাটেজি হিসাবে এবং নীতি হিসাবেও এ হয়তো নির্ভুল ছিল, কিন্তু সংস্কারবাদ পরিত্যাগ করে এবং যথাসময়ে 'জনযুদ্ধ' নীতি থেকে সরে এসে সংগ্রামের মঞ্চ গড়ে তুলতে না পারলে যথার্থ নীতিও মারাত্মক বিভ্রান্তিতে পরিণত হতে পারে। কমরেড চো-চী-মিন তাঁর দূরদর্শিতার ফলে হয় সেই ইঙ্গিতই করেছিলেন।

যুদ্ধোত্তরকালে আমরা দেখতে পাই, আশানুরূপভাবেই ভারতে, গণ-বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। যা আশা করা যায়নি, তাও হয়েছিল। মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে, সাম্রাজ্যবাদী সামরিক লৌহবেষ্টনী ভেদ করে দেশপ্রেমিক ভারতীয় নৌ-বিদ্রোহীরা লীগ-কংগ্রেস-কমিউনিস্ট পতাকা উড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার আগে আই.এন-এ-র বন্দিদের ব্যাপার নিয়ে এদেশে বিক্ষোভের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। আর বিমান ও পদাতিক বাহিনীর মধ্যে কী কাণ্ড ঘটেছিল তা পরে প্রকাশ পেয়েছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীতে এই শেষোক্ত ইতিহাস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও স্মরণীয়, তা না হলে ব্রিটিশ অধীনস্থ আমাদের দেশপ্রেমিক মিলিটারি অফিসার ও জোয়ানদের প্রতি অবিচার করা হবে। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের মূল কারণ ছিল, তিনি ভাবতে পারেননি দেশে থেকে সেনাবাহিনীর মধ্যে কোনও বিদ্রোহ ঘটানো যাবে। নেতাজির পরবর্তী কার্যক্রম এবং তারই ফলশ্রুতি আই-এন-এ-র ভূমিকা সর্বজনবিদিত; কিন্তু সবাই এখনও যেটা জানেন না সেটা হল, নেতাজির চেয়েও এক হিসাবে বেশি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের দেশের মধ্যে থেকেই একদল ভারতীয় মিলিটারি অফিসার ও জোয়ান ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনেরও আগে থেকে গোপন সামরিক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সি-পি-এমের সাধারণ সম্পাদক কমরেড হরেকিষেণ সিং সুরজিৎ মেজর জয়পাল সিংয়ের মৃত্যুর পর তাঁর যে জীবনী প্রকাশ করেছেন, তাতে এইসব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। আর মেজর জয়পাল সিংয়ের মৃত্যুর বহু বছর আগে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁরই পরামর্শে ও উৎসাহে আমি তাঁর জীবনের ঘটনাবলিকে কেন্দ্র ক'রে 'লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে' নামে যে-উপন্যাস লিখেছিলাম তাতেও একই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। কমরেড হরেকিষেণ সিং সুরজিতের তথ্যাদির সঙ্গে এই উপন্যাসে বর্ণিত তথ্যাদি হুবহু মিলে গেছে। ব্যাপারটার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলেই এ-সবের উল্লেখ করতে হ'ল। এটা বাদ দিলে যুদ্ধোত্তরকালের সমগ্র চিত্র পাওয়া সম্ভব নয় এবং সম্ভবত নৌ-বিদ্রোহ দমিত হওয়ার পরে কেন সাত তাড়াতাড়ি অ্যাটেলি ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের ব্যবস্থা করল, তারও সম্যক্ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কারণ অ্যাটেলি এবং তার দলবল যদি না-বুঝত যে, নৌ-বিদ্রোহ দমিত হলেও আরও ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ পদাতিক ও বিমানবাহিনীতে ঘটতে পারে, তা'হলে তারা এমন আকস্মিক ঘোষণা না করে আরও কিছুকাল টিকে থাকার চেষ্টা করত। সামরিক গোয়েন্দা

বিভাগের কল্যাণে তারা মূল সামরিক যন্ত্রের ভিতরকার অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল।

সব মিলিয়ে ভেবে দেখুন, ভারতে শ্রমিক-কৃষক-মৈত্রীর ভিত্তিতে ভিয়েতনামের মতই বা তদপেক্ষাও অধিকভাবে একটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা ছিল কি না। আর সে-অবস্থাকে বাস্তবে রূপদানের দায়িত্ব ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ছিল কি না। সঠিক নীতি নিলে স্বল্পশক্তিসম্পন্ন পার্টির বিস্তার ও প্রভাব বৃদ্ধি যে কেমন কল্পনাতীতভাবে বেড়ে যেতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সোভিয়েত বিপ্লব। কাজেই প্রভাব ও সংখ্যা নয়, সঠিক নীতি চাই এবং তা যথাসময়ে অনুসৃত হলেও দুই বস্তুই হাতের নাগালে এসে যায়। আরও একটা কথা বলা হয়নি, যুদ্ধশেষে ভারতীয় ছাব্বিশ লক্ষের সেনাবাহিনীতে তখন বিপুল সংখ্যায় ছাঁটাই শুরু হয়েছিল, কেননা অত বড় বাহিনীর ভরণপোষণের আর্থিক ক্ষমতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছিল না। এবং ছাঁটাইয়ের সময়ের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন দেশপ্রেমিক ভারতীয় সামরিক অফিসার ও জোয়ানরা। ছাঁটাইয়ের খড়্গের মুখে স্বাভাবিক কারণেই গোটা সামরিক যন্ত্রের মধ্যে ধূমায়িত অসন্তোষ জমা হচ্ছিল। শ্বেত-সৈন্যরা অনেকেই যুদ্ধশেষে দেশে ফিরে গিয়েছিল, নৌ-বিদ্রোহকালে ভারতে মাত্র সতের হাজার ব্রিটিশ শ্বেতকায় সৈন্য অবস্থান করছিল। তারাও আবার রণক্লান্ত এবং দেশে ফিরতে উন্মুখ। বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহকালে সেখানে ছিল মাত্র দুই ব্যাটালিয়ন ব্রিটিশ সৈন্য। কমিউনিস্ট পার্টি সঠিকভাবেই কংগ্রেস-লীগ নেতাদের উপেক্ষা করে নৌ-বাহিনীর সমর্থনে শ্রমিকদের কাছে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। অসাধারণ সাড়াও মিলেছিল। বহু বীর ও বীরাঙ্গনা প্রাণ দিয়েছিলেন। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীর সামনে নিরস্ত্র জনতা কী করবে? আশ্চর্য, কমিউনিস্ট পার্টি তখনও সশস্ত্র প্রতিরোধের কথা বলতে পারল না। পারলে সশস্ত্র জনতা দুই ব্যাটালিয়ন ব্রিটিশ সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ বা আত্মসমর্পণে বাধ্য করত। ইতিহাসের ধারা নতুন গতিতে প্রবাহিত হ'ত, আপসকামী কংগ্রেসি নেতাদের বেকায়দায় পড়তে হত, বিপ্লবী জনতা বিকল্প নেতৃত্ব খুঁজত বা তৈরি হতে সাহায্য করত।

উপরোক্ত আকস্মিক ঘটনার আগে ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর গোপন সংগঠনের নেতারা অবস্থার গুরুত্ব বুঝে জাতীয় বুর্জোয়া নেতাদের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করেও কোনও সাড়া পাননি। কেন পাবেন? ভারতীয় বুর্জোয়াদের উচ্চ মহল গোটা যুদ্ধকালটায় যুদ্ধ-কন্ট্রাক্টের কল্যাণে স্ফীতকায় হয়ে উঠেছিল, টাকার গদিতে বসে তারা ক্ষমতার গদির কথা তখন প্রবলভাবেই ভাবছিল, তবে সে-স্বাধীনতা এমন হওয়া চাই যাতে তারা একচ্ছত্র শোষণ ও শাসনের অধিকার পায়, তারা কেন সামরিক অভ্যুত্থানে যোগ দিয়ে গণ-বিপ্লব ডেকে আনতে যাবে, তারা বরং জনতার পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করে অন্তরালে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপসরফা করে, এমন কি দেশবিভাগে সম্মত হ'য়ে, বুর্জোয়া মার্কা স্বাধীনতার জন্য লালায়িত। সেনা বাহিনীর দেশ প্রেমিক নেতারা কেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন নি? তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধের নীতির কথা শুনেছিলেন এবং তার ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, এবং কমিউনিস্ট নেতাদের গোটা যুদ্ধকালটায় ঐ নীতি আকড়ে থাকার ফলে সেনা-নেতাদের বিভ্রান্তিও বেশ পাকাপোক্ত হ'তে পেরেছিল, তদুপরি তাঁরা কমিউনিস্টদের ১৯৪২-এর আগস্ট-আন্দোলনের বিরোধিতার কথা জানতেন, অথচ এটা জানতেন না যে, ওই আন্দোলনের জঙ্গি রূপ দেখে স্বয়ং গান্ধীজি আন্দোলনের দায়িত্ব অস্বীকার করেন, 'হিংসাত্মক' কার্যকলাপের নিন্দা করেন। আর কংগ্রেস নেতারা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জেল থেকে বেরিয়েই কমিউনিস্টদের দেশদ্রোহী বলে তুমুল প্রচার শুরু করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ কন্ট্রাক্টপুষ্ট বুর্জোয়ারাও কোলা ব্যাঙের মত ফুলেফেঁপে সমস্বরে ভেক-রব শুরু করে দেয়—কমিউনিস্টরা ব্রিটিশের চর এ-সবই গভীরভাবে দাগ কেটেছিল দেশপ্রেমিক সামরিক নেতাদের মনে।

কমিউনিস্ট ও কৃষক নেতাদের চেতনার স্তর কোথায় নেমে গিয়েছিল, তার একটা প্রমাণ মিলেছিল খুলনার মৌভোগে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে। এই সম্মেলন হয় ১৯৪৬-এর একেবারে গোড়ার দিকে। সম্মেলনে তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তাব নমনম ক'রে গৃহীত হয়, কার্যকর করার কোনোই কর্মসূচি নেওয়া হয় না। একজন খ্যাতনামা কৃষকনেতা মন্তব্য করেছেন, "সম্মেলন পরিস্থিতির বিস্ফোরক অবস্থা ধরতে পারেনি।" পার্টি নেতৃত্বের অন্ধত্বের মূলে ছিল গভীরভাবে মাথায় চেপে বসা সংস্কারবাদ। ফলে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ভারতের দ্বারপ্রান্তে এসে ফিরে গেল, আপসকামী বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীনে এল খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা। তাকে সেইভাবে না দেখে ১৯৪৮-এর কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এই স্বাধীনতাকে আখ্যা দিল, "এ আজাদী ঝুটা হ্যায়"। দেশবিভাগের ফলে সংস্কারবাদী বেলুন ফেটে যাওয়ার পরে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব পৌঁছল একেবারে বিপরীত মেরুতে—চরম হঠকারিতায়। লেনিন ঠিকই বলেছিলেন, সংস্কারবাদের মাশুল দিতে হয় বামপন্থী হঠকারিতায়। ঠিক তাই ঘটল।

কিন্তু তা যদি না ঘটত? কমিউনিস্টরা সময়মত ভুল সংশোধন ক'রে যদি বিপ্লবী পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণে এগিয়ে আসত? তাহলে পৃথিবীর সমগ্র পরিস্থিতিতে কী পরিবর্তন আসত? এ নিয়ে কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, এত কাল পরে এ-সব আলোচনায় কী লাভ? পালটা প্রশ্ন করা যেতে পারে—পঞ্চাশ বছর পরে তেভাগা আন্দোলন ও ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ব্যাপার নিয়েই বা এত অনুষ্ঠানাদি করার কী প্রয়োজন? স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও তেভাগা-সংগ্রাম থেকে আমরা নাকি শিক্ষা নিতে চাই। কিন্তু কী শিক্ষা, নিতে চাই? সে কথা তো কেউ বলছেন না। বললে মত বিনিময় করা যায়।

যা বলছিলাম, পঞ্চাশ বছর আগের বিশ্ব-পরিস্থিতি বুঝে ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলে আমরা আজ কোথায় থাকতাম। তখনকার সবচেয়ে বিচক্ষণ ও ধুরন্ধর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কিন্তু সর্বাগ্রে বুঝেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয় সাম্রাজ্যবাদের ভরাডুবি ডেকে আনবে, গোটা বিশ্বের চেহারা বদলে দেবে। তিনি চোখের সামনেই যে দেখলেন, মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা হিটলার-কবলিত প্যারিসে প্রবেশ করার আগেই ফ্রান্সের কমিউনিস্টরা দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে প্যারিস মুক্ত করল। তিনি দেখলেন, কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে গ্রিসের জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সেনাবাহিনী নিজেদের শক্তিতে ১৯৪৪ সালের হেমন্তকালে হিটলারবাহিনীকে বিতাড়িত করে গোটা গ্রিসকে মুক্ত করল।

আতঙ্কিত চার্চিল ফিল্ড-মার্শাল মন্টগোমারিকে আদেশ দিলেন ফ্যাসিস্ট সেনাদের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র যেন হিটলারপন্থীদের হাতে দেওয়া হয় যাতে তাদের সঙ্গে একত্রে মিলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করা যায়। অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাণ্ড! কিন্তু নিষ্ঠুর সত্য। তথাপি অবিলম্বে বার্লিনের পতন ঘটল। তারপরে একে একে ফ্রান্স ও ইতালির সরকারে কমিউনিস্টরা স্থান পেতে লাগল। পূর্ব ইউরোপকে তো আগেই লালফৌজ মুক্ত করেছে। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি সৈন্যকে পরাস্ত করার পর তাদের প্রায় সব অস্ত্রশস্ত্র চীনের কমিউনিস্টবাহিনীর হাতে তুলে দিল লালফৌজ, চিয়াং-কাইশেকের দিন ঘনিয়ে এল। এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কী ঘটছিল? ফিলিপাইনের দুই-তৃতীয়াংশ কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন কৃষক-গেরিলার হাতে, ইন্দোনেশিয়ার মুক্তিসংগ্রামে কমিউনিস্টরা পুরোভাগে, মালয়েও তাই, বার্মায় আউঙ্গসাজের নেতৃত্বে কী ঘটছিল তা সবাই জানেন। ভিয়েতনামের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতে যদি কমিউনিস্টরা তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাধ্য ছিল না মালয়ে গোর্খা সৈন্য প্রেরণ করে, আর পরবর্তীকালে ভিয়েতনামকেও মুক্তিযুদ্ধে এত মূল্য দিতে হত না। গোটা পৃথিবীর চেহারাই পালটে যেত। বেচারা চার্চিল পটসড্যাম সম্মেলনে স্তালিনকে প্রথমে অ্যাটম বোমার খবরটা দিয়েছিলেন রুজভেল্টের সঙ্গে পরামর্শ করে, কিন্তু স্তালিনকে নার্ভাস হতে না দেখে নিজেই নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। আফ্রিকার মুক্তিও সেই বিশাল যুগান্তকারী পরিবর্তনের মুখে ত্বরান্বিত হত। আর মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধশেষে গুছিয়ে বসার আগেই বুঝতে পারত জনযুদ্ধ কাকে বলে। এ তো জানা কথা পুঁজিবাদ একটা আন্তর্জাতিক শক্তি, তার পতন ঘটাতে পারে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক-শ্রেণীর বিশ্বজোড়া আন্তর্জাতিকতা। তার অন্তর্গত কোনও কমিউনিস্ট বাহিনী নিজেদের দায়িত্ব পালনে গাফিলতি বা ভুল করলে মাশুল দিতে হয় সবাইকে। শুনেছি স্তালিন পরবর্তীকালে ভারতের এক কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদলকে বলেছিলেন, যুদ্ধকালীন অবস্থায় 'কমিনটার্ন' ভেঙে দেওয়ার পরে 'জনযুদ্ধ' নীতি বদলানোর পথে তো কোনো বাধা ছিল না।

তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে এত কথা বলার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বলতে হল বড় দুঃখে।

সেই সঙ্গে অতি আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি তেভাগা আন্দোলনের একটা বিশেষ দিক। বহু জায়গায় দেখা গেছে, আন্দোলনের প্রথম দিকে ধান কাটা এবং তা নিজের খোলানে তোলার ব্যাপারে বর্গাদাররা ছিল দোদুল্যচিত্ত। এই রকম সংকট মুহূর্তে বহু অঞ্চলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা কমরেড নিজে থেকে এগিয়ে এসে বলেছেন, আমার জমি থেকে ধান কাটা শুরু হোক। কৃষকরা কস্মিনকালেও এমন কথা শোনেনি, ভাবতেও পারেনি, তারা বিস্মিত হয়, সেই সঙ্গে তাদের মনে গভীর প্রত্যয় সৃষ্টি হয়, মনে উৎসাহের তরঙ্গ বয়ে যায়। এ কী একটা সামান্য ব্যাপার যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা কমরেড নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের জমিতে সর্বপ্রথম বর্গাদারদের দিয়ে ধান কাটাচ্ছেন। এবং সেই ধান বর্গাদারদের খোলানে তুলে দিয়ে আসছেন। এটা করছেন কৃষকসভার কথায় নয়, নিজের অন্তরের প্রেরণায়, কথা ও কাজের মিল ঘটানোর আন্তরিক ইচ্ছায়। এই সহজ আত্মত্যাগ আসলে সহজ নয়। প্রথমত, নিজের অন্তরকে জয় করতে হয়েছে, দ্বিতীয়ত, আত্মীয়-স্বজন, এমন কী অনেক ক্ষেত্রে নিজের পরিবারের বিরূপতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দিনাজপুরের কৃষকসভার সম্পাদক কালী সরকারের বাড়িতে গিয়ে দেখি তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁকে বয়কট করেছেন, তাঁর ভ্রাতা তাঁর পরিবারবর্গকে কুয়োর জল থেকে বঞ্চিত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের আত্মত্যাগ করতে গিয়ে অনেক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাও ঘটেছে। তবু এই সব কমরেডরা সুদৃঢ় চরিত্র বল, নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগের দ্বারা বর্গাদারদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। একে কিছুতেই ছোট করে দেখা চলে না। এই সব কমরেড নিজ নিজ এলাকায় চিরকাল স্মরণীয় ও বরণীয় হ'য়ে থাকবেন এবং ভবিষ্যৎ কৃষি-বিপ্লবে তাঁদের এই দৃষ্টান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা কমরেডদের হয়তো নিজের জমি-বণ্টনে নিজে থেকেই এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করবে। তেভাগা আন্দোলনে কমরেডরা প্রমাণ করেছেন, তাঁরা বর্গাদারদের আত্মার আত্মীয়। এই আত্মীয়তার শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। তেভাগা আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের অনলস নীতিনিষ্ঠ কর্মোদ্যোগ বহুদিনের সাধনার ফল, যুদ্ধ ও যুদ্ধপূর্ব যুগ থেকে এর শুরু। গোটা যুদ্ধকালটায় কৃষক নেতা ও কর্মীরা কৃষকদের বহুবিধ সমস্যা ও আন্দোলনের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন। হাটতোলা ও বেআইনি আদায়ের বিরুদ্ধে বহু ছোটখাটো সংগ্রাম তাঁরা পরিচালনা করেছেন। যুদ্ধ ও মহামারীর সময় তাঁরা সাধ্যানুসারে রিলিফ ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে এগিয়ে গেছেন, জেল থেকে মুক্তিলাভের পর বহু স্বাধীনতা-সংগ্রামী যাঁরা কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তাঁরা চলে যান সুদূর দুর্গম গ্রামাঞ্চলে, দিনের পর দিন তাঁরা "পশ্চাদপদ, দারিদ্র্য পীড়িত, শোষিত, নিরক্ষর কৃষকদের মধ্যে পড়িয়া থাকিয়া অনেক অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাহাদের সংগঠিত করিয়াছিলেন।" সর্বক্ষেত্রেই দেখা গেছে, তেভাগা- সংগ্রামের নেতা ও কর্মীদের অসমসাহসিক কার্যকলাপ, সাংগঠনিক কৃতিত্ব ও সময়বিশেষে অকুণ্ঠচিত্তে আত্মবলিদান গোটা কৃষক-সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে। নেতা ও কর্মীদের এই নৈতিক বলিষ্ঠতা দেখে জোতদারদের বাড়ির কাজের লোকেরা পর্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছে, তারা নিজে থেকে এসে জোতদারদের অনেক ষড়যন্ত্রের খবর পৌঁছে দিয়েছে কৃষক নেতাদের কাছে। অনেক ক্ষেত্রে চোর-ডাকাত পর্যন্ত জমি পাওয়ার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা মনে রেখে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। এই সমবেত শক্তি ও প্রচেষ্টার যোগফলে আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠল, তখন বিরাট বিরাট অঞ্চলের গোটা চেহারাটা বদলে যেতে লাগল। একজন কৃষক নেতা লিখেছেন, 'থানা আছে কাজ নাই, জমিদারী কাছারী আছে তাতে তালা ঝুলছে, চৌকিদার দফাদাররা হয়েছে জনসাধারণের সেবক। কৃষকরা দল বেঁধে আনন্দে কলকল ধ্বনি তুলে সকলের বাড়ির ধান দেখে বেড়ায়।' এ এক নতুন ডিমলা, এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থা...'

নতুন সমাজ-ব্যবস্থা? শুনলে চমক লাগে! নতুন সমাজ-ব্যবস্থা না হোক, তার সূচনা তো বটেই। আর বর্তমানের নিরিখে এটা যে প্রায় একটা মুক্ত অঞ্চল, তাতে সন্দেহ নেই। তেভাগা-সংগ্রাম এমন মুক্ত অঞ্চল আরও অনেক সৃষ্টি করেছিল। নেতৃত্বের উৎসাহ ও অনুমতি

পেলে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে কৃষক কর্মীরা বেশ গোটা কয়েক ইয়েনান তখন হয়তো সৃষ্টি করতে পারত। লাঠি-গুলির মুখে দাঁড়িয়ে অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকদের মনে আত্মরক্ষার তাগিদে বন্দুকের কথা মনে হয়েছিল এবং সেটা বাইরের কোনও নেতা বা নেতৃত্বে উস্কানিতে নয়। সেটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্ন।

যে-আন্দোলন গোটা ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কৃষি-বিপ্লবের রূপধারণ করতে পারত, বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত ও কার্যক্রমের অভাবে তা শুধু ঐতিহাসিক তেভাগা-সংগ্রামরূপে চিহ্নিত হয়ে রইল। যে-আন্দোলন দেশবিভাগ রোধ করে নতুন সমাজ-রূপান্তরের বাহন হতে পারত, সে-আন্দোলন নিজেই হল দেশবিভাগের বলি। আর সেই সঙ্গে বলি হল লক্ষ লক্ষ ভিটেমাটিছাড়া উদ্বাস্তু। বাংলার জাতিসত্তায় যে গভীর ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি হল তা কবে নিরাময় হবে কেউ জানে না।

জাপানি কৃষি বিশেষজ্ঞরা অনেক আগেই আয়ত্ত করেছে কী করে বৃহৎ বটবৃক্ষকে চিরকালের মত টবের ছোট গাছ করে রাখা যায়। চিরকালের শোষক-শাসকরা এবং আধুনিক কালের সাম্রাজ্যবাদীরা মানুষরূপী মহীরূহকে ক্ষুদ্রাকৃতি করে রাখার কলাকৌশল বারবার প্রয়োগ করেছে এবং এখনও বিশ্বময় সেই কাজে হাত পাকাচ্ছে। তাদের পালটা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও তার সঠিক প্রয়োগের ফলে দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ শোষকদের লৌহবলয় ভেঙে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, যদিও ভুলভ্রান্তির ফলে প্রচুর খেসারতও দিতে হয়েছে এবং হচ্ছে। ভারতের কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য মেহনতি মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলন, নৌ-বিদ্রোহের মত নানা বিদ্রোহ এবং তেভাগা-সংগ্রামের মত নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মহীরুহের মতই আকাশে মাথা তুলতে চেয়েও পারেনি বটে, কিন্তু অনেকখানি মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে। বাংলার তেভাগা-সংগ্রাম যে আজকের পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম ভিত্তিমূল তৈরী করেছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিপ্লবী পরিস্থিতি নানা দেশে নানা রূপে দেখা দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বিচিত্ররূপে দেখা দিতে পারে। ভারতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে বলে মনে হয় না। শুধু মার্কসের সতর্কবাণী মনে থাকে যেন—বিপ্লব তুঙ্গে উঠলে প্রতি-বিপ্লবও প্রত্যাঘাতের জন্য নিজেকে সংগঠিত করে। নৌ-বিদ্রোহ এবং তেভাগা-সংগ্রামের বেদনাদায়ক দৃষ্টান্ত সেই নিষ্ঠুর সত্যই প্রকট করেছে। পুঁজিবাদী-সংকটের ঘন তমসাময় রজনীতে যদি 'হ্যামলেটে'র প্রেতাত্মার মত আবার এক বিপ্লবী পরিস্থিতি ন্যায় প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে ফিরে আসে, তখন যেন প্রস্তুতির অভাবে আমাদের তরুণ হ্যামলেটদের বলতে না শুনি :

The time is out of joint, O Cursed spite,
That I was born to set it right.

শিল্পী : সোমনাথ হোড়

শোন কাকদ্বীপ রে

সাধন গুহ

শোন কাকদ্বীপ রে
এই চন্দনপিড়ি শ্মশানে
অহল্যা মার চিতায় আগুন জ্বলেরে।
আহা কিষাণী মার প্রসব যন্ত্রণা
বাতাসে বাতাসে গুমরিয়া কান্দেরে ॥
ও সেই অহল্যা মার সন্তান শোন বন্ধু জনম নিল না।
বন্ধুরে—নতুন শিশু এই ধরণী দেখতে পেল না ॥

চোখের লোনা জলে সেথায়
সরস হইল মাটি
তারই মাঝে সোনার ফসল
ফলায় আঁটি আঁটি।
আহা সেই ফসল যায় পরের গোলায়
চাষী তো ধান পেল না ॥

শোন রক্তে রাঙা সেই ইতিহাস
প্রতিরোধ পণে সারা কাকদ্বীপ বলেছিল ডেকে
আমরা দেব না এমন সোনার ধান।
না না না না দেব না সোনার ধান

রক্তে বুনেছি ফসল মাটিতে রক্তে বুনেছি ধান।
ফসল মোদের মান ফসল মোদের জান
ফসল মোদের ঘরের লক্ষ্মী ফসল প্রাণের গান ॥

শোন তার পর—
এল ঝড় দুরন্ত দুর্বার।
মৃত্যুর পদাঘাত সারা কাকদ্বীপ তোলপাড়।
এল যতেক কিষাণ তারা বাজায় বিষাণ
বলে গায়—যদি যাক প্রাণ তবু দেব নাকো ধান
তোলপাড় কাকদ্বীপ তোলপাড় ॥

শোন যত দেশবাসী শোন সে কাহিনী
বিনা দোষে জীবন দিল অহল্যা কিষাণী।
গর্ভবতী মায়ের বুকে লাগলো সীসের গুলি
অভাগিনী স্বাধীন দেশে দিল জীবন বলি।
মাগো অহল্যা কিষাণী
তোমার খুনে রাঙাই নতুন যুগের নিশানই।

জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগার বৈশিষ্ট্য

পরিতোষ দত্ত

The man of wealth and pride.
Takes up a space that many poor supplied.
The robe that wraps his limbs
in silken cloth
Has robbed the neighb'ring
field of half their growth

GOLDSMITH

[The Peasantry of Bengal : R.C. Dutt]
চ্যাপ্টার II-এর আরম্ভে উদ্ধৃত

বিভক্ত বঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার জন্ম ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। এই জেলার বিবরণে জেলার কংগ্রেস নেতা ও গবেষক ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন :

"ত্রিস্রোতা নদী মোটামুটিভাবে জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পূর্বভাগের অধিকাংশই ভূটানের অধীন। এই অংশ ডুয়ার্স খাসমহল নামে পরিচিত এবং পূর্বপ্রান্তে শঙ্কোশ নদী ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম ভাগকে করতোয়া নদী দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। করতোয়ার উত্তরে প্রায় সমস্ত ভূখণ্ডই বৈকুণ্ঠপুরের জমিদারীর অধীন ও দক্ষিণে অধিকাংশই কুচবিহার রাজের জমিদারী চাকলাজাত এস্টেট নামে পরিচিত।"

পরে জেলা বিভক্ত হলে **পাটগ্রাম**-সহ পচাগড়, তেঁতুলিয়া, দেবীগঞ্জ, বোদা পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হয় (**বর্তমানে বাংলাদেশ**)। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন

মূলত ওইসব অঞ্চলেই প্রথম শুরু হয় (১৯৩৮)। পরে ১৯৪৬ সনে তিস্তার পূর্বপারে সংগঠনের জন্য ধীরেন নিয়োগী ও প্রয়াত চারু মজুমদারকে পাঠানো হয়। এঁরা কংগ্রেসের নেতা ও পরে এম এল এ প্রয়াত যজ্ঞেশ্বর রায়ের বাড়িতে থাকতেন।

ইতিমধ্যে চল্লিশ দশকে রেলওয়ে শ্রমিকদের কেন্দ্র করে সংগঠন গড়ে ওঠে এবং তাদের হাত ধরেই লাল ঝাণ্ডা ডুয়ার্সে প্রবেশ করে।

কংগ্রেস আন্দোলন গ্রামে ছড়াবার উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে বরিশালের রাজবন্দী মাধব দত্তের আগমন এ জেলায় ঘটে এবং তাঁর নেতৃত্বে কৃষক সংগঠন তৈরি হয়। তিনি প্রথম ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালের বাড়িতে থাকতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মাধব দত্তের সঙ্গে চারুচন্দ্রের হার্দিক সম্পর্ক ছিল।

কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রভাব সে সময় বোদা, তেতুলিয়া ইত্যাদি থানায় ছিল এবং মাধব দত্ত সেখানে গিয়ে লক্ষ করলেন কংগ্রেসের পুরাতন ঘাঁটির কর্মীরা কংগ্রেসের উপর বীতশ্রদ্ধ। এখানে তিনি লক্ষ করেন আধিয়ার সমস্যা ও কর্জাধানের অত্যধিক সুদ। জুলুম ও আধিয়ার উচ্ছেদ।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার পুরাতন রংপুর জেলার প্রজাবিদ্রোহের কথা। সে বিদ্রোহ সে সময়কার (১৭৭৩ খ্রিঃ) রাজবংশী কবি রতিরাম দাস এক জাগ গানে বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলেন। আমরা তার কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরছি :

রাইয়ৎ প্রজারা সবে থাকে খাড়া হৈয়া
হাত জুড়ি চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইয়া
পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরনে নাই বাস
চামে ঢাকা হাড় কয়খান করি উপবাস।

মাও ছাড়ে বাপ ছাড়ে ছাড়ে নিজের মাইয়া
বেটা ছাড়ে ছাড়ে নাই কারো মায়া। [মাইয়া = পত্নী]

এরপর শুরু হয় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সাধারণ প্রজার লড়াই :

শিবচন্দ্রের হুকুমতে সব প্রজা ক্ষ্যাপে
হাজার হাজার প্রজা ধায় এক ক্ষ্যাপে
নাঠি নিল খন্তি নিল নিল কাচি দাও
আপত্য করিতে আর না থাকিল কাঁও
ঘাড়েতে বাঁকুয়া নিল হালের জোয়াল
জাঙ্গলা বলিয়া সব চলিল কাঙ্গাল
চারি ভিতি হাতে আইসে রঙ্গপুরে প্রজা
ভদ্রগুলা আইসে কেবল দেখি করে মজা।

এই জাগ গান সংগ্রহ করেন ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র এবং পঞ্চানন সরকার (পরবর্তীকালে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা) মহাশয়ের সম্পাদনায় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, রংপুর শাখার ১৩১৫ সনের চতুর্থ সংখ্যায় ছাপানো হয়।

রংপুরের শাসনকর্তা Goodland-এর মতে এই বিদ্রোহ ছিল—

It was the most formidable riot ever happened in Bengal.

জাগ গানের নোটে যে বিবরণ ছাপান হয়েছিল তা আরো ভয়াবহ :

"খৃস্টান পুঙ্গব গুডল্যাণ্ড সাহেব আহার করেন আর নিদ্রা যান। কাজকর্ম দেবীসিংহই করেন। দেবীসিংহের কীর্ত্তিকলাপ তিনি দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না, উৎকোচের মায়া কে পরিত্যাগ করে?"

"দেবীসিংহের অত্যাচারে সেই সমস্ত দরিদ্র ব্যক্তি কিরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিল, তাহাদের অবস্থা কতদূর শোচনীয় হইয়াছিল তাহা দেবীসিংহের নিজের কথাতেই উত্তমরূপ প্রতীয়মান হয়।"

"অন্তঃপুরচারিণীগণ প্রকাশ্য স্থানে আনীত হইতে লাগিলেন। দেবীসিংহের অনুচরবর্গ বলপূর্বক সেই সকল কুলকামিনীর অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিয়া অলঙ্কার উম্মোচন করিতে লাগিল। কখনও বা তাঁহাদিগকে বিবস্ত্র অবস্থায় সাধারণের সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখা হইল।...... তাঁহাদিগকে বিবস্ত্র করিয়া বেত্রাঘাত করা হইত। বংশ দণ্ড অর্ধচন্দ্রাকারে চাঁচিয়া তাহার দুই প্রান্ত স্তনদ্বয়ে বিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। বংশদণ্ড স্তন ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইত।"

এই ভয়ানক অত্যাচারের পরও তার স্মৃতি ওই অঞ্চলে কিংবদন্তির ন্যায় প্রচলিত ছিল এবং অচিরে কৃষক নেতা মাধব দত্ত ও তাঁর সহকর্মীদের কথায় কৃষককুল উঠে দাঁড়াল। চারুচন্দ্রের গল্পে জানতে পারি তাঁকে কৃষকরা জিজ্ঞাসা করতেন "স্বাধীনতা কতদূর"। তাঁদের বিশ্বাস হয়েছিল স্বাধীনতা এলেই এই অত্যাচারের অবসান ঘটবে।

ক্যাপ্টেন টার্নার ১৭৮৩ সালে তিব্বত যান কোচবিহার হয়ে। তাঁর লেখা An Account of An Embassy to this Court of the Teshoo Lama in Tibet—1783 গ্রন্থে তিনি কোচবিহারের দরিদ্র রাইয়ত বা চাষীর কিছু বিবরণ দেন। এতে সে সময় এইসব অঞ্চলের আর্থিক দুরবস্থা—বিশেষ করে দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করলাম।

"If a Reiat or peasant owes a sum of money, and has not the ability to satisfy his creditor, he is compelled to give up his wife as a pudge, and possession of her is kept until the debt is discharged....during her residence and connection with the creditor, a family should have been the consequence, half of it is considered as the property of the person with whom she lived and half that of her real husband. *(Page. 10-11)*.

Indeed the extreme poverty and wretchedness of these people for forcibly appear, when we collect how little is necessary for this subsistence of peasant in these regions. The value can seldom amount to more than one penny per day, even allowing him to make his meal of two pounds of boiled rice, with a due proportion of salt, oil, vegetable, fish and chili *(Page 11)*.

Nothing is more common that to see a mother dress up her child and bring it to market with no other hope, no other view, than to enhance the price she may procure for it *(Page 11)*. The situation of this district exhibits a melancholy proof of different facts too

frequently united, the great facility or obtaining food, and, at the same time, the wretched indignation of the lower order of inhabitants (*Page 12*).

উত্তরবঙ্গের কৃষকের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। মেয়েদের একটি ফোতা ও পুরুষের লেংটি সম্বল। ওদিকে জোতদার-মহাজন দুধে-ভাতে ছিল। আধিয়াররা নানাভাবে শোষিত হত।

এই প্রসঙ্গে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ বা ১২৬৬ বঙ্গাব্দে কোচবিহারের রাজমহিষী বৃন্দেশ্বরী দেবীর 'বেহারোদন্ত' কাব্যের একটি অংশ তুলে দিচ্ছি,—

অন্নাভাবে সব প্রজা করে হাহাকার।
দিনান্তরে কিছুমাত্র না মিলে আহার ॥
জঠর জ্বালাতে মরে করিয়া হুতাশ।
ছাড়য়ে বনিতা নিজ পতিগৃহবাস ॥

অথচ পথ কী তা অজ্ঞাত ছিল। অসংগঠিত সংগ্রামে বারবার রক্ত ঝরেছে। এবার কৃষক সমিতি গঠিত হওয়ায় মূক নির্যাতিত কৃষক রুখে দাঁড়াতে শুরু করে।

কৃষক সমিতি গঠিত হবার পর ১৯৩৯ সালে অন্যায়ভাবে তোলা আদায় ও গাণ্ডি (খাজনা) আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। তারপর শুরু হয় আধিয়ার আন্দোলন। বস্তুত মুষ্টিমেয় জমিদার/জোতদার ছাড়া বেশিরভাগ মানুষ ছিল আধিয়ার বা ভূমিহীন কৃষক। এবার দাবি উঠল কর্জা ধানের সুদ নাই। নিজের খোলানে ধান তোল, বেআইনি আদায় বন্ধ কর।

সারা এলাকা উদ্বেল হয়ে ওঠে। কৃষক আধিয়ার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাধব দত্তের ভলান্টিয়ার বাহিনী জোতদারের যম হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় এক বক্তব্য চালু হয়—দুই কৃষক নেতার নামে:

মাধবের লাঠি
গুরুদাসের বুদ্ধি!

ওই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডাঃ শচীন দাশগুপ্তের একটি বক্তব্য সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ:

"জলপাইগুড়ি জেলার আগেই তৈরী হয়ে গেছে রংপুর ও দিনাজপুরের কৃষক সমিতি। কিন্তু ঐ জেলাগুলির কৃষক সমিতি তৈরী হয়েছিল কংগ্রেস কমিটির পাশাপাশি, সহযোগী হিসাবে। কৃষক সমিতিতে প্রাধান্য পেয়েছিল ধনী ও মধ্যবিত্ত কৃষকেরা। সংগঠনের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল মূলত প্রচার-কার্যের মধ্যে। উত্তর বাংলার কৃষি, অর্থনীতি যাদের কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়ে, সেই আধিয়ারদের উপর শোষণের সঠিক চিত্র তুলে ধরে। তার ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনার যে চিন্তা, তা কখনোই জাগ্রত হয়নি সেখানকার সমিতি নেতৃত্বের মধ্যে।"

দাশগুপ্তের এই শ্রেণী বিশ্লেষণ আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার আন্দোলনের বিশেষ দিকটির দিকে টেনে নিয়ে যায়—যাকে বলতে হবে শ্রেণী সংগ্রাম। আধিয়ার আন্দোলনের সময় প্রাদেশিক নেতৃত্বের শঙ্কা ছিল শহরের মধ্যবিত্তরা এর পক্ষে কখনই যাবে না। বরং বাধা দেবে। জলপাইগুড়িতে কিন্তু তা হয়নি। তার মূল কারণ শহরের উকিল, ডাক্তার বা চা-করদের ভিত্তি জমির উপর নির্ভরশীল ছিল না।

জলপাইগুড়ি জেলা থেকে বিভক্ত অঞ্চলের আন্দোলন তেভাগাতে গিয়েছিল। কিন্তু সে ইতিহাস আমরা বলছি না। আমরা তিস্তার পূর্ব পারে চলে আসতে চাই এবং সেখানকার তেভাগার সংগ্রামের কথাই জানাতে চলেছি।

অপর পারের এলাকা খাসমহল এলাকা। দুয়ারবাসী কৃষকের দুরবস্থা বিষয়ে চারুচন্দ্র সান্যাল এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

"কি ভাই ধূপগুড়ির বড়ো দেউনিয়া, কি সমাচার? তোমার রাজ্যের নাম তো খাসমহল? তোমরা তো খাস গবর্নমেন্টের প্রজা—ভারি সুখ তোমাদের"।

"নগেন, তোমরা তো জমিদারের অধীনে ভালোই আছ। আমাদের দুয়ারের লোকদের দুরবস্থা তো জানো না, তাই এত কথা!

"জমির স্বত্ব নাই, সবই মেয়াদী পাট্টা। খাজনা বাকী হ'লে নালিশের কারবার নাই। একেবারে নীলাম। ঘর-বাড়ি করতে হ'লে হুকুম চাই। নিজের ইচ্ছায় নিজের জমিতে ঘর করতে পারি না। কথায় কথায় জমি খাস। খাজনার তো কথাই নাই। অল্পদিন আগে জরিফের পর যা খাজনা বেশি হয়েছে তাতে আমরা প্রায়ই জমি ছেড়ে দিয়ে আধিয়ার হয়ে যাচ্ছি। খাস জঙ্গলে একবার গোরু, মোষ গেলেই জরিমানা, রেল লাইনের ধারে ঘাসে মুখ দিলেই খোঁয়াড়। তোমাদের যেমন প্রজাস্বত্ব আইন আছে। আমাদের কিছুই নাই। এ বিষয়ে কংগ্রেসের তরফ থেকে খুব চেষ্টা হয়েছিল যাতে তোমাদের প্রজাস্বত্ব আইনের সুবিধা আমরা পাই। দুঃখের কথা কি বলব, আমাদের মুসলমান, তোমাদের ক্ষত্রিয় সমিতির সভারা এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে।"

চা বাগানের এলাকায় দাঁত ফোটানো যেত না। তার পরিষ্কার চিত্র চারুচন্দ্রের এই সব কথার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। একই সঙ্গে দেখতে পাই কংগ্রেস কিছু গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে গেলেও ধনী মুসলমান ও ক্ষত্রিয় সমিতি (যা জোতদারদের কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছিল) স্বশ্রেণী স্বার্থে তার বিরোধিতায় ছিল।

অথচ জলপাইগুড়ি মূল শহরে কংগ্রেসের ও চা-করদের মধ্যে জমির সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যা কম থাকায় জমি ও কৃষক বিষয়ে তাঁদের চিন্তা ভিন্ন প্রকারের লক্ষ করা যায়। কংগ্রেস সম্মেলনের সময় যে-সব প্রস্তাব নেওয়া হয় (১৯৩৯ সনের ৩, ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন) তার মধ্যে ছিল:

"(ক) এই সম্মেলন আরও দাবি করিতেছে যে, নিপীড়িত ও দরিদ্র কৃষকগণের দাবি-দাওয়া ও অভিযোগ দূর করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা ও সর্বপ্রকার জমিদারী প্রথা রহিত করা হউক।

(খ) পাট চাষী ও চটকলের শ্রমিকদের সংগ্রামে সাহায্য করার প্রস্তাব নেওয়া হয়।

(গ) খাসমহলের প্রজাগণের, ফরেস্টের সন্নিকট বাসিগণের ও চা বাগানের শ্রমিক এবং নিম্ন-কর্মচারীগণের অশেষ দুঃখ দুর্গতি......দূরীকরণার্থেও তাহাদিগকে যথাযোগ্য ন্যায্য অধিকার ও সুবিধা দানার্থ খাসমহলের নিয়ম কানুন সমূহ ও ফরেস্ট সংক্রান্ত আইন সবিশেষ সংশোধন ও পরিবর্তন এবং চা বাগান সম্পর্কে নূতন আইন বা নিয়মকানুন প্রণয়ন করা হউক।

(ঘ) কম্যুনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী সম্বন্ধীয় প্রস্তাব নেওয়া হয় ইত্যাদি।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ওই রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে এসেছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী, বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মুজাফ্‌ফর আহম্মদ প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতারা। সোমনাথ লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯ তারিখে জলপাইগুড়ি জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনী কমিটি গঠন করা হয় ৩ জন সভ্য—বীরেন্দ্রনাথ দত্ত (প্রথম সম্পাদক), গুরুদাস রায় এবং ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

ঠিক ওই সময়ে ৫ ফেব্রুয়ারি মাধব দত্তের নেতৃত্বাধীনে ভলান্টিয়ার বাহিনী কুচকাওয়াজ শিখে এক বিশাল কৃষক বাহিনী নিয়ে বোদা ও পচাগড় থেকে কংগ্রেস সম্মেলনে উপস্থিত। বোদার নেতৃত্ব দেন অনাথশরণ গৌতম।

অন্যতম নেতা ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছিলেন :

"ইতিমধ্যে জগদিন্দ্র নগরে কৃষক সমিতির এক ক্যাম্প অফিস তৈরী হয়েছে—লালঝাণ্ডা ও কৃষকদের দাবি-দাওয়া সম্বলিত পোস্টারে সাজানো। কয়েক হাজার কৃষকের মিছিল শহরে পৌঁছেই লালঝাণ্ডা সামনে রেখে কলকাতা থেকে আসা বামপন্থীদের এক ব্যাণ্ডপার্টি বাজিয়ে মিছিল শুরু হল। জলপাইগুড়ি শহরে লালঝাণ্ডা নিয়ে কৃষক মিছিল এই প্রথম। হাজার হাজার কৃষকের মিছিল সম্মেলনের মণ্ডপের সামনে হাজির হল—কৃষকের দাবি-দাওয়ার আওয়াজে চারি দিব মুখরিত হল। সম্মেলনের কর্মকর্তারা কৃষকদের সম্মেলনে ঢুকতে বাধা দিলেন—ধার্য দুই আনা দর্শনী ছাড়া সম্মেলনে ঢোকা যাবে না। কৃষকের দাবী তুলল দর্শনী ছাড়াই কৃষকদের ঢুকতে দিতে হবে—কংগ্রেসে উপস্থিত বামপন্থী নেতারা কৃষকের পাশে এসে দাঁড়ালেন, সম্মেলন মণ্ডপ প্রায় ফাঁকা—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে দর্শনী ছাড়াই কৃষকদের ঢুকতে দিতে বাধ্য হলেন। হাজার হাজার কৃষক। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে তাদের দাবী আদায় করে নিল, কৃষক সমিতির প্রথম জয় হল। কৃষক সমিতি কৃষকদের মধ্যে পরিচিতি লাভ করল। মাধববাবু সর্ব সময়ের কংগ্রেস কর্মী থেকে সর্ব সময়ের কৃষক কর্মীতে রূপান্তরিত হলেন।"

সেই সমবেত কৃষকদের সামনে তেজস্বী বক্তা বঙ্কিম মুখার্জী ভাষণ দিলেন। ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ির প্রাচীন সাপ্তাহিক) পত্রিকায় লেখা হ'ল ভাষণের সময় কৃষকদের অশ্রু বিসর্জন দেখেই বোঝা গেল তারা কী চায়। কৃষকরা সবাই রাজবংশী-বঙ্কিমবাবুর খাঁটি বঙ্গভাষার ভাষণের জন্য তাঁরা একবাক্যে বলেছিলেন-উমরা বকে ভাল্।

এর পর ১৮ জুলাই ১৯৩৯ সালে ময়দানদিঘিতে প্রথম জেলা কৃষক সম্মেলন হয় এবং কমরেড আবদুল্লাহ্ রসুল তাতে ভাষণ দেন। চারুচন্দ্র সান্যাল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে রসুল সাহেব কী বলেন তা জানতে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য যে কংগ্রেস-বিরোধী নয় তা বলেন।

অর্থাৎ কৃষক ফ্রন্টে কংগ্রেস লক্ষ করল এক নতুন শ্রেণী-সচেতন সংগঠনের জন্ম হচ্ছে এবং গ্রাম বাংলায় তারা এগোচ্ছে।

ইতিমধ্যে কৃষক সমিতির জয়, লাঙল যার জমি তার, জমিদারি প্রথা ধ্বংস হউক, কৃষকের গান্ডি নাই, নিজ খোলানে ধান তোল ইত্যাদি দাবিতে গ্রাম-জলপাইগুড়ি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তা বাধা দেবার জন্য নবাব মুছারফ হোসেন, ক্ষত্রিয় সমিতি, জোতদারেরা একত্রিত হয়েছে বারবার।

পূর্বে বলেছি ১৯৪৬ সনে কমিউনিস্ট পার্টি দুয়ার্সে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য বীরেন নিয়োগী ও চারু মজুমদারকে পাঠায় এবং তাঁরা কংগ্রেস নেতা যজ্ঞেশ্বর রায়ের বাড়িতে আস্তানা গড়লেন। যজ্ঞেশ্বরবাবুর অতি বৃদ্ধ পিতা মশারির মধ্যে থাকতেন এবং স্বাধীনতা পত্রিকা পাঠ করে শোনালে বৃদ্ধ বলতেন—সব লাল হয়া যাইবে অর্থাৎ সবাই কমিউনিস্ট হয়ে যাবে।

রেল শ্রমিকরা লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছেন। কমিউনিস্ট কর্মীরা গ্যাংম্যান, শ্রমিকদের নিয়ে এক বিশাল কর্মকাণ্ডে নেমেছেন। রেলের হাত ধরে মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন, সোভিয়েত রুশ, মহাচীনের লড়াই সব বার্তা দুয়ার্সের আনাচে কানাচে পৌঁছে গেছে। লাল ঝাণ্ডা এক পৃথক মর্যাদা পেল গরিব আদিবাসীদের কাছে। পাহাড়ে রতনলাল ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে লাল ঝাণ্ডা এগিয়ে এসেছে। গান তৈরি হয়েছে নেপালি ভাষায়—

ইনকিলাব জিন্দাবাদ
লাল ঝাণ্ডা জিন্দাবাদ
হামরো ঝাণ্ডা লাল হো
ইনকিলাব গান হো

নেপালি চা শ্রমিকরা এগিয়ে এল। এল আদিবাসী চা-শ্রমিকরা। চা বাগান খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেই ১৮৫৬ (দার্জিলিং), ১৮৬৩ (তরাই), ১৮৭৪ (জলপাইগুড়ি) থেকে নেপালি (ব্রাহ্মণ, ছেত্রী, গিরি, শর্মা, রাই, লিম্বু, সুব্বা, তামাং, গুরুং, মগর, নেওয়ার প্রভৃতি) ও ছোটনাগপুর-সাঁওতাল পরগনা থেকে ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতালি, মহালি, গেড়িয়া, কোরা, ভূমিজ, নাগেশিয়া, মালপাহাড়িয়া, হো প্রভৃতি জনজাতি জমি ও খাদ্যের আকর্ষণে চা বাগানে এসে দেখল :

ঝিটিমিটি চাঙ্গ সৈইয়া
চলতো ভোটাং রে
টোকরি ফাড়ুয়া নসিবে লিখলো

দুয়ার্স অঞ্চল ছিল ভোটদেশ, হারিয়ে যাবার দেশ। অত্যাচারে, রোগে, জন্তুদের আক্রমণে, বন্যার প্রতাপে মানুষ তখন প্রতিদিন বাঁচা মরার লড়াইয়ে যুক্ত। এখানে এসে গরিব মানুষরা দেখল—চাঁদ আকাশেই থাকে। সুখ-জমি-খাবার তেমনি ধরাছোঁয়ার বাইরে।

জন্ম থেকেই তারা লড়াইয়ে অভ্যস্ত ছিল। সে-সব আদি লড়াইয়ের সংবাদ জেলের কাগজ খুঁজে আদিবাসীদের নাম দেখে বের করার জন্য কষ্টসাধ্য গবেষণার প্রয়োজন। এর একটি প্রবল আকার ধারণ করে—তা ওঁরাওদের মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় টানা বাবার সংগ্রাম নামে খ্যাত। চা বাগানের সাহেবরা চঞ্চল হয়ে ওঠে-বিপদ দেখে সৈন্যের সাহায্য কামনা করে। পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ করি গণনাট্যসংঘের সঙ্গীতের আদলে গান তৈরি হয়েছে!

হামার দেশমে আইকে
লোহুকে পানি খাইকে
পয়সা কামালি
হায় হায় রে
ওহি পয়সামে বাঙ্গেলা বানাইলি
মজদুর রহলো ভাঙা ঘরমে।

গানটি ট্রামশ্রমিকের লিখিত বিনয় রায় দ্বারা মালবাজারে গীত গানের অনুকরণে—

হামারা দেশমে আকে
হামারা পয়সা খাকে
আঁখ না দেখানা—

গানটি তিনি ১৯৪৬ সনে মালবাজার এলাকায় গাছের উপর লাল ঝাণ্ডা তুলে গেয়েছিলেন। (*সুবোধ সেনের স্মৃতি*) এতদিন গান ছিল

বাবুঘরের ছোকরী
আলা করে নোকরী
সদার বলে কাম কাম
বাবু বলে ধরে আন
হায় হায়রে বিধি
ফাঁকি দিয়ে ভেজালি আসামা বাগান

এবার প্রতিবাদী গান শুরু হ'ল। রেলের আন্দোলন, তার জয়ে চা বাগানের শ্রমিকও উঠে দাঁড়াল। লাল ঝাণ্ডা চা-শ্রমিক ও রেল শ্রমিক-সহ কৃষকের আঙিনায় পৌঁছে গেল। দুয়ার্সে ১৯৪৬ সনে ৩০টি চা-বাগানের শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রথম চা-শ্রমিক সংগঠন গড়ার প্রচেষ্টা হয় লাল ঝাণ্ডার নেতৃত্বে এবং ওই সম্মেলন থেকে নানান দাবি চা-করদের দুয়ার্সে ইংরেজদের সংগঠন ও জলপাইগুড়িতে ভারতীয়দের সমিতিকে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে সঙ্গেই এই দুই সমিতি-বিদেসি ইংরেজ ও ভারতীয় চা-করেরা (যাঁরা কংগ্রেস বা মুসলিম লিগের সমর্থক ছিলেন) বুঝতে পারলেন—

শোষণের চাকা আর
ঘুরবে না ঘুরবে না

রেল শ্রমিক গড়ে উঠেছে। চা-শ্রমিক সেই ছত্রতলে নতুন করে ভাবছে—সারা ভারতে বিদেশিকে হটাবার বিশাল গণসংগ্রাম চলার মধ্যেই ইংরেজ তার পথ খুঁজে বের করে নিল। তা হ'ল হিন্দু মুসলিমকে বিভক্ত করো। দুইটি সম্প্রদায়ের বুর্জোয়া—জমিদারদের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ স্বার্থে দুই ধর্মের মধ্যে লড়াই বাধাল। এল সেই ১৯৪৬-এর ভয়ঙ্কর কলকাতা, নোয়াখালির দাঙ্গা। সমস্ত সংগ্রামী জনতাকে একেবারে বিভক্ত করে দিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় গরিব মানুষ ধর্ম বা জাতপাতকে হেলায় তুচ্ছ করে এগিয়ে এল কৃষকের দাবি নিয়ে। মুসলিম লিগ, কংগ্রেস, ক্ষত্রিয় সমিতির সমস্ত বিভেদকারী আওয়াজ স্তব্ধ করে মিলিত হিন্দু-মুসলিম গরিব কৃষক নিজেদের রক্ত দিয়ে রুখে দাঁড়াল রক্তে বোনা ধানের অধিকার, জমির অধিকারের দাবী নিয়ে। এ সময়ে কৃষকদের এই দাবির পেছনে সর্বত্র গণতান্ত্রিক সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে সমবেত করা যায়নি, কিন্তু জলপাইগুড়িতে তা ভিন্ন চরিত্র নিল। জলপাইগুড়ি তেভাগার এই চরিত্র নিয়ে তেমন আলোচনা চোখে আসেনি।

এই বিশ্লেষণের পূর্বে আমার প্রীতিভাজন কৃষক-নেতা (পরের যুগের) জগৎ সাহার লেখা একটা চিঠির কিছু অংশ তুলে ধরতে চাই। তেভাগা দুয়ার্সে ঠিক কোন থানায় বা জায়গায় হয়েছিল?

জগতের চিঠি :

"প্রসঙ্গতঃ বলতে বাধ্য হচ্ছি যে শ্রীরণজিৎ দাশগুপ্ত জলপাইগুড়ি জেলার থানাগুলির পুনর্বিন্যাস হওয়া সত্ত্বেও মেটেলী (মাটিআলি) থানার স্থলে 'মাল থানা' কথাটা বারবার ব্যবহার করেছেন।

নেওড়া মাঝিয়ালী (শালবাড়ী) ও মাথাচুলকা মেটেলী থানার অধীনস্থ। গয়ানাথ দাসের খোলান-মঙ্গলবাড়ী মৌজা এবং গ্রামে। গয়া নাথ বর্মণ নয় দাস। এদের পূর্ব পুরুষ রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় না। মেচ সম্প্রদায়দের এদের অতীত বংশের সামাজিক বন্ধন অস্বীকার করা যায় না। ভোদলা মহম্মদের (দেউনিয়ার) খোলান ছিল শালবাড়ী ও মাথাচুলকার সীমান্তবর্তী স্থানে। নেওড়া-মাঝিয়ালী 'পলাশীর ময়দান' খ্যাত জায়গা। তেভাগার যোদ্ধাগণ নেওড়া-মাঝিয়ালী আশ্রয় নিত।" জগৎ বিভিন্ন এলাকাতে PS স্থাপন বিষয়ে Police Administration since 1869 সম্পর্কে কিছু তথ্য পত্রে দেন :

Name of Police Station-Metteli : In pursuance of the Notification dated the 5th August 1890 Metli O.P. (out post) was created subordinate to Dadim P.S. By Notification No. 3222 J dated 11th July, 1905 the O.P. was transformed into P.S.

Dumdim : Formation on 1st July, 1888 by Notification of 25th July, 1888. In pursuance of Notification No. 4647 J dt. 27th December, 1909 [E.B. of Assam Gazette] the HQ of the P.S. was transferred to a new site at Mal. But the name was not changed. The name was changed to MAL P.S. In 1924.

MAL : By Notification No. 2911 PL dt 21st November, 1924 the name of Damdim P.S. was changed to Mal P.S.

জগৎ সাহার উপরোক্ত বক্তব্য এ জন্য দিচ্ছি যাতে পাঠক তেভাগা দুয়ার্সে ঠিক কোন থানার অধীনে কোন জায়গায় হয়েছিল তা জানতে পারেন।

দুয়ার্সের তেভাগার বিষয়ে ডাঃ শচীন দাশগুপ্তের স্ত্রী এবং কমরেড কল্যাণী দাশগুপ্ত এক বিবরণ দিয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে কল্যাণী বৌদিও সমস্ত সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন এবং বর্তমানে CPI দলের অন্যতমা নেত্রী। তাঁর একটি প্রবন্ধ 'তেভাগায় জেলার মেয়েরা' স্বয়ং শচীন্দ্রনাথ আমায় 'করতোয়া থেকে তিস্তা' কিতাবের জন্য পাঠান এবং ছোট্ট নোটে লেখেন : লেখাটি মূল্যবান। উপরোক্ত কিতাবটিতে আমি জলপাইগুড়িতে বিভিন্ন সময়ে কৃষক আন্দোলন, নেতাদের পরিচয় ইত্যাদি সংগ্রহ করে ছাপাই। করতোয়া এককালে উত্তরবঙ্গের মূল নদী ছিল। সে-সময় তিস্তার বিশাল জল করতোয়া দিয়ে প্রবাহিত হ'ত। এই করতোয়ার পারে কৃষক আন্দোলন প্রথম শুরু হয় এবং ৯ বছরের মধ্যে ইংরেজ সরকার ও চা-করদের খাস এলাকা দুয়ার্সে পৌঁছায়। শুধু কৃষক নয়। রেল শ্রমিক ও চা-বাগান শ্রমিক এবার লড়াইয়ে লাল ঝাণ্ডার আশ্রয় নিল। দুয়ার্সের এই অভ্যুত্থান পরের ত্রিশ বছরের মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক চিত্র পালটে দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে যেমন কৃষক আন্দোলন গ্রামের চেহারা পাল্টে বামফ্রন্ট এনেছে। জলপাইগুড়ি জেলাতেও তেমনি শ্রমিক কৃষক আন্দোলন সাদা [তিরঙ্গা] ঝাণ্ডাকে সরিয়ে দিয়ে 'বলদের দেশ' (কংগ্রেসের প্রতীক জোড়া বলদের থেকে উৎপত্তি) থেকে বামফ্রন্টের দেশ করেছে।

কল্যানী বৌদির লেখা এবার তুলে ধরছি :

"এবারে আসি ডুয়ার্সের কথায়। চল্লিশ দশকের গোড়া থেকেই ডুয়ার্সে রেলকর্মী ইউনিয়ন সংগঠিত হয়েছে লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে। চা-বাগান শ্রমিকদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ ঘটেছে লালঝাণ্ডার। গ্রামের তেভাগার খবর পৌঁছে গেল তিস্তাপারের এপারের এই রেল, চা-বাগান ও সংলগ্ন কৃষক এলাকাতেও কোমর বাঁধল মেয়েরাও।"

মেয়েদের ভূমিকা বিষয়ে আসার পূর্বে লেনিন সাহেবের এক বিশ্লেষণ আমরা শুনতে পারি।

"A certain bourgeois obzerver of the Paris Commune, writing to an English newspaper in May, 1871, said!" If the French nation consisted entirely of women, what a terrible nation it would be." Women and teenage children faught in the Paris Commune side by side with the men. It will be no different in the coming battles for the overthrow of the bourgeoise. Proletarian women will not look on passively as poorly armed or unarmed workers are shot down by the well-armed forces of the bourgeoise. They will take to come; as they did in 1871, and from the cowed nations of today, or more correctly from present-day labour movement, disorganised more by the opportunist than by the governments—there will undoubtedly arise, sooner or later, but with absolute certainly, an international league of the 'terrible nations' of the revolutionary proletariat."

(Military Programme of Proletarian Desolution V.I Lenin—Vol 23, Page 82)

লেনিনের উপরোক্ত মার্কসীয় বিজ্ঞানের আধারে বিশ্লেষিত বক্তব্য যেন ছবির সঙ্গে ঠাই পেল তেভাগায় নারী শিশুদের সংগ্রামে। কল্যাণী বৌদির কথায় :

"এই দৃঢ় সংগঠনের পিছনে মহিলা কর্মীদের ভূমিকা ছিল বিশেষ মূল্যবান। সেই-সব আন্দোলনে অংশ নেওয়া যমুনা ওঁরাও আজো বৃদ্ধ বয়সে বেঁচে আছেন ও লালাঝাণ্ডার কাজ করে চলেছেন।......আন্দোলন প্রথম শুরু হল ওদলাবাড়ি, ক্রান্তি, ভামভিম অঞ্চল থেকে। মহিলাদের নেতৃত্ব দিলেন বুনি কমরেডের স্ত্রী নৈহারী ওঁরাওনী, ছোটন, পোকো প্রভৃতি। নেওড়া-মাঝিয়ালীর কাছে মাথাচুলকাতেও তেভাগা আন্দোলন প্রধানও পরিচালনা করেন দুই বোন পোকো ওঁরাওনী ও মহারানী ওঁরাওনী। পরে ১লা মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে এঁদেরই একবোন (মহারানী) আরো চারজনের সাথে পুলিশের গুলিতে মারা যান তেভাগা করার সময়। গুলি চালনা ও মৃত্যুর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল চালনা মঙ্গলবাড়ির গয়ানাথের খোলাতে। ৪ এপ্রিল '৪৭, সেখানে আবার মারা গেল আরো ৯ জন তার মধ্যে একজন মহিলা, একজন ১৩ বছরের বালক।"

লেনিনের বক্তব্য কি আশ্চর্যভাবে সঠিক রূপ নিয়েছে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত সীমানায়। বস্তুত সমস্ত তেভাগার মধ্যে মহিলা-শিশুদের ভূমিকা জ্বলজ্বল করে ধ্রুবতারার মতো পথ দেখাচ্ছে। প্রসঙ্গত মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল সাহেবের শহর থেকে গ্রামের শেষাংশ উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না। নায়ক আলী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গ্রামে এসে মানুষের কাছ থেকে মালা অভ্যর্থনা পেয়েছে। তার কথাতেই কিতাবটি শেষ হয়েছে :

"মালাটি নিয়ে আবার নিজের জায়গায় বসে সে আবেগভরে পরিয়ে দিলেন শোবরাতীর গলায়। তারপর তার দুই হাত তার দুই গালে দিয়ে মুখখানা তুলে ধরে মিষ্টি হেসে বললে, মালাটা ওরা সবাই মিলে আমার গলাতেই দিয়েছেল বটে। তবে এ মালা তোরও পাওনা, তোরও এতে সমান ভাগ আছে। তাই তোর জন্যে সারাদিন যত্ন করে রেখেছিনু এটা।

শোবরাতীর চোখমুখ মধুর হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।"

অনেকের ধারণা তেভাগা বহু জায়গায় যেন আপনা থেকে হয়েছে। বস্তুত মার্কসীয় ব্যাখ্যায় তা হয় না। কিছু ইতিহাস-প্রস্তুতি পেছনে থাকবেই। কল্যাণী বৌদি সে বিষয়ে লেখেন :

"এই সব আন্দোলনের ভিত্তি কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না—এর সংগঠক ছিল লালঝাণ্ডা তথা কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা। তাই-যদিও তেভাগার আন্দোলন ছিল মূলত কৃষকদের আন্দোলন, কিন্তু রেল শ্রমিক বা চা-বাগান শ্রমিকদের এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ বা নেতৃত্ব দিতে ইতস্তত করতে হয়নি। কারণ এই আন্দেলন ছিল মূলত শোষণ তথা অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ছিল সাম্রাজ্যবাদেরও বিরুদ্ধে ; কারণ চা-বাগিচার মালিকেরা বেশিরভাগই বিদেশি, জোতদাররাও ছিল ওই বিদেশি শক্তির তাঁবেদার। তাই বাংলা দেশের কোথাও যা হয়নি, এখানে, এই ডুয়ার্স এলাকায় দেখেছি কৃষক-শ্রমিক মহিলা-পুরুষ একসাথে শোষকের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ মালিকের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে সংগ্রামে নেমেছে। সে সংগ্রামে ব্রিটিশ মালিকদের শহর থেকে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তও নিতে হয়েছিল।"

শ্রীমতী দাশগুপ্ত একটা বিশেষ দিক তুলে ধরেছেন তা কৃষক-শ্রমিকের মিলিত সংগ্রাম। মহিলা-পুরুষ একই সাঙ্গে সর্বত্র সংগ্রামে ছিল কিন্তু শ্রমিকের অংশ গ্রহণ, চা-বাগান ও রেল-শ্রমিকের, জলপাইগুড়ির দুয়ার্সে আমরা লক্ষ করলাম। এটা তেভাগার একটা বিশেষ দিক। সেটা বঙ্গে অন্যত্র হলে তা জাতীয় বিপ্লবে পরিণত হতে পারত। কিন্তু সে সময় জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলন কৃষকদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি, ফলে কৃষক মার খেল।

কল্যাণী বৌদির প্রতিবেদনে আমরা পাই অসমসাহসিনী মা বোন-ভগ্নিদের এক বিপ্লবী কর্মকাণ্ড।

"৪ এপ্রিল '৪৭-এ বড়ো জোতদার গয়ানাথের খোলানে তেভাগা করার আগে আরো অনেক জায়গায় কৃষক-শ্রমিক মিলিতভাবে

সাফল্যের সাথে তেভাগা কায়েম করেছিল। অধিকাংশ জায়গাতেই মেয়েরাও নিয়েছিল অগ্রণী ভূমিকা। যেমন নেওরা-মাঝিয়ালীর বড়ো বিরশার মেয়ে পোকো উরাইন, লাল শুকরার, (বড়ো বিরশার ভাতিজা) বোন চুন্দিয়া উরাইন প্রভৃতি। তখন এদের বয়স ছিল ১২ থেকে ২৫-এর মধ্যে। পোকো জানাল— ওদের যাকে প্রায় ২০০ মেয়ে ছিল—এরা মিছিল করে তেভাগায় যেত ...একদিন সমর গাঙ্গুলী (কৃষক সভার সম্পাদক) এক বাড়িতে আশ্রয় নেবার সময় খবর পেয়ে পুলিশ হাজির। মেয়েরা চটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে বাড়ির বাইরের দিকের একটা ভাঙ্গা গোয়ালঘরে আগুন দিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। পুলিশ ভয় পেয়ে সমরকে না নিয়েই পালিয়ে যায়—সমরও সেই ফাঁকে সরে পড়ে। আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ঐ অঞ্চলের ঝিরিখডাঙায় তেভাগার সময়ে পুলিশের সঙ্গে যে সংঘর্ষ হয় এবং কয়েকটি রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া হল—তার মধ্যে মেয়েরাও ছিল। পরে দোমহনী থেকে পার্টির নির্দেশে ঐ রাইফেলগুলি জলে ফেলে দেওয়া হয় বা ভেঙ্গে ফেলা হয়।"

এই রাইফেল ছিনতাই এবং ভেঙে ফেলার ঘটনার সময় দোমহনীতে জ্যোতি বসু উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তখন পার্টি সম্পাদক। তিনি আমায় বলেছিলেন—"আমরা তো জমির আন্দোলন করছি, তেভাগার—রাইফেল বন্দুক নিয়ে কী করতে হবে তা আমরা ভাবিনি।

তেভাগার পূর্বে ভলান্টিয়ার বাহিনী তৈরী হয়। বিভিন্ন হাটে প্রচার ও হাট মিছিল হত। স্লোগান ছিল—'আধি নাই, তেভাগা চাই'। সাঁওতাল বিদ্রোহ, বীরসা মুণ্ডার সংগ্রাম, টানা বাবার সংগঠন—সংগ্রাম ওই অঞ্চলের আদিবাসী অধিবাসীদের রক্তে ছিল—যেমন ছিল করতোয়া পারের কৃষকদের মধ্যে রংপুরের ১৭৮৩ খ্রিঃ কৃষক বিদ্রোহ। আদিবাসীর স্বাভাবিক অস্ত্র তীর, ধনুক, টাঙ্গি ইত্যাদি এদের সঙ্গে সব সময় থাকত। কিন্তু তারা প্রথম কখনও তেভাগার ন্যায্য দাবি তোলা ছাড়া কিছু করেনি। জোতদার ও সরকারই নিজ স্বার্থে আক্রমণ চালালে কৃষকরা বাধ্য হয়ে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। ইংরেজ চা করদের ভূমিকাও কিছু কম ছিল না।

তেভাগার প্রাক্কালে ১৯৪৭ খ্রিঃ ১ মার্চ দোমহনীতে বেঙ্গল আসাম রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভা ছিল। পূর্বদিন মালবাজারে মিটিং হয়। আদিবাসী কৃষকদের আবেদন ছিল, একঠো ঝাণ্ডা দিজিয়ে। হাতে লাল ঝাণ্ডা নেবার পর তাদের বলা হয়, "দোমহনীমে মিটিংমে যাইয়ে।" ওরা সেই সভাকে জনসমুদ্র করেছিল। মায়েরা পিঠে বাচ্চা নিয়ে চলেছেন। হায় হায় পাথার চা বাগান থেকে কমরেড জগন্নাথ ওঁরাওয়ের নেতৃত্বে বহু শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। [কমরেড জগন্নাথ বর্তমানে সি. পি. আই (এম)-এর এম. এল. এ] ওই দিনই নেওড়া মাঝিয়ালীর এক জোতদার ভেদেলু দেউলিয়া (আতাহারউদ্দিন) তার আধিয়ারকে খবর দেয় ধান ভাগ করে নেওয়ার জন্য। খবর পেয়ে আধিয়ারেরা জোতদারের খোলানে জড়ো হয় এবং ধান ভাগ করতে গেলে জোতদারের বাড়ির ভিতর থেকে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৫ জনকে হত্যা করে।

(তেভাগা সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৯৯৭ সাল)

এই কুৎসিৎ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ দোমহনীতে এলে সমবেত কৃষক-শ্রমিক জনতা ক্রোধে গর্জে ওঠে। স্লোগান তোলা হয়—

বিলাতী মালিক লণ্ডন ভাগো

জমিদারী খতম কর

তেভাগার দাবী মানতে হবে।

সভার প্রধান বক্তা ছিলেন আজকের বামফ্রন্টের পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসু। তিস্তা, করতোয়া, নেওড়া, জলঢাকার জল একদিনে সাগরে পৌঁছায়নি। দীর্ঘ রক্তাক্ত পথ পরিক্রমা করে তা জনতার গণসংগ্রাম সাগরে ঢেউ তুলেছে; তৈরি হয়েছে বামফ্রন্ট যা দীর্ঘ ২০ বছর দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে—কৃষকের শ্রমিকের মেহনতী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। কৃষক এভাবেই তার রক্তে দেশমাতৃকার বেদী ধুয়ে সাফ করেছে—সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের সহযোগী জমিদার জোতদার ও ধনী সম্প্রদায়কে শাসনক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করে।

১৯৪৭ সনের ৪ এপ্রিল দুয়ার্সের ইতিহাসের আর একটি রক্তক্ষরা দিন। নেওড়া মাঝিয়ালীর পাশে বালাগোবিন্দর মাঠ কৃষকরা নাম রেখেছিল পলাশীর মাঠ। ওই গ্রামের কৃষক হপনা মাঝি একটি কাগজে পলাশীর মাঠ লিখে টাঙ্গিয়ে দিয়েছিল। হপনা নামটি সাঁওতাল পরিবারের ছোট ছেলেকে আদর করে দেওয়া হয়। হপনা বই পড়ে জানতে পারে পলাশীর মাঠে লর্ড ক্লাইভের বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছিল। কৃষকরাও তেমনিভাবে লড়বে—তেভাগা আদায় করতে।

মঙ্গলবাড়ী হাটের কাছে চালসা এলাকায় মহাবাড়ী গ্রামে ওয়ানাথের খোলানে ধান ভাগের সময় পুলিশ আবার গুলি চালিয়ে ৪ এপ্রিল ৯ জনকে হত্যা করে। এমনি করে দুয়ার্সের নতুন পলাশীতে রক্ত দিয়ে প্রমাণ করল—দেশের মুক্তি সংগ্রামে তারাও রক্ত দিতে প্রস্তুত।

এই গুলি চালাবার উপর সে সময়ে স্বাধীনতা পত্রিকাতে নরেশ চক্রবর্তী (কৃষক ও কমিউনিস্ট নেতা এবং উকিল) এক প্রতিবেদন পাঠান। শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ওই প্রতিবেদন সম্বন্ধে লেখেন—

"নরেশের নেতৃত্বে জলপাইগুড়ি শহরের উকিল ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের নিয়ে এক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। তদন্তের শেষে ফিরে এসে তাঁরা পুলিশের তাণ্ডব ও কৃষকদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণের এক রিপোর্ট পেশ করেন। আর 'স্বাধীনতা' কাগজে বের হয় নরেশের এক রিপোর্ট। রিপোর্ট ছিল ছবির মতন। একদিকে রক্তলোলুপ পুলিশের নৃশংসতা, অন্যদিকে শঙ্কাহীন আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান সাধারণ নারীপুরুষের বলিষ্ঠতা সেই রিপোর্টের প্রতিটি ছত্রে ফুটে উঠেছিল। একদিকে সুতীব্র ঘৃণা আর অন্যদিকে এক মমতা-ভরা বেদনা—সে এক অদ্ভুত সমন্বয়। আন্দোলনের মধ্যে থেকেই লড়াইয়ের একজন হয়েই—এ ধরনের রিপোর্ট লেখা সম্ভব।"

এই রিপোর্টের কিছু অংশ সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলার 'তেভাগা'—তেভাগার সংগ্রাম—জয়ন্ত ভট্টাচার্যের কিতাবে দেওয়া হয়েছে। আমরা সেটা প্রবন্ধে তুলে ধরব। তার পূর্বে সে সময় যে-সব প্রতিনিধি তদন্তে গিয়েছিলেন তাঁদের কথা বলছি। একজন ছিলেন আনন্দচন্দ্র কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক সন্তোষ কুমার বটপাল।

তিনি পরে জেলা গণনাট্য সংঘের সভাপতি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক গঠনে সাথে যুক্ত ছিলেন। গিয়েছিলেন চিকিৎসক শৈলেশ ভৌমিকরা।

অধুনা কলকাতায় থাকেন অধ্যাপক বটব্যাল। ছাত্ররাও যান এবং একদিন শহরে ছাত্র ধর্মঘট হয়। এটা অন্যত্র কোথাও হয়নি। কংগ্রেস থেকে খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তরা যান এবং তাঁরাও ওই গুলির নিন্দা করেন। বস্তুত গণতান্ত্রিক চেতনার মানুষ সবাই কৃষকদের পক্ষে দাঁড়ান। একমাত্র চা-করেরা কিঞ্চিৎ ভিন্ন মতের ছিলেন। নবাব ভ্রাতা মুকলেচ্ছের রহমান গুলির সংবাদে উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন—মারি ফেলাও কমিউনিস্টদের [জেলা শহরের কমিউনিস্ট নেতা সুবোধ মিত্র বিষ্ণু মোক্তারের বাড়িতে গেলে রহমানকে ওই বক্তব্য বলতে শোনেন এবং করতোয়া থেকে তিস্তা কিতাবের প্রকাশ-দিনে আমায় বলেন]।

এবার আমরা কৃষকনেতা নরেশ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন প্রকাশ করছি :

স্বাধীনতা—১১ই এপ্রিল, ১৯৪৭

"৪ঠা এপ্রিল, রাত দশটায় পুলিশ নয়টি মৃতদেহ ও দুইজন আহত কৃষককে সদর (জলপাইগুড়ি) হাসপাতালে লইয়া আসে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সারা শহরে খবর ছড়াইয়া পড়ে—মেটেলি থানায় পুনরায় গুলি চালিয়েছে। হাসপাতালে গেলাম।

আহতদের মধ্যে তের বছরের একটি বালককে দেখিলাম। তখনও সংজ্ঞাহীন হইয়া আছে। অপরজন জনৈক কৃষক ভলান্টিয়ার। তখনও তার অল্প অল্প জ্ঞান ছিল। বারবার সে বলিতেছিল, আমাদের উপর 'পানির' মতো গুলিবর্ষণ করা হইয়াছে।......

গুলিচালনার সংবাদ শহরে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ছাত্ররা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া হাসপাতালে ছুটিয়া আসে। স্কুলের মেয়েরা স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া আসে শহীদদের দেখিবার জন্য। ঐদিন ব্যক্তিস্বাধীনতা সংঘের শ্রীসবোধ বসু [সেন হবে—ইনিই পরে CPI(M)-এর জেলা সম্পাদক হন] এবং একটি সর্বদলীয় ছাত্র-প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল অভিমুখে রওনা হন। পরদিন জেলার কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু-মুসলমান চিকিৎসকও তদন্তে যান। সাংবাদিক হিসাবে আমিও ইহাদের সঙ্গে ছিলাম।

মেটেলী থানার মঙ্গলবাড়ি হাট হইতে দুই মাইল দূরে জোতদার গয়ানাথ দাসের বাড়ি। চারিদিকে বিস্তীর্ণ জঙ্গল। মাঝে মাঝে আবাদী জোত আর চা-বাগান। গয়ানাথ বড় জোতদার—তিনশত হালের জমি তাঁহার (এক হালে ১২ বিঘা) আধিয়ারের সংখ্যাও প্রচুর। রাজবংশী সাঁওতাল আর পাহাড়িয়া আধিয়ার। তেভাগা আন্দোলনের ঢেউ বন-জঙ্গল ভেদ করিয়া এখানেও চলিয়া আসিয়াছে।

জোতদার প্রথমত দাবি মানিতে অসম্মত হইয়াছিল। কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ (লক্ষ্য করা দরকার স্থানীয় রাজবংশী, আদিবাসী এবং পাহাড়ী কৃষক) অটুট সঙ্কল্প। এলে ধান জোতদারের খোলানে উঠবার পর আড়াই মাস ঝাড়াই বন্ধ থাকে। এদিকে পুঁজি করা ধানে শীষ গজাইতে শুরু করায় অন্য উপায় না দেখিয়া জোতদার অবশেষে কৃষকদের সহিত আপস করে এবং ঘটনার অল্প কয়েকদিন পূর্বে ধান মাড়াই শুরু হয় [অর্থাৎ কৃষকরা এতো সঙ্ঘবদ্ধ ছিল যে আড়াই মাস তক্ কেউ জোতদারের পক্ষে যায়নি]।

ধান গাদাজাত করার বেশ কিছুদিন ও মাস পার হবার পর কৃষক ও আধিয়ারদের দাবি মেনে নিল্ জোতদার গয়ানাথ দাস। তেভাগা আন্দোলন উত্তাল। ১৯৪৭ সালের ২৮শে মার্চ গয়ানাথ দাস তেভাগার দাবি স্বীকার করে ৯ জন আধিয়ারের ফসলের তিন ভাগের দু'ভাগ মেনে নিয়ে তাদের ভাগ বুঝিয়ে নিজের ভাগ নিলেন। এপ্রিলের ২-৩ তারিখে মল্লিক দাস, সুচারু দাস, কর্ণধর রায়, মুনি দাস প্রমুখ আধিয়ারের ও আরও ৭ জনের তেভাগা দিয়ে ধান মাড়াই হলো। [উপরোক্ত নামগুলি সব রাজবংশী সম্প্রদায়ের। তবে কি গয়ানাথ রাজবংশীদের দিয়ে আদিবাসী পাহাড়ী জোটকে ভাঙ্গতে চেয়েছিল?] বাকি যারা ছিল তাদের ধান মাড়াই হবার দিন ছিল ৪ঠা এপ্রিল। আধিয়াররা গ্রামের লোকের সাহায্য চাইল—এদিনই সব ঝাড়াই-মাড়াই শেষ করতে হবে। আকাশে সূর্য ওঠার আগেই ভলান্টিয়ার ও আধিয়াররা খোলানে এসে গিয়েছেন। সংখ্যায় পাঁচ-ছয়শত কৃষক। খেতমজুর ও আধিয়ারের উপস্থিতিতে জোতদারের খোলান মুখরিত। বেলা নটা। দারুণ উৎসাহের সঙ্গে ধান ঝাড়াই-মাড়াই চলছে—একেবারে হঠাৎ করেই তিন লরি সশস্ত্র পুলিশ এসে হাজির হলো। সঙ্গে রয়েছেন স্বয়ং মহকুমা শাসক। পুলিশের সার্কেল ইন্সপেক্টর এবং মেটেলি থানার পুলিশ অফিসার।

"কৃষকেরা তখন আপন মনে তাহাদের কাজ চালাইয়া যাইতেছিল। হঠাৎ শোনা গেল বিউগিলের আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসিতে লাগিল খোলানের ভিতরে—খোলানের চারিদিকে। যে যেখানে পারিল শুইয়া পড়িল—পলাইবার পথ নাই। সামনে জোতদারের বাড়ি। ডানদিকে খড়ের গাদা, খোলানের সর্বত্র পোয়াল (ধানের খড়) পুঁজি—পলাইবার পথ আটক করিয়া রাখিয়াছে। পিছনে ৬ ফুট নিচে আবাদী ক্ষেত্র সেখান হইতে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।"

কৃষকরা সরল বিশ্বাসে এসেছিলেন। জোতদার ও তার রক্ষক পুলিস এমনি করে নিরস্ত্র মানুষদের পাখির মতো গুলি করে সেদিন মেরেছিল এবং কংস উল্লাসে ভেবেছিল তারাই নতুন সূর্যকে উঠাতে বা অস্ত দিতে পারে। কিন্তু 'দিন এসে গেছে ভাইরে-লাঙলের ফালে আগাছা উপরে ফেলবার—'।"

এই গয়ানাথ, লালশুকরা এরা অনেকেই সাহিত্যিক দেবেশ রায়ে 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' কিতাবে স্থান পেয়েছেন। গয়ানাথ সেখানেও জোতদার কিন্তু তেভাগার লালঝাণ্ডার প্রবাদপুরুষ দেবেশ রায়ের লেখনীতে লাল শুকরা হয়েছেন এক মদ্যপ মাতাল। তাঁর বৃত্তান্তে—লাল শুকরা খুব রোগা মনে হয় যেন হাঁটতে গেলে পড়ে যাবে। তার উপর সকালেই হাড়িয়া খেয়েছে। নেশা বা শরীরের জন্যেই তার পা ঠিকমত পড়ছিল না। কিন্তু সেই টলমলে পায়ে ঘরঘর গলায় সে বলে যাচ্ছিল, জলুশ হবেক। জোলুশ হোবেক। দেখে মনে হতে পারে, জলুশের কথাটা তার নেশার কথা।

দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ লিখেছিলেন চাষীকে, লড়াকুকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে। আমাদের দেশের এক নামী দামী বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক এক কিংবদন্তির নায়ককে করলেন নেশাখোর মাতাল। লাল শুকরার কথাও তেভাগাতে এসে যায় কারণ তিনিও তার নেতৃত্বে ছিলেন। বড়ো বিরশার ভাতিজা, স্বর্ণময়ী (শহিদ) পোকোদির দাদা আজও দুয়ার্সে এক মান্য নাম, তেভাগার নানান সভায়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পূর্বভাগে প্রায় ৯০ বছরের মানুষটি আজও উপস্থিত থাকেন। এ ছাড়া তাঁর আর একটি পরিচয় আছে—

তিনি লোককবি, গায়ক ও সুরকার। তাঁর লেখা গান দুয়ার্সের সে আমলে প্রতি সভায় প্রায় গীত হ'ত। দু-একটি নমুনা দিলে এই মানুষটির গান কতো ছন্দময় ও শ্রেণী সংঘর্ষের প্রতিনিধি তা বুঝতে পারা যাবে।

(১) হাওয়া চলে সর সর
লালঝাণ্ডা উড়ে ফর ফর
চলু কিশান চলু মজদুর
নিকালিনা যাব্ কিরে
লড়াইকে ময়দান।

গানটিতে শ্রমিক-কৃষকের প্রতি আহ্বান শুকরাদাদার রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দেয়।

পুলিশের অত্যাচার-অবিচার, দারোগা, এস ডি ও-র ধনী প্রীতি শুকরাদাকে অক্লেশে বলাতে পারে—

মালবাজার আনা যানা
মেটেইলি মোরি থানা
কিরে একবিতা পেটের লাগিল
যাবো জেলেখানা
দারোগা বেটা শালা
এস ড্রা শ্বশুর
কিরে জেহেলখানা শ্বশুয়ার

একই কথা কবিগুরু তাঁর তাসের দেশ নাটকে বলেছিলেন—

"রানী। আমাদের তাসের দেশের ভাষায় শিকলকে বলে অলংকার। এ ভাষা ভোলবার সময় এসেছে।
রুইতন। হাঁ বিবিরানী, এদের ভাষায় জেলখানাকে বলে শ্বশুর বাড়ি।
রাজা। চুপ।"

কবিগুরুর বানী কি করে শুকরাদার প্রাণে দোলা দিল এবং একই সুরে গান বাঁধতে পারলেন তা বোঝাতে ওই কৃষক-শ্রমিকের সংগ্রামকে বুঝতে হবে। সব পথই একদিকে চলেছে-মুক্তির পথে।

এই শুকরাদা কোচবিহার থেকে কলকাতায় হেঁটে আসেন অন্যান্য যুব-প্রতিনিধিদের সঙ্গে। প্রয়াত কমরেড সুবোধ সেন তাঁকে মানা করেন—পারবি না হাঁটতে—তোর বয়স হয়েছে। রনজি স্টেডিয়ামে গেলাম সুবোধটার সাথে, সঙ্গে ছিলেন ধূপগুড়ির বনমালি রায় (তখন বন-মন্ত্রী)। শুকরাদা হেসে বললেন, সুবোধ হাম সেকা। সুবোধদা অনেক কথা বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন-শুকরা তোমহারা ও দিন ইয়াদ হ্যায়-ন্যাওড়া নদী পাড় হনেকা বাত? গভীর আবেগে শুকরাদা বললেন, সুবোধ তোমহারা আজ তক্ ইয়াদ হ্যায়? বিষয়টি পরে শুনলাম, সুবোধদারা বড়ো বিরশার বাড়ি যাচ্ছেন সভা ইত্যাদি করার জন্য। প্রচণ্ড বর্ষায় ন্যাওড়া নদী উত্তাল। পার হতে পারছেন না। হঠাৎ দেখেন মাথায় হাঁড়ি চাপিয়ে কয়েকজন ওই খরস্রোতা ন্যাওড়া পার হয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল শুকরাদা খাবার মাথায় করে এলেন। বড়ো বিরশা বলেছিলেন—কমরেডরা খেতে পারছে না, যা নদী পার হয়ে। এই হচ্ছে শুকরাদা। এঁকেই লেখক রং চড়িয়ে মাতালে দাঁড় করালেন। এ কোন রাজনৈতিক সদিচ্ছা?

শুকরাদার হাত ধরে আবার আমরা তেভাগার কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করছি। তেভাগার সময় কী ভাবে শ্রমিক-কৃষকরা প্রস্তুতি নিতেন? সে বিষয়ে বলছি :

"তেভাগার সময় মাদল বাজানো হোত। মাদলের বাজনা রিলে করা হোত বাগানে বাগানে, গ্রামে গ্রামে। মাদলের বাজনা শুনে তীর ধনুকে সজ্জিত হয়ে শ্রমিক ও কৃষকেরা চলতেন তেভাগা করতে।" (জেলার তেভাগা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস) পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য স্থানে ছিল শঙ্খ দুয়ার্সে আদিবাসীদের মাদল। এ বাজনার তালে তালে সাঁওতাল বিদ্রোহের সৈনিকরা লড়েছিলেন অসম লড়াই আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে তীর ধনুক টাঙ্গি নিয়ে—মাজলের বাদনা না থামা পর্যন্ত তাঁরা লড়াইয়ের ময়দান ছাড়তেন না। সেই পুরাতন ঐতিহ্য নববসতি এলাকায় চালু হয়েছিল।

এবার আমরা শহিদ-স্মরণে চলে আসছি। তেভাগার আন্দোলনের শহিদ স্মৃতিস্মারক থেকে আমরা তুলে ধরছি।

মেটেলি থানার তেভাগা আন্দোলনে
জোতদার ও ব্রিটিশ শাসকদের
গুলিতে নিহত শহিদ শ্রমিক
ও কৃষকদের নামের তালিকা

"তাং ১লা মাচ ও ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৭

১। কমরেড হপনা মাঝি চা শ্রমিক
২। কমরেড সরবরু মোহাম্মদ কৃষক
৩। কমরেড বুধু খেড়িয়া চা শ্রমিক
৪। কমরেড কৃষ্ণ উরাও ঐ
৫। কমরেড রামু মুণ্ডা ঐ
৬। কমরেড বিরশা উরাও কৃষক
৭। কমরেড জিতু কুমহার চা শ্রমিক
৮। কমরেড বেচপা খেড়িয়া ঐ
৯। কমরেড লছমন সিং রেল শ্রমিক
১০। কমরেড শহরাই মুণ্ডা-কৃষক
১১। কমরেড লোধরা বুড়া-চা শ্রমিক
১২। কমরেড করমী উরাওনী-কৃষক রমণী
১৩। কমরেড বুধনী উরাওনী-ঐ
১৪। কমরেড স্বর্ণময়ী উরাওনী ঐ
১৫। কমরেড এতোয়ারী উরাওনী ঐ

এই স্তম্ভটি স্থাপিত হয়েছে হায় হায় পাথার (অধুনা-শালবাড়ী) ও মঙ্গলবাড়ী ; থানা-মেটেলি, জেলা জলপাইগুড়িতে।

সে সময় দুয়ার্সে বড় বড় জোতদার ছিলেন-ফতে চাঁদ মাহেশ্রী, কাওসার আলম, রমণীকান্ত রাক্ষত (প্রতিনিধি রাক্ষত স্টেট), জহিরুদ্দিন আহমেদ, নিজামুদ্দিন, ইসলাম পণ্ডিত, মুকুট প্রসার এবং মেছুয়া মহম্মদ ও কর্নেল হেদায়েৎ আলী স্টেট ইত্যাদি। এই সময় লেখক ননী ভৌমিক স্বাধীনতার বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে দুয়ার্সে গিয়েছিলেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার হন।

তেবাগার লড়াইয়ে আমরা দেখেছি নেতা ও কর্মীদের দৃঢ় বন্ধন। অনেকের মতে ওই লড়াইয়ের নেতারা কৃষক সমস্যা ও সংগ্রাম বিষয়ে অজ্ঞ নিয়ে ছিলেন, অলস ছিলেন। আজ ৫০ বছর পর

পরিবর্তিত রাজনীতিতে এবং ওইসব আন্দোলনের ফসল বামফ্রন্টের আমলে অনেক কথা বলা সম্ভব। বিশ্লেষণ দরকার কিন্তু অহেতুক অবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখি না।

তেভাগা আন্দোলনে এই জেলায় আমরা দেখলাম :

(১) শ্রমিক-কৃষকের দৃঢ় ঐক্য, একত্রিত সংগ্রাম ;

(২) ছাত্র মধ্যবিত্তের মধ্যে আলোড়ন ও কৃষক-শ্রমিককে সমর্থন ;

(৩) লড়াইয়ে মেয়েদের মহান ভূমিকা এবং জীবনদান ;

(৪) সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি সহ হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও আত্মবলিদান ;

(৫) জোতদারদের পক্ষে মাত্র ইংরেজ শাসক, পুলিশ, চা-কর। কংগ্রেস বা মুসলিম লিগ কিংবা ক্ষত্রিয় সমিতি কেউ প্রকাশ্যে পুলিশের দমননীতির নিন্দা ছাড়া পক্ষে যেতে পারেনি।

তেভাগার এই সংগ্রামের পর দেশবিভাগ না হলে সমস্ত স্থানে এর প্রভাব পড়ত কিন্তু বুর্জোয়া ধনী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি কংগ্রেস লিগ তখন ইংরেজের হাতের পুতুল হয়ে এক সর্বনাশা চক্রান্তে রত। জলপাইগুড়ি বিভক্ত হ'ল এবং করতোয়ার পার্শ্বের সমস্ত জায়গা চলে গেল পাকিস্তানে। বাস্তুহারা কৃষকরা এল ভারতে সব হারিয়ে। পার্টি ও কৃষক সমিতি এক ভয়াবহ দুর্গতির মুখে এসে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে ৪৮ সনের হঠকারী নীতিতে পার্টির সমস্ত নেতারা জেলে। পার্টি বেআইনি। কৃষক-শ্রমিকেরা হতচকিত।

তেভাগার বিফলতার কারণ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে একত্রিত করতে না পারার মধ্যে। লেনিন সাহেব বলে গেছেন—কৃষকদের মধ্যেও শ্রেণী আছে। একমাত্র শ্রমিকদের নেতৃত্ব ছাড়া শেষ লড়াইয়ে জয়লাভ করা যায় না।

তেভাগায় যে সমস্ত কৃষক প্রাণের মায়া ত্যাগ করে লড়াইয়ে নেমেছিলেন তাঁরা আমাদের এক নতুন পথের সঙ্কেত দেন। বস্তুত গ্রামের আধিয়ার, দরিদ্র জমিহীন নিঃস্ব মানুষকে সংগঠিত করার কয়েকটি ধাপের পর তেভাগা আন্দোলন জন্ম নেয়। তারই ফলশ্রুতি আজকের বামফ্রন্ট। ভারতের পরিপূর্ণ মুক্তি সংগ্রামে এই আন্দোলনের অবদান অসীম।

লেনিন রুশ বিপ্লবের পূর্বে বলেছিলেন : We are told : "If the peasants seize the land now, it is the richer peasants who will get it those who have animals, implements etc.: would this, therefore, not be dangerous from the point of view of the poor peasants." Comsade, I must dwell on the argument, because our party, in all our divisions, programms and appear to the people, dulaares : 'We are the party of wage-workers and poor plasants', it is their inbereals we are to protect; it is through them, and through them alone, through those clause, than mankind can excape the horrors (First Congress of peasant deputies—Vol. 24, Page 402) এরপর লেনিন গরিব কৃষকের স্বার্থ রক্ষার পদ্ধতি বলেন "The fist way is to organise the agricultural labourers and poor peasants, অবিভক্ত বঙ্গে আধিয়ার আন্দোলন তাই করতে শুরু করে। তেভাগা তার একটা প্রথম ধাপ।

এইসব আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা মাও-এর মতো জলে মাছের প্রায় বসবাস করতেন। দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদকের ডাইরিতে সুশীল সেন লিখেছিলেন :

"সেই সময়ে আমাদের একটিমাত্র পরিচয়ই ছিল আমরা হলাম কমিউনিস্ট। আমরা গ্রামে নেতাম, মাটি কামড়ে পড়ে থাকতাম ও ভাগচাষীদের সামাজিক জীবনের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়তাম। তাদের যে রকমই খাদ্যবস্তু হোক না কেন, আমরা তারই অংশ নিতাম। এমন সব দিন ছিল যখন তাদের খাবার দাবারই জুটত না। আমরা তাদের নিরন্ন অবস্থার অংশভোগী হয়ে পড়তাম। কখনও শিকড়-বাকড় সেদ্ধ জুটতো। কখনও জুটতো পাট পাতা সেদ্ধ করা কিছু তরল জাতীয় বস্তু। এমন অনেকদিন ঘটেছে যখন আমরা রাত কাটিয়েছি গরু-ছাগলের সঙ্গে গোয়ালঘরে। কখনও বা দরিদ্র সাঁওতালদের বাড়িতে একপাল শুয়োরের সঙ্গে। নিদারুণ শীতের অনেক রাতের বেলা আমরা আগুনের পাশে বসে কাটিয়েছি। তাদের নিঃসপত্ন আস্থা অর্জনের জন্যে এইসব কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে

[ঐতিহাসিক তেভাগা সংগ্রাম স্মরণে (১) কংগ্রেস পত্রিকা ৮.১২.৯৬ অনন্ত লাহিড়ী]

জলপাইগুড়ির নেতারাও এমনিভাবে গ্রামে গ্রামে ভাগচাষীদের সঙ্গে, রেলের গ্যাংম্যানদের কুটিরে, বা চা-শ্রমিকের সঙ্গে থাকতেন। পরিমল মিত্রের ছেঁড়া কাপড় ও দৈন্যাবস্থা দেখে বীরেন নিয়োগী বলেছিলেন—পরিমলবাবু সোভিয়েত এ দেশে হলে আপনার কাপড় মিউজিয়ামে রাখা হবে। অপর নেতা সুবোধ সেন শ্রমিকের গৃহে বালিশের অবস্থান না থাকায় কাঠের পিঁড়িতে মাথা রেখে ঘুমোতেন। ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ডেঙ্গুয়াঝাঁড় চা-শ্রমিক লাইন থেকে ধরা পড়েন ও পিটুনিতে তাঁর পাঁজরের হাড় ভেঙে যায় যা তিনি শেষদিন পর্যন্ত শরীরে বহন করেন। পটল ঘোষও আদিবাসী জনসমুদ্রে মিশে যেতেন।

পরিমল মিত্র, পটল ঘোষ, সুবোধ সেনদের চা-শ্রমিকরা নামের আগে খালি 'কমরেড' যুক্ত করে তুই তুই বলে কথা বলতেন। পরিমল মিত্র গভীর আবেগে বলতেন, আমাকে ওরা নিজেদের মানুষ বলেই ভাবে। আমরা সমর গাঙ্গুলীকে বলতাম সোমাদা আপনি গাঙ্গুলী না ওঁরাও?

এই সেদিন বাংলাদেশে এক সপ্তাহ কাটিয়ে এলেন পশ্চিম বঙ্গের কৃষক নেতা বিনয় কোঙার ও আরো পাঁচজন নেতারা। তিনি তেভাগার বিভিন্ন অঞ্চলে যান। তাঁর অভিজ্ঞতার একটু অংশ তুলে ধরছি :

"রাজশাহী থেকে নাচোলে গিয়ে অভূতপূর্ব দৃশ্য! কত মানুষ? ৫০ হাজার না, বোধহয় আরও বেশি। বড় অংশই আদিবাসী। বামপন্থী কর্মীদের মতে তাঁরা বড়োজোর ৫/৭ হাজার জমায়েত করার ক্ষমতা রাখেন। মানুষ বেশিরভাগ এসেছে অসংগঠিত স্বতঃস্ফূর্ত। ৫০ বছর আগে অনেক রক্ত ঝরেছে। তবু সংগ্রামে সেই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য স্মৃতির ধারাবাহিকতায় নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। এক ঝলক দেখেই চলে যায়নি। থেকেছে। বক্তব্য শুনেছে।"

[গণশক্তি ৭.১২.৯৬]

জলপাইগুড়ি অঞ্চলের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা আমরা প্রবন্ধে বলেছি। পুরাতনী জাগ-গান, টানা ভগতের চা-শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলনের কথাও আমরা উল্লেখ করেছি। পুরাতনী গানে পাই :

মহাজনে ধান কিনিয়া গুদাম ভর্তি করে
পেটের দায়ত্ গরিব লোকে গরু বিক্রি করে
তবুতো না বাঁচে প্রাণ মহার্ঘ্যত্ পরে
উপায় না দেখিয়া শেষেত্ জমি বিক্রি করে।

প্রাচীনকাল থেকে কৃষকের উপর শোষণ অব্যাহত ছিল। স্বয়ং পিতামহ ভীষ্মের পরামর্শ এ বিষয়ে উল্লেখ করা যায়।

"ধনাগমের সুগম পথ"

"জলৌকা (জোঁক) যেমন লোকের গাত্র হইতে শনৈঃ শনৈঃ রুধির পান করে, ব্যাঘ্র যেমন শাবকগণকে নিপীড়িত না করিয়া দশন দ্বারা গ্রহণ করে এবং মূষিক যেমন অলক্ষিতভাবে নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলস্থ মাংস ভক্ষণ করে, তদ্রূপ ধনাকাঙ্ক্ষী নরপতি প্রজাগণকে সমূলে উন্মূলিত বা নিতান্ত নিপীড়িত না করিয়া অলক্ষিতভাবে তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। অভ্যুদয়োন্মুখ ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে সমধিক কর গ্রহণ করা কর্তব্য ...সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব প্রধান প্রধানব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা ইতর-লোকদিগকে দমন করা উচিত।"

(অষ্টাশীতিতম অধ্যায়, [illegible])

এই শোষণ তীব্র হয় ব্রিটিশ আমলে। লড়াই শুরু হয়ে গেল—বাঁচার লড়াই। তেভাগা এবং তার পূর্বের আন্দোলনে চাষী সংঘবদ্ধতার সুফল বুঝতে পারল এবং এই সংঘবদ্ধতা তাদের রাজনৈতিক জয়ের পথে নিয়ে গেল। লেনিনের পথে গরিব চাষী সংগঠিত হ'ল।

সেজন্য আবারও বলি—

কৃষকদের তেভাগা ও জমির লড়াই বামফ্রন্টের জন্মদাতা এবং রক্ষকও বটে।

উপরোক্ত প্রবন্ধ লেখার বহু পূর্বে আমি যাঁদের পরামর্শ ও সাহায্য পেয়েছিলাম তাঁরা হলেন :

মাধব দত্ত (প্রয়াত), ডাঃ শচীন দাশগুপ্ত (প্রয়াত), গুরুদাস রায় (প্রয়াত), সুবোধ সেন (প্রয়াত), সোমা গাঙ্গুলী (প্রয়াত), চারু মজুমদার (প্রয়াত), বীরেন নিয়োগী, নরেশ চক্রবর্তী (প্রয়াত), পটল ঘোষ (প্রয়াত), পরিমল মিত্র (প্রয়াত), মানিক সান্যাল, জগৎ সাহা এবং রণজিৎ দাশগুপ্ত। শ্রীদাশগুপ্ত অত্যন্ত মূল্যবান বিশ্লেষণ করেছেন। রণজিৎ দাশগুপ্তের লেখা কিতাব Economy and Politics in Bengal—Jalpaiguri 1869—1947.

শহিদ ভবানী বর্মন

তেভাগা সংগ্রামের অর্ধশতাব্দী

জীবন দে

"বাংলার কয়েকটি জেলায় অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, পুলিশ ও আইন অমান্যকারী জনতার মধ্যে সংঘর্ষ ছিল বিশৃংখলার ফল। গণবিদ্রোহের লক্ষ্য নিয়েই যা ছড়ানো হচ্ছিল।" গণ গ্রেপ্তার ও দমনকল্পে বুলেটের ন্যায্যতা প্রমাণকল্পে তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মিঃ সোহরাবর্দীর আইন সভায় প্রদত্ত বিবৃতির এটা সারাংশ।

কিন্তু ১৯ শে মার্চ ১৯৪৭ খাঁপুর হত্যাকাণ্ডের এক মাস পরেই 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার অভিমত ছিল "ঘটনাবলী যেদিকে ঘুরছে তারজন্য বাইরের বিক্ষোভকারীরাই পুরোপুরি দায়ী, এহেন এক ধারণা পোষণ করলে উত্তরবঙ্গের কৃষি আন্দোলনের শক্তিকেই খাটো করে দেখা হয়।

১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট মতে 'বাংলার ৭৫ লক্ষ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ৩০ লক্ষেরই নেই জমিতে কোনও অধিকার। তারা হয় মজুরীজীবী অথবা ভাগচাষী।' গ্রামদেশে বিত্তবান জোতদারের ক্ষেত্রবিশেষে ছিল ১০/১২ হাজার বিঘা আবাদী জমি। পতিরামে সিংহবাহিনী এস্টেট, এমনকি কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গায় ক্ষেতি ফুলবাড়ির খগেন্দ্রনাথ বসুনিয়াও ছিলেন—তার অন্যতম।

১৯৩৭-৩৮ সালে উত্তর ময়মনসিংহে হাজং উপজাতি কৃষকের টংক বিদ্রোহ তারই প্রকাশ। যা কিনা খাজনার হার কমাতে বাধ্য করে। সিংহবাহিনী স্টেটের সন্নিকটেই হিলিগামী বড় সড়ক। 'ছাতা মাথায় কিংবা জুতা পায়ে' কারও পথ চলা ছিল বে-আইনি। তেমন সব যাত্রীকে ধরে এনে শায়েস্তা করা ছিল পাইক এবং বরকন্দাজদের বিশেষ কর্তব্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

যার সূত্রপাত ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর। স্বাধীনতার দাবীকে প্রতিহতকল্পে সাম্প্রদায়িক ঐক্য আর শান্তিকে খর্ব করার প্রয়াস ছিল উৎকট। যুদ্ধ কর আদায়ের বহুমুখীন প্রয়াস তেতাল্লিশের আকাল এবং মন্বন্তরের প্রধান উৎস। জমিদার-জোতদার এবং মহাজনদের খাদ্য পাচার মজুত থেকে চোরাকারবারে জনজীবন অতিষ্ঠ। এক এক জেলায় ফাও আদায়ের ফিকির ছিল এক এক রকম। যেমন দিনাজপুরে—খোলামচাঁহা, নয়া খাওয়া, মহলদারী, গোলাপূজা, বরকন্দাজী, মন্ডব সেলামী, সন্ন্যাসী, হাতিখোরা (হাতির খোরাকী) মাছ খাওয়া। কোচবিহারে—মাচা মুহুরী, বৈসনা, তলব, ঈশ্বরবৃত্তি, গদিসেলামী, দুধখাওনি ইত্যাদি।

তখনও জোতদার মহাজনদের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ ছিল ডাল ভাত। টিনের একটা ঘর থাকা দিয়ে কথা। ১০-১২ জন স্ত্রী তাদের একজনের থাকতেই পারে। এমন কি ৬০-৭০ বছরের বৃদ্ধ ও ১৫-১৬ বছরের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ের মধ্যে সমস্যা বলতে নেই। বিনা মাইনের দাসী বান্দী এরা। মহাজনের ঘরে গতর বিক্রয় যাদের প্রধান কর্তব্য। সেখানেই অবিবাহিত ছেলের সংখ্যা অগণিত। মেয়ে কোথায়? তাদের বলা হতো চামনী।

কমিউনিস্ট মতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসী বাহিনী কর্তৃক সোভিয়েত ভূমি আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধকে বলা হত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে না এক পাই না এক ভাই'। কমিউনিস্ট বিরোধী দমননীতির সেটা ছিল খোলা ময়দান। যাকে বলে নগ্ন এবং উন্মত্ত। স্কুল পার না হতেই আমি ছিলাম রাত্রিকালে গৃহবন্দী। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কুড়িগ্রাম শহরের মোট ২১ জনের সঙ্গে আমার বাক্যালাপ ছিল নিষিদ্ধ। ধরপাকড়ের শুরুতেই কালক্ষেপ ছাড়াই আমি সরে পড়তে সক্ষম হই। রংপুরে আরও এমনি ছিলাম অনেকে। যা পারেননি দিনাজপুরের ক্যাডার থেকে লিডাররা। প্রথম কিস্তিতেই সবাই তারা জেলে।

তেভাগা আন্দোলনের বীর শহিদ

দিনাজপুর জেলায় ৪০ জন, জলপাইগুড়ি ১৪ জন, চব্বিশ পরগনায় ৭ জন, ময়মনসিংহে ৪ জন, খুলনায় ২ জন, রংপুরে ১, হাওড়ায় ১ জন।

দিনাজপুর ছিল বাংলার শস্যভাণ্ডার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেই সেখানে ঘরে ঘরে হাহাকার। অনাহার খাঁপুরের কৃষক নেতা খোদ কমরেড চিয়ারশাই শেখের ঘরেও। ভূমিহীন চাষী, তাই নিত্য উপবাসী। স্ত্রী ছাড়া একমাত্র ছেলে আব্দুল। সিংহবাহিনী স্টেটে মাস মাহিনার দিনমজুর। কৃষ্ণকায় চেহারা। উচ্চতায় ছ'ফুট যে—কোনও সন্দেহ নেই তাতে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সমিতির কাজ করবে এমন সময় কোথায়? খাঁপুর-কেগ্রামের চাষীদের দুরবস্থায় নেই কোনও হেরফের। রাত্রি ৯টার আগে বসতে পারার উপায় নেই বললেই চলে। স্থলে হোক, জলেই হোক রাত্রির অন্ধকারে ধান পাচার বন্ধ। মজুত উদ্ধার চাই। কালোবাজার রুখতে হবে। এটা সমিতির সিদ্ধান্ত।

রাত্রি তিনটে। ঘুম নেই ভাই সাহেবের। রাস্তায় কিচির-কিচির শব্দ। অনুমান সত্যি। ২০-২৫ টি গরুর গাড়ি বোঝাই ধান চলেছে শহরের চালকল অভিমুখে। এদের মালিক বলতে সিংহবাহিনী স্টেটই একমাত্র। থামাও ধানের গাড়ি। কন্ট্রোল দরে বিক্রয় করলে সমস্ত টাকাই পেয়ে যাবে। চোরাকারবারে মিলবে না এক পয়সাও। চিয়ারশাইকে অগ্রাহ্য করে এমন দুঃসাহস এ তল্লাটে কারও নেই।

জমিদার অসিতমোহন সিংহ বেশির ভাগটাই থাকেন কলকাতায়। তখন তিনি পতিরামে। কৃষকনেতা কমরেড কৃষ্ণদাস মহন্তকে ডেকে আনলেন। মহন্তও একই কথা বললেন। জলপথে নৌকোযোগে আপনার চালান আমরা রুখে দিয়েছি। রাত্রি করে স্থলপথের ব্যাপারটাও তাই। মহন্তর সঙ্গে এসেছেন—হোপনা মাডি, গুরুচরণ, ভবানী, নীলমাধব এবং খোকা বর্মণ। রাগ আর ক্ষোভে জমিদারের চোখে তখন জল।

এযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে না এক পাই, না এক ভাই। জেলার কমিউনিস্ট নেতারা একযোগেই ধরা পড়ে জেলে গিয়ে ঢুকলেন। কমরেড বিভূতি গুহ, কালী সরকার, গুরুদাস তালুকদার থেকে সুশীল সেন বাইরে নেই একজনও। ঠাকুরগাঁ এবং বালুরঘাট মহকুমার পার্টি তখন সামাল দেবে কে? রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্তে কমরেড মণী বাগচী এবং আমার উপর ভার পড়ল। ঠাকুরগাঁয় কমরেড বাগচী, বালুরঘাট পড়ল আমার ভাগে।

খোলা মাঠের বুকে বাড়ি চালো বলতে একটি। কমরেড চিয়ারশাইয়ের আস্তানা। ভাই সাহেব কিংবা আমার ঘুম নেই একজনেরও চোখে। ভোর না হতেই শুরু হবে অসম এক খণ্ডযুদ্ধ। জমিদারের খোলানময় লেঠেলদের সমাবেশ ঢাকা ময়মনসিংহ থেকে আমদানী করা। ভাইসাহেব নামবেন একাকী হাল জুড়তে। তাকে ঠেকাতে না পারার অর্থই হবে বাদবাকীদের ছিটেছাড়া করা। কিন্তু আমি? ঘরে থাকা মানেই রণাঙ্গণ থেকে পালিয়ে থাকা। শতাধিক লেঠেলের হাতে একাকী আমি তাকে ছেড়ে দেবো? অসম্ভব। কিন্তু করণীয়? অস্পষ্ট, মাথায় ঢুকছে না।

ম্যানেজার সুরেনবাবুকে কেউ চিনবে না যদি ঠগের বেটা সম্বোধন করা না হয়। সাতসকালে দু'জনকে মাঠে নামতে দেখেই সাজ সাজরব শুরু হয়ে যায়। লাঠি এবং বর্শা হাতে বেরো আসে একযোগে। জমির এক কোণে বন্দনা সমাপ্তপ্রায়। সর্দারের নির্দেশমতই ছুড়ে মারা লাঠি থেকে বর্শা এসে আমাদের কাছাকাছি পড়তে শুরু করে। ম্যানেজারের আনন্দ কে দেখে তখন। গেঁথে ফেলো, দুটাকেই গেঁথে ফেলো। তার নির্দেশ।

হাল ছেড়ে এগিয়ে যান ভাইসাহেব। কি ব্যাপার ঠগের ব্যাটা, চাষী মজুরের আর নাকি দরকার নাই তোমাদের? এরা সব কারা তবে? জোতদার-জমিদার কেউ তবে নাই কেন? ভাইসাহেবকে এগুতে দেখেই পিছিয়ে যায় ম্যানেজার। হাতের কাছে পেলে ছিঁড়েই ফেলবে তাকে। —মারো মারো দুটাকেই, পিছু হটতে হটতেই অর্ডার করেন ম্যানেজার। তাই দেখে সর্দারের নির্দেশে থেমে যায় তার বাহিনী। ফলে ম্যানেজারের তখন ঘোর-বিপদ। মাঠ ফেলে কাছারী বলেই সোজা দৌড়!

—আবাদ করুন আপনারা। না জেনে না বুঝে আমাদের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছেন আপনারা। কিন্তু ঠিক আমাদের মতোই উচ্ছেদ করবে একদিন, —সেদিন কেউ যাবো না আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে। সর্দার এসে জড়িয়ে ধরেন ভাই সাহেবকে। আমাদের ক্ষমা করবেন আপনারা। এসব কিছুই সত্যি আমরা জানতাম না। আমরাও চাষী আমরাও গরীব। ভাইসাহেবকে কোলে তুলে নিলেন তারা। মনে মনে বললাম—দুনিয়ার শ্রমিক এক হও।

এহেন এক অসম যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত জয়ে মন-মেজাজ সেদিন আশা আর আনন্দে ভরপুর। পাশাপাশি খেতে বসেছি দুজন। ভাত আনো। তাড়া দিলেন ভাই সাহেব। চৈত্রের আগুনঝরা রোদেও মুক্তময়দানে বাতাসের হিল্লোল। দ্বিতীয়বার তাগাদা করেন তিনি। ভাত, ভাত কোথায়? চাউল আছে কিনা জানেন?—ভাত ফুটতে দেখেই স্নান করতে যাই, ওঃ হো, ব্যাপার অন্যরকম। পরনে নাই কাপড়! দেখেন তো ব্যাপারটা। সেই দোষটা হইল্ আমার কমরেডটার? এজন্যই যে ইংরাজকে দেশছাড়া করা চাই সেটা তবে বুঝবে কে? আট হাত কাপড় কিংবা ছেড়া লুঙ্গির বেশি আমাদের কোন দিনই কাপড় থাকে না। ঘটনাক্রমে পুরোপুরি দশহাতের এক ধুতি পরেই আমি খেতে বসেছিলাম। চটপট উঠে গিয়ে ছ'হাত খণ্ডটাই ভাইসাহেবের হাতে দিয়ে দিব্যি লুঙ্গি পরেই পুনরায় এসে বসে পড়লাম।

কমরেড কৃষ্ণদাস মহন্তর-দু'ছেলে। বড় ছেলে ননীদাস আন্দামান জেলে দীপান্তর খাটছেন। ছোট ছেলে নগেন, পতিরামের বাড়ি। পুকুরেই ডুব দেবো আশায় একবুক জলে গিয়ে নেমেছি। কে একজন ডাক দেয় 'কমলেশ'?—কি ব্যাপার, ডুবটা দিয়েই উঠে পড়ব জবাব দিলাম আমি। না হবে না সেটা, ভাইটাক ধরি নিয়ে গেছে। খোয়াড়ে দিবে বলে। তার সঙ্গে হালের বলদ। তড়িঘড়ি উঠে পড়লাম। ছুটতে সুরু করলাম দ্রুতগতিতে। সেখান থেকে খোয়াড় এক ফার্লংয়ের অনুরূপ। পোটলার মধ্যে কি?—পন্তা। ভাইটার পেটে কিছু নাই। ভাইসাহেব জানেন? পরামর্শ ভাইসাহেবের। মানুষ হাল না জুড়লে গরু পারে নাকি আবাদ কৃষি করতে? সুতরাং গরু খোয়াড়ে দিবার আগে মানুষকে খোয়াড়ে দিতেই হবে।—বটেই তো! এদিকে খোয়াড়ে তখন লেগে গেছে। বলদ কোথায় কে জানে! খোয়াড়ের দরজা আটকে মালিক—ঘর্মাক্ত। পাইক দুজন খোকাকে সামলাচ্ছে। তিনজনই একযোগে ঠগের ব্যাটার মুণ্ডুপাতে ব্যস্ত! ছুটে এল মালিক। মানুষকে খোয়াড়ে দেওয়া যায়? সরকার আমাকে ভিটাছাড়া করবে। আমাকে বাঁচান। সমিতিকে আমি চাঁদা দিমু। খোকা খোয়াড়ের মধ্যে ঢুকবেই! গরু কোথায় কে জানে ততক্ষণে খোকা পান্তাভাতের সদ্ব্যবহারে লেগে গেছে। জমিদারের মুণ্ডুপাত করছে সবাই। খাঁপুর আর চিয়ারশাই, চিয়ারশাই মানেই খাঁপুর। বালুরঘাট মহকুমা ছেড়ে কুশমণ্ডি-কালিয়াগঞ্জ-বুনিয়াপুর পতিরাজপুরে ডাকের পর ডাক। রায়গঞ্জ শহরেই মিটিং মিছিল জরুরি। কমরেড বসন্ত চ্যাটার্জি, কৃষ্ণদাস মহন্ত, চিয়ারশাই সবাই আমরা এক মত। তবু একটু পরামর্শ চাই। সাতদিনের মধ্যে ফিরে আসব জানিয়ে আমি গেলাম রংপুর। আলোচনা আর পরামর্শ চাই নেতৃত্বের। দিনাজপুর সেদিক থেকে একেবারেই ফাঁকা। কিন্তু দু'দিন না কাটতেই ভাইসাহেবের দূত। চলে আসুন এখনই।

সঙ্গেসঙ্গেই পুনরায় বদরগঞ্জ-ফুলবাড়ি, থেকে হিলির পথে পতিরাম। কমরেড মহন্ত জানালেন এবারের সমস্যা খুবই গুরুতর। কোর্টের মাধ্যমেই ১২শত চাষীর উচ্ছেদ নোটিশ কৈ-গ্রাম, খাঁপুরের ঘরে ঘরে জারী করা শেষ। সবই করজা ধানের সুদ আর আসল। এক আনাও সত্য নেই তার মধ্যে। বলুন কি করা যায়—এমতাবস্থায়। চটের ব্যাগ ভর্তি নোটিশের পর নোটিশ। হাতে সময়মাত্র আর পাঁচদিন। ভাইসাহেবও এলেন।

এক ব্যাগ উচ্ছেদের নোটিশসহ ভাই সাহেব আর আমি চলেছি বালুরঘাট। সুদূর আঠারো মাইল। এস-ডি-ও পানাউল্যা মিঞা কুড়িগ্রামের ছেলে। একান্ত গরীব, পিতা বাড়ি বাড়ি মাংস ফেরী করে তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। অত্যাচারী মিথ্যাবাদী সাইলকদের যদি গ্রেপ্তার নাই করেন আমাকেই জেলে ঢুকাতে হবে।

দু'জনেরই খালি পা। খুঁজে পেতে টপ বারান্দার বেঞ্চে বসে পড়লাম। লুঙ্গি পরিহিত মহকুমা শাসক ভেতরে পায়চারী-রত। —কি চান আপনারা? কোত্থেকে এসেছেন? বারান্দায় এলেন তিনি।

—ইনি কমরেড চিয়ারশাই সেখ। আপনার চোখে দেখা না হলেও জানাশোনা। আমার নাম এই। কুড়িগ্রামের পুরাতন স্টেশনে আমার দিদির বাড়ি। আপনাদের নতুন স্টেশনে। পড়াশোনার চাইতেও পার্টিতে জোর দেবার জন্য দিনরাত আমাকে দিদির উপদেশ আপনার পা-ধোয়া জল খাবার জন্য। ডি-আই-আর এ ওয়ারেন্ট আছে আমার নামে তা থাক। ১২শত গরীব চাষীকে মিথ্যা অজুহাতে সর্বশান্ত করবে আপনার উপস্থিতিতে—আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিনে।

বুঝেছি। কিন্তু আই-অ্যাম কোয়াইট আনডান। এটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে। —আমি যদি বলি এটা সম্পূর্ণ বে-আইনি এবং আপনার অজান্তেই সব ঘটে চলেছে তখন? যুদ্ধের শুরু থেকেই ডি-আই-আর নিয়ে আমি বিব্রত-বিধ্বস্ত সবই আছে এর মধ্যে। এমনকি গরু হারালেও গরু পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় তখন হস্তক্ষেপ করবেন তো?

বলুন, আমি শুনতে রাজি। এস-ডি-ও বসে পড়লেন আমাদের পাশে, বেঞ্চের মাথায়।—একগাদা নোটিশ বের করে বললাম কম করে পাঁচ লাখ টাকার মামলা। উচ্ছেদকারীর মতোই একলাখ কেবল আসল। আমাদের মতে সেটাও মিথ্যে। যদি নাও বলি, তখন বলুন অতিরিক্ত মুনাফার শতকরা ৬০ ভাগ; যুদ্ধ বাবদ দেয় ট্যাক্স গেল কোথায়? এতবড় অঙ্কের টাকা ফাঁকি দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবেই সিংহবাহিনী স্টেট দরিদ্র চাষীদের আজ যুদ্ধবিরোধী করার অপরাধে অপরাধী। আপনি পারেন এখনই শো'কজ করতে। কেন তাদের গ্রেপ্তার করা হবে না?

আপনি এটা জানলেন কিভাবে? এস-ডি-ও পরম বিস্মিত। বলেছি তো প্রাণের তাগিদে। ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম আমরা। শত শত গ্রামে এমনকি শহরকেও মাতিয়ে তুলল সে সংবাদ।

১০ই আগস্ট ১৯৪২ রায়গঞ্জ শহরে মহামিছিলের উৎস বলতে এটাই। দুটো মহকুমা থেকেই হাজার লোক সমবেত ৯ই আগস্ট

রাত্রিতে। সোভিয়েত ভূমিতে নাৎসীদের হামলার সঙ্গে সঙ্গেই সি পি আই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করে। জাপানকে রুখতে হবে, রুখতে গেলে অস্ত্র চাই! ভাত-চাই-রুটি চাই—কাজ চাই। সারাদিনরাত মিছিলকারীদের ছিল প্রধান শ্লোগান। কিন্তু শেষ রাত্রিতেই শহরের উপকণ্ঠে এসে অবস্থাটা কেমন যেন উল্টোপাল্টা মনে হল। শহরবাসীদের এতবেশি আগ্রহ?

কমরেড চিয়ারশাই, বসন্ত চ্যাটার্জি, ক্ষেত্র মাহালী, তুফালু প্রধান, রংলাল প্রধানদের রেখে শহরে ঢুকে জানা গেল গান্ধীজি, পণ্ডিত নেহরু থেকে মৌলানা আজাদ সহ ৭৫ জন জাতীয় নেতা ৯ই আগস্ট গ্রেপ্তার হয়েছেন! ফিরে এসে বসলাম আমরা। জাপানকে রুখতে হবে, রুখতে হলে অস্ত্র চাই, জাতীয় সরকার চাই, জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই, সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক প্রধান শ্লোগানে পরিণত হল। শহরবাসী নতুন করে। চার হাজার জনতা নির্বিবাদে মিশে গেলেন এই মিছিলে। স্নেহলতা পার্কের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড বসন্ত চ্যাটার্জী। প্রধান বক্তা আমি এবং কমরেড চিয়ারশাই শেখ। সারা দেশেই এটা একটা রেকর্ড।

এরপরে পরেই পতিরামে সর্বপ্রথম জেলা কৃষক সম্মেলন-প্রকাশ্যেই অনুষ্ঠিত হল। সভাপতি উত্তরবঙ্গের সেরা কৃষকনেতা কমরেড দীনেশ লাহিড়ী। এক গাড়ি চাল এবং আলু সামান্য সাহায্য হিসেবে গ্রহণের চিঠিসহ পাঠালেন সিংহবাহিনী স্টেট। পার্টি তখন আইনসঙ্গত। কমরেড সরোজ মুখার্জি এলেন দিনাজপুর শহরে পার্টির জেলা দপ্তরে এই সংবাদ নিয়েই। জেল কমরেডরা ছাড়া পেলেন। ওয়ারেন্টের আসামী আমরাও তাই জমা হলাম একে একে। এলেন কমরেড মহী বাগচীও। ফটো তোলা হল। কমরেড বাগচী এবং আমি সামনের সারিতে উপবিষ্ট। আমার পেছনেই দণ্ডায়মান কমরেড মুখার্জি এবং রংপুরের কমরেড শচীন ঘোষ সহ অন্যান্য। কারামুক্ত এবং প্রকাশ্যে এসে জমায়েত কমরেডদের সঙ্গে অন্যান্যদের সহ সংখ্যাটা বেশ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দলের অসাধ্য এতসবকে একসঙ্গে সামলানো।

সিদ্ধান্ত হল ব্যবসা কিংবা চাকুরিতে ঢোকা এমনকি বিয়ে করাটাও এখন আর নিষিদ্ধ কিছু নয়। কমরেড বাগচী তার জন্য ঠাকুরগাঁতেই থেকে গেলেন। আমি টি বি আর স্ট্রং ডিসেন্ট্রিসহ ফিরে এলাম রংপুর। কিন্তু মামলা সেখানেও একই। সর্বজন শ্রদ্ধেয় কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন, জেলা কংগ্রেসেরও সম্পাদক। তিনমাস-চিকিৎসা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দক্ষিণভারত ঘুরে বেজ-ওয়াডা কৃষক সম্মেলন দেখলাম। পার্টি যেখানে বে-আইনি,—সবরকমে নিষিদ্ধ সেই দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে থেকে পার্টি করাই সমুচিত বলে জানিয়ে দিলাম।

১৯৪৬ সাল। বকসির হাট আর তুফানগঞ্জের স্থানবিশেষে ভাল কৃষক সংগঠন গড়ে উঠতেই বকসির হাট চত্বরে নায়েব আহেলকার হেমন্তকুমার বর্মণকে নাকের জল চোখের জলে একাকার করে ছাড়া হল। কমরেড ঢ্যাপড়া মইশাল, সুন্দর বৈরাগী, রমানাথ সিংহের নেতৃত্বে হাজার জনতার সমর্থনে প্রমাণ হল হাটের খাজনা বন্ধ করা নয়। বে-আইনি আদায় বন্ধ এবং মহারাজার নিরিখনমা আমরা সাইনবোর্ড করে হাটে হাটে টানিয়ে দিতে চাই। বিষণ্ণ বদনে হাতির পিঠেই ফিরে আসতে হল তাকে। দালালদের কথায় একজনও সেদিন কর্ণপাত করেননি।

১৯৪৭ এর ১৯শে ফেব্রুয়ারি। কলিকাতার স্বাধীনতা ও জনযুদ্ধ পত্রিকার দপ্তরে আবার দেখা কমরেড সুকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ১৯৪৩ সালে কলকাতায় তাঁকে ফেলেই আমরা ২১ জন চলে যাই দক্ষিণ ভারত। ফোন এসেছে কমরেড, ফোন, গুলি চলেছে দিনাজপুরে। ফোন ধরেছেন খুব সম্ভবত কমরেড সরোজ দত্ত কিনা আজ আর মনে নেই। প্রচুর মারা গেছে কি কারণে—কেন, না জেনেই প্রশ্ন করলাম কমরেড চিয়ারশাই? তিনি কেমন আছেন? প্রথমেই শহিদ হয়েছেন তিনি। হাতের বর্শা ছুঁড়ে পুলিশ ট্রাকের টায়ার ফাটিয়ে দিয়েছেন—পরিখা খনন করেছেন একটা গুলি খাবার পরও। মোট আহত নিহত অনেক। কত গুলি চলেছে, কতজন যে মরেছে, কেউ বলতে পারে না। এমন কাঁদাকাটি জীবনে সম্ভবত আর কোনদিনই করিনি। কমিউনিস্ট নেতা কমরেড কালী সরকার তার রচিত জংগানের কিছু বর্ণনা এখানে মোটেই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী জেলে রচিত।

সম্মুখের ফাঁকা জায়গায় মোটর গাড়ি থুইয়া
নামিল কতেক সৈন্য বন্দুক কান্ধে লইয়া।
আন্ধার রাতে চুপি চুপি বাড়িতে ঢুকিল
গোপেশ ডাক্তারের সাথে পাঁচজনকে ধরিল।
হাতেতে হাতকড়ি লাগায় কোমরে বান্ধে দড়ি
কিলচড় মারি তাদের নিয়ে যায় ধরি।

— — — — — — — — — — — —

সৈন্যের গাড়ির পাছে দূরে দেখা নাহি যায়
ট্রেঞ্চ খোঁড়ে কতেক বীর গেড়িলা কায়দায়
বত্রিশটা বন্দুকের গুলি ছোটে ঝাঁকে ঝাঁক
প্রলয়ের আগুন যেন ছাইলো বেবাক।
ছুটিল চিয়ারশাই হস্তে মোটা লাঠি
জোয়ান মরদ বাপের বেটা ৩৮ ইঞ্চি ছাতি
হঠাৎ লাগিল গুলি বাম বাহুর পরে
ক্রোধভরে বাপের বেটা যায় নিজ ঘরে।
ঘর হতে চিয়ারভাই শাবল আনিল
সবলে ট্রাকের চাকা কাটিতে লাগিল
দুশমনের গুলি ফির লাগিল কপালে
দিশ নাহি হুঁশ নাই 'মার মার' বলে
তীরধনুক, শাবল, লাঠি, হাঁসুয়া, কুঠার
মারিছে সমানে ছুঁড়ে যা ছিল যাহার।
বন্দুকের গুলির মুখে টিকিতে না পারে
একে একে বীরগণ ঢলে ঢলে পড়ে।
তিনখানি ট্রাকের, অচল করলো দুই
শহীদের রক্তে রাঙা হয়ে গেল ভুঁই
একে একে বাইশজন জান ছেড়ে দিল
শহীদের রক্ত রাঙা লাল ঝাণ্ডা হলো।

দিনাজপুরের অবিসম্বাদিত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড বিভূতি গুহের ভাষায় ঠাকুরগাঁর বেহারী কিছুতেই ভুলিতে পারে না

জোতদার হরকান্তর শোষণ-অনাচার ব্যাভিচার থেকে নস্টামি। আধিভাগে নয় মণ তার পাইবার কথা। কিন্তু তহুরী, মহলদারী, দুনা সুদেই গেল আড়াই মণ। বেহারী কর্জ করিল। দুই টাকা, চার টাকা করিয়া অনেক টাকা ওয়াশিলও দিল। কিন্তু দেনা বাড়ে ছাড়া কমে না। নালিশ হইল—ডিগ্রী হইল সমস্ত জমি চলিয়া গেল হরকান্তর গহ্বরে।

সবাই ধান কাটিয়া নিজ খোলানে তুলিতেছে। কেহ আর জোতদারের খোলানে ধান তোলে না। হরকান্তর বিরাট খোলানটা খাঁ-খাঁ করিতেছে। বরকন্দাজ বার কয়েক শাসাইয়া গিয়াছে। ওই তো গাঁয়ের মাথা নীলুও নিজ খোলানে ধান তুলিয়াছে। চৌকিদার পর্যন্ত।

শেষকালে বেহারীকেই দিতে হয় সামনের সারিতে। গর্বে তার বুক দশগুণ ফুলিয়া যায়। দেখুক শালা হরকান্ত জোতদার। আর আধি নয়—এবার তেভাগা আসিতেছে দিন আসিতেছে। বাপ-দাদার জমি একদিন ফিরিয়া পাইব। জোতদারের হাতে-পায়ে ধরিয়া কান্নাকাটিও আর নয়। সবার পেটে ভাত জুটিবে। হাসি আসিবে মুখে। নেশায় চোখ বুঁজিয়া আসে বেহারীর।

শান্ত সুশৃঙ্খল মিছিল। অজগর সাপের মতোই আঁকিয়া-বাকিয়া পথ চলে। কাহারও একলার দাবী নয়। এই তো আসিয়া গিয়াছে শহর। কোথা হইতে একটা মোটর আসিয়া দাঁড়ায় সাঁকোর মুখে। ভয় কিসের? কৃষকরা তো আর চোর-ডাকাত নয়। একটা জোতদারের গায়েও আঁচড় কাটে নাই তারা। কৃষকরা অশান্তি চায় না। মার-ডাং করে তো ওরাই। টাকায় কিনা হয়।

দারোগাবাবু মিছিলের সামনে আসিয়া দাঁড়ান। পোশাকটা যেন বেশি জমকালো। পেটুয়া যেন বেশি গম্ভীর। তার পাশে হাবিলদার। পিছনে সারি বাঁধিয়া মিলিটারি পুলিশ। দারোগাবাবু হাত দিয়া ইঙ্গিত করেন মিলিটারি পুলিশকে। একটা ত্রিভুজ রচনা করেন তারপর। কথাবার্তা নাই, আলোচনা নাই। হঠাৎ শব্দ হয় দুমদাম। গুলি চলে। একই সময় গুলি চলে ঠুমনিয়াতেও।

মিছিল নড়িয়া ওঠে। বেহারী জোর করিয়া পা রাখে মাটিতে। টলিয়া না যায়, পড়িয়া না যায়। মাথা ঝনঝন করিয়া ওঠে বেহারীর। বাঁ হাত খান জ্বলিয়া-পুড়িয়া গেল যে! না পারে না। আর পারে না বেহারী। ভূমিকম্পের জোর বাড়িয়াছে, মাটি কাঁপিতেছে, লুটাইয়া পড়ে বেহারী। লাল হইয়া যায় কালো মাটি। রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে পিরানটা। টকটকে লাল। ওই ঝাণ্ডারই মতো। হাটের দিকে যাহারা ছিল —এলোমেলো দিশাহারা তারা। কেহ জংগলে গিয়া পড়ে। শান্ত্রীরা রাইফেল হাতে ধাওয়া করে তাদের। গোঙানির সুরে শিহরিয়া ওঠে জংগল। গোটা শহর অবরুদ্ধ।

পেটুয়া দারোগা উপরে রিপোর্ট পাঠায়। বিরাট বিদ্রোহী দল আসিয়াছিল শহর আক্রমণ করতে। এখনও শত্রু দমে নাই। গোপন রিপোর্ট আছে। আবার আসিবে। আরও বেশি মারাত্মক অস্ত্র নিয়া আসিবে।

বেহারী হাসপাতালে। স্ত্রী রূপকুমারী দেখা করিতে আসিয়াছিল। শহরে ঢুকিতে পারে নাই। রূপকুমারী সিপাইীর হাতে-পায়ে ধরিয়াছে, কাঁদাকাটা করিয়াছে, পাষাণ গলে নাই।

বেহারী নিঃশব্দে বিছানায় পড়িয়া থাকে। চোখের সামনে পীরপুরের হাট। চৌদ্দপুরুষের ভিটা। চড়কের আর দেরী নাই। মেলা বসে। মেয়েটা জিলাপী খাইতে চায়। আগে ছিল পয়সায় দুইখানা। এখন একখানারই দাম দুই পয়সা। বাবু জিলিপী দিবু না? সে পাশ ফিরে শোয়। আর ওঠেনি তারপর।

খাঁপুর শহিদদের মধ্যেই ছিলেন যশোদা রাণী সরকার, ভবানী বর্মণ, নারায়ণ মুর্মু। মহিলা কর্মী এবং সংগঠক যেমন শহর, তেমনই গ্রামেও ছিলেন বেশ কিছু। রানী দাশগুপ্তা, বীণা গুহ, অলকা মজুমদার প্রমুখ। বিধানসভায় প্রথম একজন আধিয়ার কমরেড নির্বাচিত হলেন দিনাজপুর থেকেই। তিনি কমরেড রূপনারায়ণ সরকার। যিনি নিহতও হলেন ১৯৭৩ সালে কমিউনিস্টদের একাংশ, নকশালপন্থীদের হাতে। তেতাল্লিশের মন্বন্তরে একমাত্র রংপুর জেলাতেই মারা গেলেন একলক্ষ নরনারী। ময়মনসিংহ জেলার ৬০ লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬৭ জনই ছিলেন ভাগচাষী।

১৯৪৬ সালে মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে ভিত্তি করে কলকাতায় যে রক্তক্ষয়ী ভয়াবহ দাঙ্গা ঘটে গেল তারই প্রতিক্রিয়া মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টিও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান, হাজং, গারো, কোচ, ডালু, বানাই জমি ও ফসলের দাবীতে অভিযান আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলার কমিউনিস্ট নেতা খোকা রায় ময়মনসিংহের তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৪৭ সালে এক প্রবন্ধে লিখেছেন—তীব্র সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও উত্তেজনার পটভূমিতে ময়মনসিংহের তেভাগা আন্দোলন এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও উত্তেজনা সত্ত্বেও এখানে তেভাগা সংগ্রামের মাধ্যমে অখণ্ড হিন্দু মুসলিম সংহতি ও ঐক্য গড়ে ওঠে এবং এই সংগ্রাম ময়মনসিংহের চেহারা পালটে দেয় (কমরেড আশু দত্তর প্রবন্ধ)।

তেভাগা চাই, ফসল কেটে ঘরে তোল, দখল রেখে চাষ কর, টংক প্রথার উচ্ছেদ চাই, জান দেবো তো ধান দেবো না, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ চাই, দাবীতে কৃষকেরা গর্জে ওঠে। ১৯৪৬ নভেম্বরে সারা জেলায় তেভাগার লড়াই শুরু হয়ে যায়। কিশোরগঞ্জের চাতল ও বাঘাটা এলাকায় মাত্র একসপ্তাহ আগে জনৈকা মহিলা-সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাবাহিনীর হাতে নিহত হন। কিন্তু সাত দিনের মধ্যেই শতাধিক মুসলিম এবং ৪৭টি হিন্দু ভাগচাষী পরিবার জোতদারের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। স্বল্পবিত্ত জোতদারেরা কৃষক সমিতির সঙ্গে একটা আপস মীমাংসায় পৌঁছতে বাধ্য হয়। চাতলের কৃষক সমিতি ও জোতদারদের সমস্যা নিয়ে একটি সালিশী বোর্ড গঠন করে। ফলে ছোট ছোট প্রায় ৫০ জন জোতদার, ভাগচাষীদের সঙ্গে আপস করে। বড় জোতদারেরা ভাগচাষীদের কোনও দাবী মানতে সম্মত হয় না।

এখানকারই অন্যতম ধনী জোতদার, ললিত বাগচী, ফটিক বাগচী ভাগচাষীদের বিরুদ্ধে পুলিশের শরণাপন্ন হয়। ফলে হিন্দু-মুসলমান কৃষকেরা একযোগে ভাগচাষীদের সামাজিক বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে বাগচীরা জেলা কৃষক সমিতির কাছে এক চিঠিতে বয়কট তুলে নেবার জন্য এক আপস প্রস্তাব পাঠায়। ১লা ফেব্রুয়ারি ব্যাস্টনের (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) কৃষক আন্দোলনের পীঠস্থান—

লেঙ্গুরা গ্রামে প্রবেশ করে এবং প্রায় ২৫টি কৃষকের ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত করে দেয়। পুলিশ এখানে কৃষক নেতা ললিত সরকারের সমস্ত ধান লুঠ করে নিয়ে যায়। ৫ই ফেব্রুয়ারি সুনন্দ-এ পুলিশবাহিনী প্রখ্যাত গণনেতা মণি সিং এবং স্থানীয় কৃষক নেতা ফণী গোস্বামীর বাড়ি তছনছ করে দেয়। এই পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট নেতা কমরেড ভবানী সেন এক বিবৃতি দেন (একটি কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী—ধরণী গোস্বামী)।

খাঁপুরের ঐতিহাসিক সংগ্রামের শহিদ যশোদা রানীর দুই ছেলে। দেবেন্দ্রনাথ সরকার (৬৯) এবং নরেন সরকার (৬২) আজও চরম দুঃখ এবং দুর্দশার শিকার। তাদের পরিবার অনাহারে ভুগছেন। বাম জমানায় তাদের দুর্দশা আরও বেড়েছে। '৯৫ সালের বন্যায় তাদের বাড়ি-ঘর সব ভেঙে যায়। কোনরকম সরকারি সাহায্য বা অনুদান তাদের জোটেনি। তেভাগা আন্দোলন ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামে—অংশ নেবার অপরাধে ৮ মাসের জেল হয়েছিল। প্রথমে ছিলেন দিনাজপুর, তারপর রাজশাহী জেলে। আজ অবধি দেবেনবাবুর পেনশন বরাদ্দ হয়নি।

১৯ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ ঐতিহাসিক তেভাগা সংগ্রামের ৫০তম বার্ষিকী। শহিদবেদীতে মাল্যদান এবং দুপুরে জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। জনসভায় বামপন্থী নেতা রামনারায়ণ গোস্বামী, অবনী লাহিড়ী, বিশ্বনাথ চৌধুরী, সূর্যকান্ত মিশ্র, প্রবোধ পাণ্ডা প্রমুখ বক্তব্য রাখবেন (সংবাদ দৈনিক উত্তরবঙ্গ)।

"খ্যাতনামা কবি এবং সাহিত্যিক গোলাম কুদ্দুস লিখেছেন নড়াইলে একজন কৃষক ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—এটা তেভাগা ধানের ভাত।......তাকে খুশি করার জন্য আমি সজ্ঞানেই এমন মুখভঙ্গি করেছিলাম যাতে তেভাগা ধানের ভাতে বিশেষ মিষ্টত্ব বুঝিয়ে দেওয়া যায়। দিনাজপুরে এসে ফুলবাড়ির মাঠে প্রথম তেভাগার ধানকাটা দেখলাম। একটা লাল নিশান পুঁতে রেললাইনের ধারে ধানকাটা হচ্ছিল। মাঝে মাঝে গানও গাওয়া হচ্ছে। একজন তামাক সাজছে সারাক্ষণ। কয়েকজন ভাত রাঁধার আয়োজন করছে। মাঠেই বনভোজনের ব্যবস্থা। খুশি এবং উত্তেজনা চেপে রাখা মুশকিল। কয়েকজন সাঁওতাল কৃষকের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম। এই সময় দার্জিলিং মেল পাস করে। হঠাৎ সেই দুরন্ত গাড়িটা মাঠের মধ্যে আমাদের কাছাকাছি এসে থেমে গেল। ড্রাইভার এবং ফায়ারম্যান হাসছে। হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছে। ইনকিলাব-জিন্দাবাদ বলতে বলতে কাস্তে হাতে একদল কৃষক ইঞ্জিনের দিকে দৌড়ে গেল। ওরাও গাড়ি থেকে পাল্টা ধ্বনি দিচ্ছে। গাড়ির যাত্রীরা হতবাক হয়ে এই কাণ্ড দেখছে। গার্ড ক্রমাগত তার ফ্ল্যাগ নেড়ে আর বাঁশি বাজিয়ে ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করছে। কিন্তু গাড়িটার নড়ার লক্ষণ নেই। কেননা এক কৃষকের হাত থেকে একটা লাল নিশান নিয়ে ইঞ্জিনের মাথায় বাঁধার প্রয়াস চলছিল।

চিরির বন্দর জায়গাটা দিনাজপুর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। ট্রেনে গিয়ে আবার কিছুটা হাঁটতে হয়। যে জায়গাটায় গুলি চলেছে সেটা বিরাট এক মাঠের মাঝখানে। চারিদিকে পাকা ধানের সমুদ্রে যেন ঢেউ খেলছে। একটা জায়গায় শুধু কিছু ধানের শীষ মাটি ছুঁয়েছে—বন্দুকের গুলিতে আহতদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে ধড়ফড়ানির ফল। কৃষকরা আমার হাতে কয়েকটা বুলেট উপহার দিল। পুলিশ কৃষকদের তাড়া করে গ্রামের প্রান্তে নিয়ে গিয়ে গুলি চালিয়েছিল। কতকগুলো গিয়ে মাটির দেওয়ালে ঢোকে। এরা সবাই মুসলমান। তাদের একান্ত ইচ্ছা এগুলি নিয়ে আমি কলকাতায় সোহরাওয়ার্দির হাতে তুলে দিই।"

প্রথম শহিদ শিবরাম সমিরুদ্দিন—

৪ঠা জানুয়ারি ১৯৪৭ সাল। চিরির বন্দর এলাকায় পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন কমরেড শিবরাম ও সমিরুদ্দিন। সমিরুদ্দিন ক্ষেতমজুর। শিবরাম গরীব সাঁওতাল আধিয়ার। তীর বিদ্ধ হয়ে একজন পুলিশও মারা যায় এখানে।

মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক জিগিরে মুসলমান সমাজে প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি পাকিস্থানের সমর্থক হয়ে পড়েন। অপরদিকে হাতে গোনা গেলেও শিক্ষিত বেশ কয়েকজন নেতা কৃষক আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। এঁরা হলেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ (দিনাজপুর) মোহাম্মদ ইয়াকুব মিঞা (কুমিল্লা) মুন্সি জহিরুদ্দিন (ময়মনসিংহ) আলতাব আলি (ঐ) আব্দুল কাদের (বগুড়া) গাইবান্ধার কছিম মিঞা, যশোরের নূরজালাল। তাছাড়াও ছিলেন চিয়ারশাই, নিয়ামত আলি, জমসেদ আলি চাটি, বাচ্চা মামুদ (রংপুর), সাবির মণ্ডল, মাতাবউদ্দিন মজিদ মিঞা (ময়মনসিংহ)। মোকসেদ আলি রহমান (গাঁইবান্ধা)।

রাজবংশীদের মধ্যে কম্পরাম সিং রাজসাহী জেলে ১৯৫০ সালে গুলিতে নিহত। রূপনারায়ণ রায় (নকশালপন্থীরা ২৩শে মার্চ ১৯৭৩) হত্যা করে। আভরণ সিং, রাম সিং (দিনাজপুর) ভোলানারায়ণ, দীনদয়াল, কালাচাঁদ (রংপুর)। হাজংদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর নেতা ললিত সরকার, বিপিন গুণ, পরেশ সরকার, কাঙাল দাস সরকার, নগেন্দ্র রায়, প্রসন্ন সরকার (ময়মনসিংহ)।

"তেভাগার ডাক কাকদ্বীপ থানার একপ্রান্ত বুধাখালি থেকে শুরু করে লয়ালগঞ্জ, ফ্রেজারগঞ্জ, অনাদিকে চন্দনপিঁড়ি, পাথরপ্রতিমা, রাক্ষসখালি, বুড়াবুড়ি তট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন বেরারলাট, ফটিকপুর, উকিলের লাটে বিস্তার লাভ করে। লয়ালগঞ্জের কৃষক গজেন মালী, বুধাখালির কমরেড যতীন মাইতিদের সঙ্গে আন্দোলন শুরু করেন। কাকদ্বীপের বিভিন্ন দ্বীপে সেটা দাবানলের সৃষ্টি করে। কৃষকদের পাল্টা আক্রমণে বিভিন্ন লাট থেকে জোতদার এবং কর্মচারী কাকদ্বীপ ছেড়ে কলকাতা এবং মেদিনীপুর চলে যায়। কিন্তু বেরারলাটে কাছারি থেকে গুলি চালিয়ে বহু কৃষককে জখম করে।" লিখেছেন কমরেড কংসারী হালদার।

"নন্দীগ্রাম-মহম্মদপুরে কৃষক নারীবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণে পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীর মোকাবিলায় নজীর সৃষ্টি করে। কমরেড বিমলা মাজীর অতুলনীয় বীরত্ব এবং কৌশলের দরুন। পাঁশকুড়া এবং চক গোপালে পুলিশ বাহিনীকেও নারীরা ঝাঁটা-বটিপেটা করে। শেষ পর্যন্ত আপোষে ৪০ ভাগ নিয়ে বহুক্ষেত্রে ৬০ ভাগই চাষীদের জন্য ছাড়তে বাধ্য করে।" এটা কমরেড ভূপাল পাণ্ডার বক্তব্য।

"জলপাইয়া মুঁই নারী, রংপুরে মোর বাড়ি
স্বামী বেচাইল ধনীর ঘরে।
ক্ষুধার পাগল প্রাণ পতিরে
মুঁই নারী দেহা বেচাইয়া খাই।"
মহৎ আছেন প্রধান আছেন
সবারইতো মা বোন আছেন।
মুঁই অভাগী পুঁছ সবার কাছে
ক্ষুধার জ্বালায়ে এদেশেতে রে
মা বোন কি হবে কেনা দাসী?"

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠাতা রংপুরের বিনয় রায়ের বোন রেবাদির রচিত, মনমাতানো মর্মান্তিক গনসংগীত। মন্বন্তর প্রতিরোধ হাটঘাটের বে-আইনি আদায়ের বন্ধের জন্য বিশাল কৃষক আন্দোলন রংপুর-দিনাজপুর-জলপাইগুড়ি হয়েই কোচবিহারকেও লড়াইয়ের ময়দানে এগিয়ে দেয়। দেশীয় রাজ্য বলেই যেখানে আটক রাখা যায়নি। কমরেড রাণী মুখার্জি, অনুরূপা চক্রবর্তী, খ্যাতনামা মহিলা নেতৃত্বের অন্যতম।

মাত্র তিন বছরের গোপন প্রস্তুতিতেই বকসির হাটে সর্বপ্রথম তুফানগঞ্জের নায়েব আহেলকার হেমন্ত বর্মণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা হয়। পোকালাগির ময়েজ মণ্ডলের মিথ্যা এবং সাজানো অভিযোগ গণআদালতে ধরা পড়ে। কমরেড চ্যাপড়া-মইশাল, সুন্দব বৈরাগী এবং রমানাথ সিংহ পরপর দাবী করেন হুজুর এখনই সত্য-মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যাক। সেদিন ছিল হাটবার। হাট এবং ঘাটে মাশুল আদায়ের জন্য আমাদের মহারাজার একটা নিরিখনামা আছে। উপস্থিত দশজনই বলুন আমরা রাজস্ব আদায় বন্ধ করতে চাই, না মহারাজা নির্ধারিত হারেই কেবল আদায়ের জন্য বলি। তার সঙ্গে বে-আইনি আদায় বন্ধের দাবী জানাই। একান্ত বেকায়দায় পড়েই নায়েব আহেলকার বাধ্য হলেন জনমত যাচাই করতে। যার মধ্যে তখন আর একজনও ছিল না যে মিথ্যা কথা বলে। হাজার জনতাই এক বাক্যে জানান নিরিখনামার একপয়সাও বেশি আদায় করা চলবে না। সেটা বে-আইনি। নীরবে নিঃশব্দে নায়েব আহেলকার হাতির পিঠে চেপে বিদায় নিলেন। সময়টা ছিল ১৯৪৬ সাল। কোম্পানীর রাজস্ব রংপুর-দিনাজপুর-জলপাইগুড়িতে যার কোনও সীমার বালাই একেবারেই ছিল না। কমরেড চণ্ডী পাল ন্যাশকার বর্মণেরও সেটা ছিল হাতে খড়ি।

রংপুর দিনাজপুর-জলপাইগুড়িতে প্রকাশ্য ব্যাপক প্রথম আন্দোলনই ছিল সেটা। কাঁঠালবাড়ি, বড়বাড়ি, উলিপুর, চিলাখানা হয়ে দিনাজপুরের আলোয়া খাওয়া মেলাতেই ব্যাপক বিস্ফোরণের আকার ধারণ করে। জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা এবং ত্রিপুরী কনফারেন্সের যেটা ছিল প্রাক্কাল।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, সি-পি-আই এবং সি-এস-পির মধ্যে সেটা চুক্তির কার্যপর্ব। যার যেখানে প্রভাব আছে, সেখানেই খণ্ড খণ্ড সংগ্রাম শুরু করা হবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েই কংগ্রেস প্লাটফর্ম থেকে সমস্ত সংগ্রাম একযোগে একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করে আপসহীন ব্যাপক সংগ্রামের ডাক দেওয়া হবে। দেশের বিপ্লব এবং স্বাধীনতার জন্য ছাড়তে হবে স্কুল-কলেজ। কোনটা বড় ডিগ্রী, চাকুরী? না দেশের স্বাধীনতা?

যারা অক্ষরে অক্ষরে এটা পালন করেন আমি তার এক জন। সুভাষবাবু ২০৩ ভোটে গান্ধীজির মনোনীত ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে জয়লাভ করেন। তার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই দিনাজপুর শহরে ৩০ হাজার মেহনতী জনতা কমিউনিস্ট নেতৃত্বে জড়ো হলেন। ডি-এম-অফিসের তার কাটা সমাপ্ত। আর ঠিক তখনই পার্টি নেতৃত্বের নির্দেশ এসে হাজির। Stop. Don't Proceed further. Suvash Babu is thinking otherwise. তেভাগার লড়াই হল তারই পরবর্তী ধাপ। নিজস্ব শক্তিতে নিজ নিজ এলাকায় ঝাঁপাইয়া পড়া। সুভাষচন্দ্র বসুর দেশত্যাগের আমরা পক্ষপাতী ছিলেম না। ১৯৪৫ সালে কমিউনিস্টদের কংগ্রেস ত্যাগ এই দেশত্যাগ প্রকল্পের দ্বারাই প্রভাবিত কিনা আমাদের তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। স্বাধীনতা সংগ্রামে কিংবা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আপামর জনতার রক্তমোক্ষম অবদানই হল প্রধান এবং শেষ কথা। সেখানে কিছু ফাঁক কিংবা গলতি থাকলে পরবর্তী দিনে তার খেসারত দান অবশ্যম্ভাবী। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরেও আজ আমরা তার শিকার। সেদিনের কথা সঠিক বিশ্লেষণ ছাড়া কমরেড জ্যোতি বসুর আজকের 'ঐতিহাসিক ভুলেরও' কোনও সঠিক সমাধানে তাই উপনীত হওয়া একান্তই অসাধ্য। তবু এটা ভালো।

সি-পি-আই এর কোচিন পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ডেলিগেট হিসেবে তাতে যোগদান করতে পারার। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাউথ ইস্ট এশিয়ার প্রতিনিধি কমরেড আর উইলিয়ানোভস্কি তাতে যোগদান করেন। কমরেড এস এ-ডাঙ্গে এবং ভবানী সেন তাঁর প্রশ্নের জবাবদিহি করেন। প্রশ্ন বলতে ছিল ধর 'তোমাদের নাগাল্যাণ্ড আজ স্বাতন্ত্র্য অর্জনকল্পে সশস্ত্র সংগ্রামে সোভিয়েত সাহায্য চাইলেন। আমরা কি তাতে সম্মতি জানাবো?' —নাগাল্যাণ্ড ভারত ভূখণ্ডের সংলগ্ন এলাকা। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার কোনও প্রশ্নই সেখানে আসেনা। আর পাকিস্থান থেকে পূর্ব পাকিস্থানের দূরত্ব এগারোশত কিলোমিটার। ঢাকা বাংলাভাষী, আর করাচি উর্দু। সংস্কৃতি এবং আচার-আচরণেও সামঞ্জস্যবিহীন। পরবর্তী ইতিহাস সর্বজনবিদিত।

মেদিনীপুরের কমরেড দেবেন দাশ এবং আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল কমরেড উইলিয়ানোভস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎলাভের স্থান মস্কো ক্লিনিক্যাল হসপিটাল। সময় ১৯৭৩ সাল। আমাকেই তিনি প্রশ্ন করেন তোমার কোচবিহারে বৃষ্টিপাত ছিল বছরে ন'মাস। আজ সেখানে তিনি চার মাসে এসে ঠেকেছে। কিছু ভেবেছ? না—আমি কোনও জবাব দিতেই পারিনি। তবে চেরাপুঞ্জির মতোই জানতাম। আমরা না ভাবলেও এত খবর রাখেন তিনি! 'বি ওয়েয়ার অব রোড, ইনবিটুইন চুংকিং টু সাদিয়া, এ্যাণ্ড সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, মান্দালয় টু চিটাগাং?'— একটা প্রশ্নের মধ্যেও আমরা সেদিন ঢুকতে পারিনি। দেবেনদা এবং আমার বকবকানি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এটুকুই কেবল বলতে পারি। অসুস্থ হলেও বাংলাদেশ সহকর্মীদের সেদিন বলেছিলাম কথাটা।

মস্কোতে পরিচিত ঘনিষ্ঠ সেদিন আর যাঁরা ছিলেন, কমরেড শান্তিদা, কান্ত রায়, গোপেন চক্রবর্তী এবং ননী ভৌমিক তার

অন্যতম। আর শেষোক্ত দু'জনের একজনও জীবিত নেই। মারা গেছেন ডাঃ শান্তিময় রায় পাশপোর্টের গোলমালে শান্তিদা কান্ত হয়ে গেছেন সেখানে। তাহোক। দীর্ঘ ত্রিশটি বছর পর প্রথম সাক্ষাতেই বললেন সুকান্তর সঙ্গে যখন দেখলাম তখন তো এপিলেপসি ছিলনা আপনার? তখন ফিট হতাম তিন-চার বছরে একবার। এখন সেটা মাসিক ব্যাপার। টি-বি-আর ডিসেন্ট্রির চিকিৎসাই করতে হয়েছিল আপনাদের। এতদিন পরেও সেটা মনে আছে আপনার? শান্তিবাবু সম্ভবত দেশে আর আসেননি তারপর। প্রশ্নেরই বাইরে আজ গোপেনদা এবং কমরেড ভৌমিক। বাংলাদেশের মণিরুজ্জমান এবং আব্দুর রসিদ? দু'জনই ছিলেন অ্যাডভোকেট। আজ যোগাযোগ বিহীন।

কমরেড বিনয় রায়, রেবা রায়, তুলসী লাহিড়ী, পানু পাল সবাই আমরা রংপুরের। আর রংপুর মানেই সেদিন কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন। যিনি একাধারে জেলা কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক। এমনই ছিলেন জলপাইগুড়িতে শ্রীশচীন দাসগুপ্ত এবং সিলেটেও তাই। কমরেড বীরেশ মিশ্র। মন্বন্তরের প্রাককালে চাল বিক্রয় করতে এসেও বসে আছেন বিক্রেতা। আর একটা পাত্র দিন মা।— আর একটা কেন? ঘরের ভেতর থেকেই জবাব দিলেন ক্রেতা। ওই পাত্রেই না আরও কত চাল ধরে! সে-আবার কী, বাইরে এসেই অবাক হলেন তিনি। সবই দেখছি পাথরকুচি! —আমিও মহাজন হলে মিশায়ে ফেলতাম। মা-বৌদিদের কষ্ট হবে এজন্য পৃথক করেই রেখেছি। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর দুখির ইমান। ছেঁড়া তার মানেও বলতে গেলে সেটাই।

মণিদা এ-আই-সিসির সদস্য ছিলেন। একবার নাম তুলে নিলেন পাছে শরৎচন্দ্র বসু হেরে যান—তাই। বিনয় রায়, সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস 'ভুখা হায় বাঙ্গালরে ভাইয়া, ভুখা হায় বাঙ্গাল' গান গেয়ে সুদূর পঞ্জাব থেকে যত গম আটা সংগ্রহ করেন, বয়ে আনবার জন্য মালগাড়ির দরকার পড়েছিল! বেজওয়াদা কৃষক সম্মেলনে দেখলাম—ভারতের স্বাধীনতা ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশকে।

সেবারই ১৯৪৩ সাল। ওয়ালটেয়ার স্টেশন প্লাটফর্মে আমরা অপেক্ষারত কোকনদগামী ট্রেনের জন্য। কোনটা যে আপ আর ডাউন বুঝতে পারিনি, একুশ জনের একজনও। খোদ স্টেশন মাস্টার ছুটে এসে আমাদের লোটা-কম্বল অপেক্ষমাণ ট্রেনের কামরায় তুলে দিতে লাগলেন। দেখাদেখি হাত লাগালেন আরও সব স্টাফ। পেছন পেছন আমরাও উঠে পড়লাম। তেলেগুতে সিটে বসা যাত্রীদের কী বলতেই উঠে গিয়ে আমাদের সবাইকে জায়গা করে দিলেন। দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে, ইংরেজের বিরুদ্ধে বঙ্গসন্তানদের আপসহীন যুদ্ধের জনাই এই প্রতিদান। রোগশয্যায় পাশাপাশি শুয়ে সুকান্তকে এসব বলতেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

১৯৫৮ সাল। মায়াভরম কৃষক সম্মেলনে প্রধান অতিথি দেশের বুকে প্রথম কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী কেরালার কমরেড ই-এম-এস নাম্বুদ্রিপাদ। ডেলিগেট' মিটিংয়ে কেরালার রাজস্ব মন্ত্রী কমরেড কে আর গৌরীকে প্রশ্ন করলাম এ পর্যন্ত কতটা জমি আপনারা জমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করতে পেরেছেন? তিনি বললেন আমরা হাত লাগালেও এখন পর্যন্ত খুব একটা সাফল্য লাভ করতে পারিনি। হাজার দশেক বিঘে হবে। আমি আমাদেরই কমরেড দেবী নিয়োগীকে দেখিয়ে বললাম প্রধানত এর নেতৃত্বে একমাত্র মাথাভাঙ্গা মহকুমাতেই আমরা বারো হাজার বিঘা জমি দখল এবং বণ্টন করেছি জমিহীনদের মধ্যে! কমরেড ই-এম-এস-এর পরেই মায়াভরম জুড়ে সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা তখন ওয়ান হ্যাণ্ড কমরেড 'দেবীন' নিয়োগী। সম্মেলন শেষে আমাদের দু'জনের জনাই পেলাম একটি জীপ। ত্রিবান্দ্রম-মাদুরাই থেকে কন্যাকুমারীকা ইচ্ছেমত ঘুরবার জন্য। সারাভারত কৃষকসভার বেজওয়াদা সম্মেলনে প্রথমদিনের শোভাযাত্রার শুরুতেই ছিলেন হাতির পিঠে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি এবং মুজফ্‌ফর আমেদ। প্রতিনিধিদের মধ্যেও সর্বাধিক কেবলমাত্র আমরাই ছিলাম ১১০ জন। পরবর্তী সম্মেলন নেত্রকোণাতেও তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

কোচবিহারের সীমান্তবর্তী চন্দনপাটে অনুষ্ঠিত হয় রংপুর জেলা কৃষক সম্মেলন। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি, প্রধান বক্তা। মেকলীগঞ্জের সেখ অধিকারী এক সম্মেলনেই সক্রিয় কৃষক কর্মী। কালোবাজার এবং মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে তিনি সমিতি সংগঠন করেন। রংপুরের ডোমার এবং ডিমলা তার নখদর্পণে। সে রাত্রে কমরেড সুনীল ঘোষ সহ আমি ছিলাম উচ্ছলপুকুরীতে রাজা দীনেশ্বরের ডেরায়। রাত্রি তখন বারোটা। হাকডাকে ঘুম ভেঙে যায়। ওঠ তাগদা করি। প্রশ্ন করে জানলাম বিচার দেওয়া খাইবে। দারগা ধরি আনিছি। মন্ত্রী ডালিম বানিয়ার কামারশালাত পাহাড়াদার সেনাপতি নবানু বর্মণ। কোমড়ে ন্যাংড়া, হাতত্ দড়ি। কমরেড শেম্বু এবং রাজা দীনেশ্বর সহ এগিয়ে গেলাম আমরা।

জামালদহ হাটে একসের চাল বেঁচি পাইবেন চার আনা। হ্যার দেখো একসের সুটকি মাছ হইল্ পাঁচ টাকা! দ্যাশত এমন আইন আকির পায়? আধামণ-চাইল হ্যাসকারী! শক্ত বিচার দেওয়া খাইবে। কিন্তুক দারগাটা পালে যাওয়া শেষ। মহিম দারগা। এইটাক তোমরা বিচার মতন দেও বেহার চালান দিস্ তার বাদে। রাজা দীনেশ্বরও এই মতে একমত। মন্ত্রী সতীশ সিংহও করা গেইচে। সব ভাটিয়াঘরের চালাকি। আলাখান দেখি কত ঘুষ কায় খান!

বেহার চালান দেওয়া ছাড়েন। যায় ধরি যাইবে ফিরি আসিবেনা একজনও। গলাত একখান পোস্টার থাকিবে—আমি ঘুষ খাইয়া ছিলাম। আরও বেশি সাজা চাইলে মাথাটা নেড়া কর। বাপ কিংবা মাও মরিলে মাথা নাড়িয়া করা খায়। ঐটা ধর্মে আঘাত। বললেন দীনেশ্বর। সেটাই কার্যকরী হল। একবেলা মিছিল শেষে জামালদহে নিয়েই আসামীকে মুক্তিদান ঘটে। গ্রামের উপর পুলিশি হামলা পরবর্তী ঘটনা। তবে শেম্বুকে পাওয়া যায়নি। পুলিশ তার সন্ধানে তোলপাড়।

সদর মহকুমার কালজানি নদীর ঘাটে পাওয়া গেল শম্ভু অধিকারীকে। মায়ের মৃত্যুতে তর্পণরত। জাপটে ধরল পুলিশ চারদিক ঘিরে! কি নাম বলতে হবে। মুণ্ডিত কেশ শম্ভু জানায়—আমি না হুজুর। আমার মা মারা গেছে। আমার নাম শম্ভু।—এক রদ্দা মারে পুলিশ। চালাকি রাখ। বাপের নাম পর্যন্ত ঠিক রাখেনা এই কমিউনিস্টরা। একটা একার কোন মামলাই' না। শম্ভু চালান হয়ে

যায়। পুলিশি বিচারের বছর কাবার হয়ে যাবার পরই শস্তুর এই দুরবস্থা।

মাথাভাঙ্গা মহকুমার খাগড়িবাড়ি গ্রামে পুলিশকে চড়চাপাটি মেরে আসামী ছিনতাইয়ের নির্দেশ দিলেন কমরেড দেবী নিয়োগী। যে কারণে গ্রামশুদ্ধ ৩৩ জনকে গ্রেপ্তারের পর মাথাভাঙ্গা জেলের দশজন মাত্র বন্দী রাখার সেলে সমস্ত কমিউনিস্টদের নিয়ে আটক রাখা হয়। সে এক দুর্বিষহ অবস্থা।

কালজানি গ্রামে তেভাগার দাবীতে ধান কাটতে গিয়ে ধরা পড়লেন কমরেড সুনীল ঘোষ। গেরস্ত নিজেই ধরা পড়লেন তারপর। তিনি কমরেড রমণী সিংহ। হাটে বে-আইনি আদায়ের প্রতিবাদে সর্বপ্রথম তুফানগঞ্জ এবং বকসিরহাটে হরতাল পালিত হয়। এই হরতাল সারা কোচবিহার জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। বেগতিক বুঝে পুলিশ কমিউনিস্ট নেতাদের বে-পরোয়া ধরপাকড়-শুরু করলে পৃথক জেলই করতে হয় কমিউনিস্টদের জন্য। সেটা দিনহাটা। কমরেড বীরেন দে সরকার, দেবী নিয়োগী, শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, সুনীল ঘোষ এবং রমণী সিংহ দিনহাটা জেলে বিনা বিচারে আটক বন্দী।

কেবলমাত্র জাতীয় পতাকা তুলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীনতা লাভের দিন এবং পরের দিনও তুফানগঞ্জে জনসভা করার অপরাধে আমি গ্রেপ্তার হলাম। কোচবিহারের রাজ-পতাকা সঙ্গে না তোলার অপরাধে। ৬ মাসের জন্য তারপর বহিষ্কারপূর্বক পূর্ব পাকিস্থানে নিয়ে ছেড়ে দিলে পাক পুলিশের হাতে পড়ার পূর্বেই আমি পালাতে সক্ষম হই, এবং গোপনে কোচবিহারেই ফিরে আসি। মেয়াদ গিয়ে প্রকাশ্যে বের হতেই পুনরায় গ্রেপ্তার এবং বহিষ্কারের নোটিশ। তাও ছয় মাসের জন্য।

১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি কোচবিহার পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারত সরকারের তরফে গ্রহণ করেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক আগের রাত্রেই দিনহাটা জেল ভেঙে সমস্ত কমিউনিস্ট বন্দীরা এক যোগে পলায়ন করেন।

জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগা আন্দোলনের একটি বিরাট অঞ্চল ছিল বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ, সুন্দরদিঘী প্রভৃতি। যা বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। তিস্তার ওপারে তেভাগার সংগ্রামে মাথা ফেটেছে কমরেড মাধব দত্তের। এখানে সংগ্রামী চাষীদের বড় অবলম্বন বলতে ছিলেন রেলের শ্রমিক ভাইয়েরা। ৩রা মার্চ দোমহনীতে শ্রমিক-চাষীদের যুক্ত সভা। রেল শ্রমিক, চা শ্রমিক এবং ভাগচাষীদের মিলিত সভার পরেই হাতে-নাতে তেভাগা। পয়েন্টস ম্যান মণি সিং তাঁর সঙ্গে মূর্তি গ্যাং এর বুধন, চালসা গ্যাং এর ট্রাফিক জমাদার যদুনাথ সিং এবং সামিল হলেন আরও অনেকে। বাতাবাড়ি, পাগলা দেউলিয়া বাড়িতে প্রথম তেভাগা হয়েছিল। বালগোবিন্দের মাঠে চলে প্রথম গুলি। মারা গেল চারজন। আহত হলেন ২২ জন। হতাহতের মধ্যে ছিলেন ওদলাবাড়ি চাবাগানের একাধিক শ্রমিক— পাতরাস মাঝি, বুধু উরাও, কর্মা খাড়িয়া, লছমন সিং।

মেটেলি থানার মহাবাড়ি থেকে মাল থানার পানোয়ার বস্তি প্রায় আট মাইল রাস্তা জাম করে তেভাগার সংগ্রাম তুঙ্গে উঠেছিল। পুলিশ গুলি চালাল। নিহত হলেন ৪ জন, আহত ৭ জন। নিহত একজন এক কিশোর। তার হাতে ছিল লালঝাণ্ডা। বালকটি যখন লুটিয়ে পড়ল কৃষকরা ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশের উপর। পুলিশের রাইফেল ছিনতাই হল। পুরিয়া মানকি মুণ্ডা মারা গেলেন পরবর্তীতে।

আত্মগোপন করে চলার পথে কমরেড পটল ঘোষ এবং বিমল দাশগুপ্তের নজরে পড়লেন জনৈক কৃষক। চেনার পর সবাই আনন্দে আত্মহারা। পরে একটি ভাঙা রাইফেল এনে বলল তার ছেলেকে পুলিশ খুন করায় পুলিশের এই রাইফেল আজ অবধি সে লুকিয়ে রেখেছে।

তেভাগা সৈনিকদের একজনকে মাল থানায় লুকিয়ে রাখার খবর পেয়ে হাজার দশেক শ্রমিক-কৃষক মাল থানা অবরোধ করেন। মাল মঙ্গলবাড়ি রোড ঘেরাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জলপাইগুড়ি থেকে এস-পি-রওনা দিলেন মাল থানা অভিমুখে। চালসার কাছে এস-পির গাড়িও আটক পড়ে যায়। তেভাগা সৈনিকরা তাকে জানিয়ে দিলেন—প্রবেশ নিষেধ। খবর এল মালবাজারে নেতাদের কাছে। সিদ্ধান্ত জানানো হল সঙ্গে কোনও পুলিশ থাকলে আটক রেখে এস-পিকে আসতে দাও। মাথার টুপি খুলে পায়ে হেঁটে আসতে হবে। জীপ চলছে খালি অবস্থায় তার পেছনে। থানায় এসে সব ঘর নেতাদের ডেকে দেখানো হল। কোনও ঘরেই আটক কেউ নেই।

পরের দিন ডেপুটি কমিশনার এসে নেতাদের ডাকলেন। সমর গাঙ্গুলী গেলেন না। পটলবাবু এবং কমরেড ননী ভৌমিক গেলেন। তাঁদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হল। জারী হল ১৪৪ ধারা। পুলিশ এবং মিলিটারীতে ছেয়ে ফেলল মালবাজার। ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হল (লিখেছেন কমরেড বিমল দাশগুপ্ত)।

কুড়িগ্রাম থেকে গাঁইবান্ধা নানা জায়গায় আমাদের সংগঠিত লংগরখানা। গাঁইবান্ধা কেন্দ্রেই ছিল আড়াইশত কচিকাচা শিশু। অভুক্ত আর পরিত্যক্ত মৃত্যুপথযাত্রী এতসব প্রাণের টানে হাজির হলেন সেখানে রংপুর জেলাবোর্ড চেয়ারম্যান জনাব আবুহোসেন সরকার। সঙ্গে ছিলেন সারা বাংলায় মুসলিমদের ঘরে প্রথম গ্রাজুয়েট মেয়ে খুবই সম্ভব দৌলতউন্নেসা খাতুন। চেয়ারম্যান তাঁর প্যাডে লিখলেন— জেলাবোর্ড রাস্তার পাশে অবস্থিত যে কোনও আমগাছ এতসব লংগরখানার প্রয়োজনে কমিউনিস্টরা কেটে নিতে পারবে।

আমরা প্রকাশ্যে থেকেই লংগরখানার খাদ্য খাবার সামাল দিতে নাজেহাল। চুরি সামাল দেবার জন্য সুধীরদাকে বললাম মীরাদিকেই এখানে কেয়ার-টেকার করুন। সুধীরদার বাল্যবিধবা ছোট বোন তিনি। তাই কার্যকরী হল। কিন্তু পরে পরেই সুধীরদা (কমরেড সুধীন মুখার্জি) এবং আমি বাধ্য হলাম আবার আত্মগোপন করতে। লংগরখানা নিয়ে তখন মহা সমস্যা। বিশেষ করে মীরাদির। দাদাকে তিনি চিঠিতে জানিয়েছেন—মনে হয় যে কোনও সময় আত্মহত্যা করি।

একই আণ্ডার গ্রাউণ্ড ডেন-এ আমরা দু জন। সুধীরদা গেছেন স্নান করতে। দেখা বে-আইনি সত্ত্বেও ছোট্ট লেখাটা পড়ে ফেললাম। সম্ভবত সামলে রাখতে ভুলে গিয়ে থাকবেন। "দুঃখ এবং দারিদ্র্য কোনটাই ভাল লাগিবার জন্য নহে। উপরন্তু চাহিলেই সুখের সন্ধান পাওয়া যায় মনে করা ভুল। তবে দারিদ্রের মূল কারণ দূর করিবার আন্দোলনের মধ্যে আনন্দ আছে। একমাত্র প্রশ্ন তেমনি মনোভাব

আমরা গড়িয়া তুলিব কিনা!" সুধীরদা আছেন কাজিডাঙ্গা-ব্যাণ্ডেলে। কমরেড রাণী মুখার্জি তাঁরই স্ত্রী। তৎকালীন রাজা নেতৃত্বের জীবিত সদস্যদের মধ্যে কমরেড অবনী লাহিড়ী এবং সুধীর মুখার্জি অন্যতম। অনুরূপা চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর মা এবং কমরেড জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর পিসীমা। দেশীয় রাজ্য কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির পূর্বরাত্রেই দিনহাটা জেল ভেঙে পলাতক ৭ জন কমিউনিস্ট বন্দীদের তিনি অন্যতম। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন কমরেড দেবী নিয়োগী, বীরেন দে সরকার, শিবেন চৌধুরী, সুনীল কুমার ঘোষ এবং রমণীমোহন সিংহ রায়।

ব্রিটিশ সরকারের হিসেবেই আগস্ট আন্দোলন দমনে ৮টি ব্রিটিশ ব্রিগেড, ৫৭টি ভারতীয় ব্যাটেলিয়ান নিয়োজিত হয়। গুলি চলে ৫৩৮টি ক্ষেত্রে। প্লেন থেকেও মেশিনগান জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মতে নিহতের সংখ্যা দশ হাজারের অনুরূপ। গ্রেপ্তার হন ৬০২২৯ জন। শাস্তিপ্রাপ্তের সংখ্যা ২৭ হাজার। ১৮ হাজার বিনাবিচারে দীর্ঘদিন আটক থাকেন। সব চাইতে বড় কথা জনতা ছিলেন একেবারেই নিরস্ত্র। সত্যাগ্রহ এবং আইন অমান্যের ইতিহাসে এটা এক বিরল ঘটনা।

স্বাধীন ভারত কী জয়, বন্দেমাতরম ধ্বনি দেওয়াই ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু দেশে না হলেও শতাধিক জায়গা ছিল এমনি যেখানে সত্যাগ্রহী কিংবা ধৃত আইন অমান্যকারীদের হাজতে এনে ঢুকাতে পারা ছিল সম্পূর্ণ অসাধ্য। কেননা উন্মত্ত জনতা এসে মহোল্লাসে তাদের ছিনিয়ে নিয়ে যান! বিহার, ইউ-পির একাংশ, মেদিনীপুর, কালিয়া বস্তী তার অন্যতম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। রাজ্য বামফ্রণ্ট সরকার প্রকাশিত Indias Struggle For Freedom.

২। সপ্তাহ—৪৭, শশীভূষণ-দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২।

৩। দৈনিক উত্তরবঙ্গ শিলিগুড়ি।

৪। প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা শ্রদ্ধাভাজন কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন, কমরেড সরোজ মুখার্জি ও শ্রীসুধীর মুখার্জি (কাজিডাঙ্গা)।

৫। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তী, বালুরঘাট, অধ্যক্ষ তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়।

—কমিউনিস্ট ও স্বদেশী আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ শত সহস্র শহিদদের স্মৃতিতে।

বিকান থেকে আলুরে কাইয়া
হাতে লইয়া ঘটি,
আস্তে আস্তে নিলুরে কাইয়া
মোদের দেশের মাটি।
কোন দেশের নাড়িয়া কাইয়ারে
মোর দেশে আলুরে কাইয়া,
মোরে মাটি নিলু,
পেটের ভোখে তেভাগা চাইতে
মাথাতে ডাঙ্গালু।
কোন দেশের নাড়িয়া কাইয়ারে।
কাইয়া কান্দে কাইয়ানী কান্দে
কান্দে কাইয়ার মাও
মণি সেনের মাথায় ডাঙ্গেয়া
কি করিস উপায়
কাইয়া কান্দে রে।

—অজ্ঞাতনামা

তেভাগা আন্দোলন

কৃষক সংগ্রামে এক দিকচিহ্ন

নরহরি কবিরাজ

কৃষক আন্দোলন ভারতে মোটেই নতুন বিষয় নয়। ঔপনিবেশিক শাসনের আমলে সারা দেশ জুড়ে ছোট-বড় অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এর মধ্যে কয়েকটি বড় বড় কৃষক আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৭৮৩ খ্রি রংপুরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব নীতির প্রতিবাদে এক বড় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে বড় বড় সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শাসনকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। এগুলির মধ্যে বাংলায় পাগলপন্থীদের বিদ্রোহ (১৮২৫-২৬), তিতুমিরের বিদ্রোহ (১৮৩০), ফরাজী আন্দোলন প্রভৃতির নাম করা চলে, ১৮৩০ খ্রীঃ মহীশূরে রীতিমত এক কৃষক অভ্যুত্থান দেখা দেয়, পার্বত্য জাতীয় লোকদের মধ্যে বিক্ষোভ কোল বিদ্রোহ (১৮৩০), সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) মধ্যে দিয়ে ফেটে পড়ে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে কৃষকেরা ব্যাপকভাবে যোগ দেয়, যদিও এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিক্ষুব্ধ অভিজাত নেতারা। মহাবিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে ইংরেজ শাসনের রূপ নগ্ন আকারে প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে কৃষকদের আন্দোলনও তীব্রতর আকার ধারণ করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংগ্রামের পদ্ধতিতেও কিছু নতুনত্ব দেখা দেয়। এই যুগের প্রধান কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে বাংলায় নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০), পাবনার প্রজাবিদ্রোহ (১৮৭৩), দাক্ষিণাত্যের মহাজন বিরোধী বিদ্রোহ (১৮৭৫), দক্ষিণ ভারতে বিশাখাপত্তনম অঞ্চলে রাম্পা বিদ্রোহ (১৮৭৯), মালাবারে দীর্ঘস্থায়ী মোপ্‌লা বিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত কৃষক বিদ্রোহগুলির পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এগুলি ছিল শক্তিশালী প্রতিরোধ। নিপীড়নে পিষ্ট মরিয়া কৃষকদের হঠাৎ ফেটে পড়া স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ। স্বতঃস্ফূর্ত হলেও এই বিদ্রোহগুলির মূল্য কম নয়, কেননা এই

বিদ্রোহগুলি জীবন থেকে উদ্ভূত কতকগুলি প্রধান প্রধান সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে চেয়েছিল। এই বিদ্রোহগুলি চোখের সামনে তুলে ধরেছিল ঔপনিবেশিক শাসনের উৎপীড়নের বিভিন্ন দিক, খাজনা বৃদ্ধি ও উচ্ছেদ, মহাজনী উৎপীড়ন, বেগার প্রথা, দুর্ভিক্ষজনিত সমস্যাগুলি। কাজেই এগুলিকে 'অন্ধবিদ্রোহ' বলে অবহেলা করা উচিত নয়। লক্ষ করার বিষয়, এই বিদ্রোহগুলি ছিল সাধারণ জ্ঞান ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত। হিন্দু ও মুসলমান কৃষক হাতে হাত বেঁধে লড়াই করেছিল, কেননা তারা বুঝতে পেরেছিল ঐক্যেই শক্তি। উপজাতি বিদ্রোহগুলিতে উপজাতিরা (যেমন—সাঁওতাল, কোল) হিন্দু সমাজের তথাকথিত নীচু জাতির লোকদের সঙ্গে—যারা ছিল তাদের মতোই গরীব, দৃঢ় ঐক্য স্থাপন করেছিল। কাজেই এই বিদ্রোহগুলিতে অবশ্যই একধরনের চেতনার আভাস লক্ষ করা যায়।

তবে এই বিদ্রোহগুলিকে আবার অতি আদর্শায়িত করে দেখা ঠিক নয়। এগুলি ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, আঞ্চলিক বিদ্রোহ।

বিদ্রোহীরা দুর্ভেদ্য জঙ্গল বেছে নিয়ে গেরিলা যুদ্ধের আশ্রয় নিয়েছে। ব্যারিকেড তৈরি করে সেনাবাহিনীর প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করেছে, কিন্তু এত বীরত্ব সত্ত্বেও লাঠি হাতে কৃষক আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর সামনে অসহায় বোধ করেছে। তাদের পরাজয় ছিল পূর্বনির্ধারিত এক ঘটনা।

ইতালীতেও বারবার এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল এবং বারবার তারা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। গ্রামসি লিখেছেন—এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহগুলিকে আধুনিক চিন্তায় সমৃদ্ধ করতে হবে, নতুবা এদের পরাজয় থেকে রক্ষা করা যাবে না (Gramsii-Prison Note books)।

আমাদের দেশেও প্রধান কাজ ছিল কৃষকদের আধুনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা। তাদের মধ্যে সমগ্র দেশ সম্পর্কে চেতনা সঞ্চারিত করা, ঔপনিবেশিক শাসনের উচ্ছেদের প্রশ্নটি সম্পর্কে তাদের অবহিত করা। পরবর্তীকালে এই চেতনা তাদের মধ্যে এসেছে। তবে তা তাদের আহরণ করতে হয়েছে বাইরে থেকে।

মহা-বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা দেশের মধ্যবিত্তদের মধ্যে উপনিবেশবাদ-বিরোধী চেতনা জাগ্রত করেছিল। বাংলা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শুধু জাতীয় সমস্যা নয়, কৃষক সমস্যা সম্পর্কেও ক্রমশ সজাগ হতে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জাতীয় কংগ্রেসকে ঘিরে ভারতে জাতীয়তাবাদ একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে থাকে। শত শত কৃষক গান্ধী নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনগুলিতে যোগ দেয়, যেমন—চম্পারণ, খেদা, বার্দৌলি। উপজাতি কৃষকেরাও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়—বিহারে টানা ভগত ও সাঁওতালেরা, বাংলায় রাজবংশীরা জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করে। তবে যেহেতু গান্ধী পরিচালিত এই আন্দোলনগুলি ছিল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং কৃষকদের মূল দাবিগুলি সম্পর্কে উদাসীন, তাই কৃষকেরা এই আন্দোলনগুলিতে যোগ দিলেও বেশি উৎসাহিত বোধ করেনি।

ভারতে কৃষক আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় কৃষক সভার নেতৃত্বে। "সারা ভারত কৃষক সভা" প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে। লাল পতাকার নীচে, বৈপ্লবিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কৃষক সভা গড়ে তুলতে চেষ্টা করে এক রাজনীতি-সচেতন, শ্রেণী-সচেতন কৃষক আন্দোলন। কৃষক সভার নেতারা বলতে থাকেন—স্বাধীনতা আন্দোলন যদি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় তাহলে কৃষকের সমস্যার সমাধানের কথা ভাবতে হবে। তারা এক নতুন ধরনের জাতীয় বিপ্লবের কথা বলতে থাকেন, কৃষি বিপ্লব হবে যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। (মুজফ্ফর আহমদ-কৃষক সমস্যা, ১৯৩৬)।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, কৃষক সমস্যা সমাধানের লক্ষ নিয়ে কৃষক সভার পক্ষ থেকে একটি বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়—যার অন্যতম মূল ধ্বনি হল জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ। তাছাড়া, মধ্যযুগীয় শোষণ প্রথা, যেমন—ভূমিদাসত্ব, নজরানা, বেগার প্রভৃতির বিরুদ্ধেও আন্দোলন আরম্ভ হল।

তেভাগা এই নতুন ধরনের কৃষক আন্দোলনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তেভাগা আন্দোলন ছিল বর্গাদার বা ভাগচাষীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। ফ্লাউড্ কমিশনের রিপোর্ট (১৯৪০) থেকে জানা যায়, ৭৫ লক্ষ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ৩০ লক্ষ পরিবারের জমিতে প্রজাস্বত্বের অধিকার ছিল না, তারা ছিল হয় মজুরিজীবী অথবা ভাগচাষী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বছরগুলিতে ইংরেজের হৃদয়হীন শোষণনীতি বাংলার কৃষকদের জীবনে এনেছিল ঘোর অমানিশা। পঞ্চাশের মন্বন্তর এরই ফলশ্রুতি। সবার আগে ভূমিহীনরা, ভাগচাষীরা ও গরীব কৃষকেরা এই মন্বন্তরের বলি হল। মন্বন্তরের পরেই চাষীদের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে গ্রামাঞ্চলে এক ক্ষুদ্র শোষকশ্রেণী—জোতদার-মহাজন—ফুলে-ফেঁপে উঠল। গরীব কৃষকেরা নিজের জমি জোতদারের কাছে বিক্রি করে সেই জমি চাষ করতে লাগল ভাগচাষীরূপে। সমস্ত জমি, সমস্ত সম্পদ জোতদারদের হাতে কেন্দ্রীভূত হল। এই অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কৃষক সভা আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬)।

তেভাগা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে দিনাজপুর, তাছাড়া, রংপুর, জলপাইগুড়ি, যশোহর, পাবনা, ময়মনসিংহ জেলায়, চব্বিশ পরগণায়, মেদিনীপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলাতেও এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল ভাগচাষীরা ফসলের আধাভাগের বদলে তিনভাগের দুইভাগ নেবে—বেআইনি কোনও আদায় জোতদার মহাজনকে দেওয়া হবে না। প্রচলিত প্রথা ছিল—জোতদারের খেলানে সমস্ত উৎপন্ন ধান জমা করতে হবে। এখন আওয়াজ উঠল—জোতদারের খেলানে ধান-তোলা হবে না, ধান তুলতে হবে নতুন খেলানে অর্থাৎ, ভাগচাষীদের দশজনের খামারে। আওয়াজ উঠল—"জান দিব তবু ধান দিব না", নির্দেশ দেওয়া হল—জোতদারের সাহায্যে যখন পুলিশ আসবে, ৪৪ ধারা জারি হবে, তখন ৪৫ জারি করতে হবে জোতদারের বিরুদ্ধে সমিতির হুকুমে। অর্থাৎ, জোতদারের দালাল ও লাঠিয়ালদের গ্রেপ্তার করতে হবে। জোতদারের শক্তিকে অচল করে দিতে হবে। যেমন কথা তেমনই কাজ।

তেভাগা আন্দোলনের আরেকটি বড় সাফল্য—নিরক্ষর, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অনগ্রসর কৃষক সমাজকে এক মানবিক ও গণতান্ত্রিক চেতনায় সঞ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। মুসলিম, উপজাতি, রাজবংশী, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির কৃষকদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য সামাজিক ব্যবধান ছিল। তেভাগা আন্দোলন এই ব্যবধান দূর করে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে কৃষকদের এক পতাকার নীচে সমবেত হতে শেখাল। মুসলমান, উপজাতি, রাজবংশী প্রভৃতির মধ্যে থেকে প্রথম সারির একদল নেতার আবির্ভাব ঘটল।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে সমিতির সংগঠিত এলাকাগুলিতে ধান উঠে গেল নিজ খামারে বা দশের খামারে।

আন্দোলনের সাফল্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। এমনকি, সরকার এই সময়ে তেভাগা ন্যায্য এই কথা স্বীকার করে প্রেস নোট জারি করলেন। ওই জানুয়ারি মাসেই খবর পাওয়া গেল বর্গাদার বিল রচিত হয়েছে এবং আইন সভায় তা উঠবে।

কিন্তু এই সাফল্যই নতুন সমস্যা সৃষ্টি করল। সুবিশাল অসংগঠিত এলাকায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল ও কৃষক সভার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে হিন্দু-মুসলিম জোতদারেরা সংগঠিত হয়ে জোতদার সমিতি গঠন করল। আইনসভায় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মিলিত হয়ে বর্গাদার বিলের বিরোধিতা করল। আরম্ভ হল প্রচণ্ড দমননীতি। এক দিনাজপুর জেলাতেই পঁচিশ হাজার সংগ্রামী কৃষককে জেলে ভর্তি করা হয়। দিনাজপুর জেলায় বন্দুকের গুলিতে মৃত্যুবরণ করে ৩৩ জন কৃষক, জলপাইগুড়িতে ১৪ জন, ময়মনসিংহে ২ জন। সারা বাংলায় ৬০ থেকে ৭০ জন নরনারী মৃত্যু বরণ করল।

তেভাগা আন্দোলনের সাফল্য এইখানে যে বর্গাদারদের দাবি যে ন্যায্য এটি সাধারণভাবে স্বীকৃতি লাভ করল। এই দাবিকে আর বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা গেল না। ১৯৪৯ খ্রীঃ (অক্টোবর, নভেম্বর) অর্ডিন্যান্স জারি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তেভাগার দাবি আইনত মেনে নিলেন।

তেভাগা আন্দোলনের আর একটি বড় সাফল্য—নিরক্ষর, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অনগ্রসর কৃষক সমাজকে এক মানবিক ও গণতান্ত্রিক চেতনায় সঞ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। মুসলিম, উপজাতি, রাজবংশী, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির কৃষকদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য সামাজিক ব্যবধান ছিল। তেভাগা আন্দোলন এই ব্যবধান দূর করে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে কৃষকদের এক পতাকার নীচে সমবেত হতে শেখাল। মুসলমান, উপজাতি, রাজবংশী প্রভৃতির মধ্যে থেকে প্রথম সারির একদল নেতার আবির্ভাব ঘটল। মেয়েরা তেভাগা সংগ্রামে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজবংশী ও নমঃশূদ্র মেয়েরা নিজেদের বীরত্বের গাথা রচনা করে আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। কোনও বড় আন্দোলনই আবেগ ছাড়া গড়ে ওঠে না। এই আবেগের দিকটা শিল্পী সোমনাথ হোরের বই-এ অঙ্কিত রয়েছে।

১৯৪৬-৪৭ সালে মুসলীম লীগের প্রচারে মুসলিম জনসাধারণ ছিল বিভ্রান্ত। শুধু তাই নয়, ১৯৪৬ খ্রীঃ আগস্ট মাসে কলকাতায় ও অন্যান্য স্থানে যে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয় তার ক্ষত তখনও বাংলার বুক থেকে শুকিয়ে যায়নি। এই পটভূমিতে কৃষক সমিতি নিঃস্ব ও গরীব মুসলিম কৃষকদের এক বড় অংশকে তেভাগা আন্দোলনে সমবেত করতে সক্ষম হয়েছিল। সংগ্রামের ময়দানে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করতে পারে না—এটা তেভাগা আন্দোলন নতুন করে প্রমাণ করল।

জাতীয় নেতাদের দ্বারা পরিচালিত কৃষক আন্দোলন ছিল সংস্কারবাদী। যখনই কৃষকেরা শ্রেণীদ্বন্দ্বের অঙ্গনে প্রবেশ করত তখনই তা নেতাদের নির্দেশে বন্ধ করে দেওয়া হত। গান্ধীজি স্পষ্ট ঘোষণা করেন—শ্রেণীসংগ্রাম ভারতের মাটিতে অচল।

তেভাগা আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিতে পরিচালিত কৃষক আন্দোলন। তেভাগার দাবি ছিল কৃষকের নিজস্ব দাবি। নিজেদের অধিকার সাব্যস্ত করার তাগিদে শ্রেণীসংগ্রামের অঙ্গনে এসে হাজির হল কয়েক লক্ষ কৃষক।

কংগ্রেস পরিচালিত কৃষক আন্দোলন ও কৃষক সভা পরিচালিত কৃষক আন্দোলনে এখানেই মূল পার্থক্য।

তেভাগা আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য—এটি ছিল রাজনীতি সচেতন আন্দোলন। কমিউনিস্ট পার্টি ছিল এই আন্দোলনের সংগঠক। আন্দোলনের কর্মসূচি ও কর্মকৌশল পার্টি কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়েছিল। পার্টি পরিচালিত আন্দোলন বলেই এই আন্দোলন কোনও আঞ্চলিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এক পার্টির নেতৃত্বে এক দাবি নিয়ে উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, নিম্নবঙ্গের কৃষকেরা একসঙ্গে এক আওয়াজের ভিত্তিতে লড়াই চালাতে সক্ষম হয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত আন্দোলন বলেই এতো শিক্ষিত নেতা ও ক্যাডার কৃষকদের সঙ্গে মিশে কৃষকদের মনে সাহস ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করতে পেরেছিল এবং কৃষকদের চেতনার মান উন্নয়নে সাহায্য করেছিল।

সম্প্রতি তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে কোনও কোনও গবেষক বলতে চাইছেন—এই আন্দোলনকে যতটা জঙ্গী বলে দাবি করা হয় প্রকৃত ঘটনা তা ছিল না। কেননা, এই আন্দোলন কোনও সময়েই

জোর করে জোতদারের জমি দখল করতে অথবা পাল্টা সরকার গঠন করতে চেষ্টা করেনি। (Dhanagare)।

এই অভিযোগের কোনই ভিত্তি নেই, কেননা কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনকে কোনও সময়েই ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম হিসেবে দেখেনি, দেখেছিল একটি আংশিক সংগ্রাম হিসেবে—সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার মধ্যে বহু প্রচলিত একটি বিশেষ ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল।

তবে এই আন্দোলনের দুর্বলতা ছিল না এমন নয়। পার্টির সবলতা-দুর্বলতা দুই-ই এই আন্দোলনে প্রতিফলিত হয়েছিল। একটি বহু শ্রেণীবিশিষ্ট সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থেই গ্রামাঞ্চলে অ-কৃষক গণতান্ত্রিক মানুষের সহযোগিতা ও সারা বাংলায় গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষদের (বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রগুলির একাংশের) সমর্থন একান্ত প্রয়োজন ছিল। আন্দোলনের সংগঠকেরা এই দিকটি সম্পর্কে বেশ কিছুটা উদাসীন ছিলেন। এই দুর্বলতার কথা পরবর্তীকালে পার্টির নেতারা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন, আত্মসমালোচনার মধ্যে দিয়ে এই প্রসঙ্গে ভবানী সেন, মণি সিংহ, কৃষ্ণবিনোদ রায়ের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—**তেভাগা সংগ্রাম** নামক স্মারক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

এই ধরনের কিছু-ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তেভাগা কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক দিক্‌চিহ্ন হয়ে থাকবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র

(১) তেভাগা সংগ্রাম —রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ—কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত। এটি এই আন্দোলন সম্পর্কে একটি আকর গ্রন্থ। এই বই-য়ে আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা ও সংগঠকদের বক্তব্য সংগৃহীত রয়েছে।

(২) সুশীল সেন স্মারক গ্রন্থ—অশোকনগর সুশীল সেন স্মৃতিরক্ষা সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে পঠিত বিভিন্ন প্রবন্ধ।

(৩) তেভাগার ডায়েরী—সোমনাথ হোড়, (সুবর্ণরেখা) . Tebhaga—Somnath Hore (Seagull)।

(৪) Peasant Movements in India (1920-47)—Dhanagare.

খাঁপুরে শহিদস্তম্ভ

তেভাগা সংগ্রামের পৃষ্ঠপট

সুধী প্রধান

তেভাগা আন্দোলন ও সংগ্রামের ২টি পর্যায় আছে। এটা বলে না রাখলে আজকের দিনে এর তাৎপর্য গ্রহণ করতে আমরা বিপথে চালিত হতে পারি। প্রথম পর্বে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যুগে তেভাগা আন্দোলন-সংগ্রাম; দ্বিতীয় পর্বে ব্রিটিশ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের পরের তেভাগা সংগ্রাম। প্রথম পর্বের পিছনে ছিল—বাংলাতে লর্ড কর্নওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী জমিদারি প্রথা প্রতিষ্ঠার পর সেই প্রথার বিরুদ্ধে জমিদার শ্রেণীর কিছু চিন্তাশীলদের সমালোচনার ফলশ্রুতিতে কৃষক আন্দোলনের সংগঠিত রূপে-জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ এবং তার সঙ্গে জমির স্বত্বহীন কৃষকদের আংশিক দাবি ভাগচাষীদের দাবি আদায়ের আন্দোলন।

সমগ্র বিষয়টির বৈজ্ঞানিক বিচার দাবি করে যে, প্রথমেই জানা দরকার ভারত ভূমির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় এবং তার পর কৃষক কারা এবং কেমন করে তারা জমির স্বত্বহীন হল। এই পরিচয়ে নৃতত্ত্বের বিচারে কেবল এই কথাটাই মনে রাখা দরকার যে, প্রাকৃতিক বিবর্তনে ভারতভূমি মধ্য এশিয়ার তুলনায় জল-বায়ু, মাটি ও বনজঙ্গল মানবজাতির বসবাসের পক্ষে আকর্ষণীয় ছিল বলেই দলে দলে মানুষ পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে ভারতে এসেছে। সিন্ধু সভ্যতার যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে মনে করার কারণ আছে যে, বহিরাগতরা এদেশের অধিবাসীদের পরাস্ত করেই এদেশে বসবাস শুরু করে। পরাজিতের যারা পালিয়ে বেঁচেছে তাদের জন্য জায়গার অভাব ছিল না। বিরাট ভারত ভূমিতে লোকাভাবই ছিল সে দিনের বাস্তবতা। শিকারের উপর জীবনধারণের নির্ভরতা যখন কৃষিকার্যের দ্বারা হ্রাস পেল তখন অনেক মানুষকেই সে কাজ করতে হয়েছে। হিন্দুদের মূল শাস্ত্র বেদ বলছে পাশা খেলা ছেড়ে কৃষিকাজে মন দিলে গরু এবং স্ত্রী মিলবে। স্ত্রী, গরু ও জমির থেকে বড় সম্পদ তখনকার ভারতে মানবজাতির পক্ষে আর কিছুই

ছিল না। এর পরের প্রশ্ন স্ত্রী ও গরু কোথা থেকে পাবে? ভূমি কোথা থেকে পাবে? যাদের পরাজয় করে বৈদিক সভ্যতা তৈরি হয়েছিল—তাদের বধূ ও কন্যা এবং গৃহপালিত পশুগুলি বিজয়ী গোষ্ঠী দখল নিত। আর ভূমি তো ছিলই দখলদারি ও বেদখল এলাকাতে। জমি কার— তার উত্তরে হিন্দু শাস্ত্র বলছে: নিহত পশুকে যে শিকারি প্রথম তীর হানে—সেই পশু যেমন তার প্রাপ্য তেমনই যে মানুষ একখণ্ড ভূমি চষে, আল বাঁধে এবং চাষযোগ্য করে সেই উক্ত জমির মালিক। অর্থাৎ লাঙ্গল যার ভূমি তার নীতির পক্ষেই যায় এই শাস্ত্র বচন। মুসলিম ধর্মেও আছে—পৃথিবী আল্লাহ-এর সৃষ্টি, কোনও একটি মানুষ ভূমির অধিকারী নয়। সামন্ততান্ত্রিক যুগে জমির প্রকৃত অধিকার কি সামন্ত নরপতিদের ছিল? ভারতে কবে থেকে ইউরোপীয় ধাঁচে সামন্ততন্ত্র শুরু হয়েছে—এই নিয়ে যে সব বিতর্ক আজও চলছে—এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে আলোচনা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকে জমির স্বত্ব এবং গ্রাম সমাজের চরিত্র নিয়ে যে গবেষণা চলছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা দরকার তেভাগা আন্দোলনের চরিত্র বুঝাতে গেলে।

ব্যবসাদারীর সঙ্গে যখন বিরাট ভারত সাম্রাজ্য ব্রিটেন পেল—যে ব্রিটেনের জনসংখ্যা বাংলার চারটি জেলার জনসংখ্যার বেশি নয়। ১৭৪০-৫০ সালে ওয়েলস সমেত ব্রিটেনের জনসংখ্যা [৬০-৭০] লক্ষ এবং ১৮০১ সালে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনা জেলার জনসংখ্যা ৬০ লক্ষ। তখন ব্রিটিশ শাসক বর্গের প্রথম কাজ হল ভারতের প্রধান উৎপাদন ব্যবস্থা ভিত্তিক গ্রাম সমাজের চরিত্র বোঝা এবং তার থেকে তাদের সম্যক সংগ্রহ করা। শোষণ ও শাসনের পক্ষে এ কাজ জরুরি বোধ করেছিল ইংরেজ কারণ ১৭৬৩ থেকেই সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসকদের শঙ্কিত করে তুলেছিল এবং সেই সব বিদ্রোহে গ্রাম সমাজের কাদের পক্ষে দাঁড়ালে এদেশে ব্রিটিশশাসনের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে এটা তাদের বিবেচনার বিষয় ছিল। প্রয়োজন বোধে নতুন শ্রেণী আর সহায়কদের দিয়ে তৈরি করার ব্যবস্থা ছিল। ফলে মোগল যুগে জমির উপর বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার এবং রাষ্ট্র ও বিভিন্ন সরকার বর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের কাজ অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে ইংরেজ শাসকশ্রেণীর একাংশ মনে করেছিল। শাসন শোষণের প্রয়োজনে পুরনো ব্যবস্থার কতটুকুর সঙ্গে আপস করবে—আর কতটুকু ভাঙবে এটাই তাদের বিচার্য বিষয় ছিল। এটা শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রশ্নেই ছিল না। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ও সাম্রাজ্যবাদের নীতি কি হবে তার সঙ্গে এই চর্চা জড়িত ছিল। সাম্রাজ্যবাদের আপন তাগিদেই গড়ে উঠল প্রাক উপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর ইতিহাস চর্চা। মেইন, মেটকাফ, এলফিনস্টোন, মনরো, ফিলিপ ফ্রান্সিস, মোর প্রমুখ সেই চর্চার সূচনাকার।

তারা গ্রাম সমাজ বলতে প্রধানে ভেবেছিলেন—জমিতে যৌথ মালিকানা। মেইনের ভাষায়—'গ্রামীণ সমাজ হল একটি সংগঠিত ও স্বয়ংক্রিয় পরিবার গোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের উপর যৌথ মালিকানার অধিকারী'। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল—গ্রামীণ সমাজের বিচ্ছিন্নতা। চার্লস মেটকাফের ভাষায় গ্রামীণ সমাজ হল-'ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র যারা নিজেদের চাহিদার সব কিছুই নিজে মেটায় এবং বাইরের কোনও রকম সম্পর্ক থেকে প্রায় মুক্ত'। এই সমাজ হল স্থাণু। যখন কোনও কিছুই টেঁকে না তখনো তারা টিকে থাকে। একের পর এক রাজবংশ ভেঙে পড়ে। বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ হয়। কিন্তু গ্রাম সমাজ একই ভাবে থেকে যায়। এর কারণ হিসাবে তারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকাকে দায়ী করেছিলেন। যেখানে পঞ্চায়েত ছিল না সেখানে বংশানুক্রমিকভাবে একজন লোক বিচার-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করত—একটি বিশেষ গোষ্ঠী দ্বারা নির্ধারিত হয়ে। ইংরেজ চর্চাকারীরা উনিশ শতকে 'ভাইয়া চারা' বলে একটি গ্রাম্য ব্যবস্থার প্রমাণ দাখিল করেছিলেন যে প্রথায় গ্রামের সমস্ত চাষযোগ্য জমি প্রথম বসবাসকারীদের সমভাবে বণ্টিত হত। ভারতীয় সমাজের স্থাণুতার বক্তব্য ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘস্থায়ী মেয়াদের পক্ষে সাফাই হিসাবে ইংরেজ শাসকরা এইসব তথ্যগুলির ভিত্তিতে তারা ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কার্লমার্ক্সের বক্তব্য অবশ্য মনে রাখতে হবে। মার্ক্স জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবস্থা স্বীকার করেও এশিয়াটিক সমাজের সবচেয়ে বড়লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছিলেন গ্রাম সমাজে কৃষিজাত ও হস্তজাত শিল্পের ঐক্যবন্ধন। কোনও সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবধান সৃষ্টি না করেই প্রত্যেক গ্রামে কৃষি ও শিল্পের জন্য শ্রমশক্তি যৌথভাবে নিয়োজিত হত। এর জন্যই গ্রাম-সমাজ পূর্ণভাবে স্বয়ম্ভর হত। মার্ক্সের ভাষায়—প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র সম্পত্তির আইনগত অনুপস্থিতি সূচিত করে বলে মনে হয়। বস্তুত এর ভিত্তিভূমি হচ্ছে উপজাতীয় বা যৌথ মালিকানা। এশিয়াটিক সমাজের নিশ্চলতা বা গতিহীনতার জন্য 'প্রত্যেকটি গ্রাম-সমাজ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন স্বয়ম্ভর এবং নিজ কক্ষপথে নিজে থেকেই আবর্তিত হচ্ছে। সামাজিক শ্রেণীবিভাগ এখানে অনুপস্থিত। ফলে শ্রেণীবিন্যাস অনুন্নত এবং শ্রেণীসংঘর্ষ তীব্র হতে পারছে না'।

ব্রিটিশ আমলাদের তুলনায় মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু পৃথক। মার্ক্স পূর্বোক্ত অবস্থাকে নিন্দা করেছেন এবং পূর্বোক্ত সমাজের ভাঙনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ব্রিটিশের ধারণা ছিল—আগের ব্যবস্থাকে যতদূর সম্ভব বজায় রেখে তাদের স্বার্থ সিদ্ধি করা। মার্ক্স যৌথ মালিকানাকে দ্বান্দ্বিকভাবে দেখেছেন—গ্রাম সমাজও তার উপর উর্ধ্বতন কোনও ক্ষুদ্রগোষ্ঠী। এই ধরনের অস্তিত্বের ফলে দুই ধরনের অধিকার জন্ম নেয়—একক স্বত্ব ও বংশানুক্রমিক স্বত্ব। রাষ্ট্র হল প্রভু এবং জমির ক্ষেত্রে জমির মালিকানা সার্বভৌম শক্তির কুক্ষিগত। এরা কতগুলি সামাজিক ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তে গ্রামের উদ্বৃত্ত সম্পদ ভোগ করে। এদের প্রতিভূ হলেন—সম্রাট মোগল বা অন্য কেউ। এশিয়াটিক সোসাইটি একদিকে শ্রেণীবিহীন গ্রাম সমাজ অন্যদিকে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী পরিচালিত রাষ্ট্র। আদিম গ্রাম্য সমাজ, দাস সমাজ ও শ্রেণী বিভক্ত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মাঝামাঝি একটা অবস্থা। মার্ক্স এই সমাজের ভাঙনের মধ্যে দিয়েই এর অগ্রগতির সম্ভাবনা দেখেছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসকরা যে পুরনো পদ্ধতি ব্রিটিশের স্বার্থেই বজায় রাখতে পারবে না এটা বুঝেছিলেন। ভারতে ব্রিটেনের ধ্বংসাত্মক এবং গঠনমূলক (ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত) কাজের ফল হবে যে ভারতীয় সমাজকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথে এগিয়ে দেবে—যদিচ ব্রিটেন তা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে, অত্যন্ত নিন্দনীয়ভাবে করেছে ইতিহাসের অমোঘ হাতিয়ার হিসাবে।

খেয়াল রাখা দরকার ইংরেজই প্রথম বহিরাগত ভারত দখলদার যারা ব্যংলাদেশ থেকে তাদের দখলদারি শুরু করে এবং যারা কখনও কল্পনাও করেনি এ দেশে বাস করবে এবং এ দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। তারা এ দেশের ধর্ম, সমাজ, আচার-আচরণ এবং গায়ের রং পর্যন্ত ঘৃণা করেছে ; সাধারণভাবে অধিকাংশ মানুষকে তারা বর্বর ভেবেছে। তাই লুণ্ঠন, বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে রপ্তানিযোগ্য বস্তু ক্রয় এবং নিজ অধিকারভুক্ত উপনিবেশগুলিতে চাষ-আবাদ করার জন্য এ দেশের বর্ণাশ্রম ধর্মের দলিত মানুষদের 'কুলি' করে পাঠাতে থাকে। প্রলোভনের সঙ্গে এ ব্যাপারেও তারা এমন সব জোর-জবরদস্তি করে যে, গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কলকাতা শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শনও হয়েছিল বিদেশে জোর জবরদস্তি কুলি পাঠানোর বিরুদ্ধে।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৯৩ সালে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী জমিদারি প্রথা প্রবর্তনের বিষয় আলোচনা করতে হবে। সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন, ব্যবসার জন্য অর্থ সংগ্রহ সবই দেশীয় লোকদের কাছ থেকে নানা উপায়ে করা হত। সৈন্য কেবল দেশীয়দের দমনের জন্য নয়, সীমানা রক্ষার জন্য এবং উপনিবেশগুলি দখল ও রক্ষার জন্য লাগত। ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যুদ্ধখাতে যে ব্যয় করেছে—তার একটি কপর্দকও বিলাত থেকে আসেনি—এবং প্রথম যুগের বিলাতি ব্যবসায়ীরা যে এ দেশের সহায়ক মহাজন-ব্যবসায়ী শ্রেণীর কাছ থেকে পেত তার অজস্র প্রমাণ ইদানিং গবেষকরা সংগ্রহ করেছেন। কাজেই ভারতীয় অর্থনীতির গরিষ্ঠতম উৎপাদকদের কাছ থেকে বর্দ্ধিত হারে রাজস্ব আদায় করাই ইংরেজ শাসকদের আশুকর্তব্য হল—এবং প্রথমে অধিকৃত বাংলাদেশে সে কাজ তারা করল পুরনো জমিদার গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে নতুন জমিদার শ্রেণী তৈরি করে। এরা রাজস্ব আদায় করবে এবং প্রজাবিদ্রোহ দমন করবে এই আশায়। তাদের এই কৌশল যে সফল হয়েছিল তা আমরা সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ থেকে ইংরেজের—ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসগুলির ইতিহাসে জানতে পারি। এ সব জানার পর মার্ক্স ব্রিটিশ ভারতে নতুন ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন তা আজও প্রাসঙ্গিক। ব্রিটিশ ভারতের ভূমিব্যবস্থার আনুপাতিক হার ছিল—চিরস্থায়ী জমিদারি শতকরা ১৯%, রায়তওয়ারি ৫০% এবং অস্থায়ী ৩১%। এই ব্যাপারে ইংরেজ শাসকদের মধ্যে বেশ বিরোধ ছিল। মারকুইস হেস্টিংস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে নতুন এলাকাতে সম্প্রসারণের বিপক্ষে ছিলেন। ১৭৯২-৯৯ সালে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই নব-দখলিকৃত বারমহল ও সালেমে সর্বপ্রথম রাওতওয়ারি প্রথার প্রবর্তন হয়। এর জন্য ইংরেজ কালেক্টর আলেকজান্ডার রিড ও তার দুই সহকারী কালেক্টর ক্যাপ্টেন ইমাম মুনরো এবং উইলিয়াম থ্যাকারের নাম উল্লেখযোগ্য। এরা তিন জনই প্রায় নিরবচ্ছিন্ন লড়াই করে তাদের রায়তওয়ারি ব্যবস্থার পক্ষে। কারণ আগে যেগুলি বলেছি তার সঙ্গে আরও দুটি কারণ যোগ করা যেতে পারে। প্রথম দিকে বিদেশে বিক্রয়যোগ্য ফসল ছিল নীল, যা বাংলায় (তখন বাংলা উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে ইংরেজের শাসনে ছিল)। নীলের উৎপাদন এই অঞ্চলেই বেশি হত। বিদ্রোহী কৃষকদের উপর ভরসা না করে দেশীয় সহায়ক শ্রেণীর সঙ্গে কিছু ইউরোপীয় নীলকরদের হাতে ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের হাত থেকে জমি নিয়ে নেওয়া দরকার। এই কারণেই এই অঞ্চলে চিরস্থায়ী জমিদারি প্রথা ইংরেজ কায়েম করে। অপর পক্ষে মহারাষ্ট্রের তুলা ও আফিং যথেষ্ট পরিমাণে পেতে হলে (কারণ তাই দিয়ে একই সঙ্গে ইউরোপ ও চীনের সঙ্গে বিরাট ব্যবসা চালাতে হবে) কৃষককে অস্থায়ী রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় রাখলে দেশীয় ফড়ে দিয়ে ব্যবসা ভালোভাবেই চালানো যেত। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে ইউরোপে ফরাসি দেশের মধ্যে যে পরিবর্তন হচ্ছিল তার ধাক্কা ব্রিটিশ যুব মানসেও পড়েছিল। এ দেশে ইংরেজ শাসকদের ব্যক্তিগত বিচার করতে হলে সে সব কথা মনে রাখা দরকার। জমিদারিও রায়তওয়ারি প্রথা দীর্ঘদিন চলার পর যে সরল বিতর্ক ব্রিটিশ শাসকবর্গের মধ্যে হয়েছিল—তাই পড়েই ১৮৫৩-তে মার্ক্স সঠিক মন্তব্য করেছিলেন : The Zemindari and the Ryotwary were both of them *agrarian revolutions* effected by the British Ukases and, opposed to each other ; the one *aristocratic*, the other *democratic* ; the one a caricature of English landlordism, the other of French peasant-proprietorship, but both pernicious, both combining the most contradictory character—both made not for people who cultivates the soil not for the holder who owns it, but for the Government who taxes it. মার্ক্স এই ঘটনাগুলিকে কৃষি বিপ্লব বললেন কেন, যে বিপ্লব অত্যন্ত ক্ষতিকর, পরস্পর বিরোধী এবং জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য নয় সরকারের মঙ্গলের জন্য? এই বক্তব্য অনুধাবন করার জন্য ভারতের পুরনো ব্যবস্থাকে বজায় রেখে ইংরেজ নিজের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে যেসব নিয়ম কানুন করে তা দ্বান্দ্বিক নিয়মে গ্রাম সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। ইংরেজ আমলের যে যুগকে মুসলিম শাসনের যুগ বলে তার সময় কাল হচ্ছে আকবর থেকে আওরঙ্গজেবের শাসন কাল—অর্থাৎ খ্রি. ১৫৫৬ থেকে ১৭০৭ পর্যন্ত। তখনকার ভারত বলতে সাধারণত ধরা হয় দাক্ষিণাত্যের বেরার, বিদর, আহমদনগর এবং বর্তমান মহারাষ্ট্র সমেত উত্তর-ভারতের সমতলভূমি, আসাম বাদে পূর্বভারত। এই সময় অ-কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন ভারতে অবশ্য ছিল—কিন্তু মূল অর্থনীতি কৃষি ভিত্তিক। বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা সবাই এক বাক্যে বাদশাকে জমির মালিক বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবুল ফজল বাদশার কর চাপানোর অধিকারকে শুধুমাত্র 'সার্বভৌমতা'র দাবি বলে পরিচয় দিয়েছে—কারণ বাদশা 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' বজায় রাখেন। কোথাও রাজার সম্পদ বৃদ্ধির জন্য খাজনা হিসাবে রাজস্বকে বর্ণনা করা হয়নি। এ ছাড়া বহু ফারসি গ্রন্থ থেকে জানা গেছে—শহরের বহু লোক বাদশাকে জমি বিক্রি করছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সেইসব জমির স্বত্ব নিয়ে বিবাদও হচ্ছে বাদশাহের সঙ্গে। গুজরাটের স্বাধীন সুলতানদের শাসনকালের শেষভাগের কথা যে সব গুজরাটি দলিলে পাওয়া যায় তাতে আছে শহরের জমি ও বাগান বাড়ি সব সময়ে কেনাবেচা হত। আসলে বাদশা কর হিসাবে সামাজিক সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ পেতেন, উচ্চতর সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন। কিন্তু জমির মালিকের খাজনা হিসাবে তার কোনও প্রাপ্য ছিল না। আইন-ই-আকবরিতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জমির উপর কৃষকদের অধিকার স্বীকৃত আছে। এটা খুবই স্পষ্ট যে সমস্ত

কর্ষিত সম্পত্তির মালিকের সংখ্যা অগণ্য।—আইন-ই-আকবরি, নিগর-নামা-ই মুন্সি। মুহম্মদ হাসিমের প্রতি আওরঙ্গজেবের ফরমান থেকে জানা যায় যে জমিতে কৃষকের চিরস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক দখলে স্বত্ব ছিল। আমি আগেই বলেছি যে তখনকার দিনে সমস্যাটা ছিল জমির নয়, কৃষকদের সংখ্যার। কর্ষণযোগ্য জমির তুলনায় কৃষক অনেক কম ছিল। ইংরেজ যখন এ দেশে চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারি প্রথা চালু করে তার গুণাগুণ বিচার করছে তখনকার দিনে অর্থাৎ উনিশ শতকের মাঝামাঝি ছত্রিশ গড় অঞ্চলের কৃষক সমাজের যে বিবরণ পাওয়া গেছে—তাতে ভারতের জনবিরল অংশের চিত্র একই সাক্ষ্য দেয়। "আদিম বাসিন্দা দেখবে যে চাষের জমির জন্যে প্রচুর অনাবাদি জমি পড়ে আছে। যেদিকে অন্যলোকদের তার সঙ্গে আস্তানা গাড়তে প্রণোদিত করতে পারে তাহলে তার বসতির নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যই শুধুমাত্র বাড়বে না। সে গ্রামের সাধারণ উন্নতির জন্য পরিশ্রম করতে পারবে। সে কিছু সেচ কাজ শুরু করবে এবং নিচু জমিকে লাঙ্গলের আওতায় আনার সময় পাবে। নতুন চাষীদের সাগ্রহে ডাকা হোত। জমির জন্য নয়। বরং মানুষের জনাই প্রতিযোগিতা হত। এখানে জমির জন্য কোন প্রতিযোগিতা নেই তার ফলে স্বত্ব আদৌ বিতর্কিত নয়। স্বত্বতে কেউ হস্তক্ষেপ করে না।...জমি নিয়ে কোন বাদ-বিসম্বাদ নেই, কারণ তা নিয়ে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই।'

ইংরেজ প্রবর্তিত ভূমি ব্যবস্থা আসলে কৃষকদের স্বত্ব হারাবার ব্যবস্থা—এবং সেই ব্যবস্থা যেসব আইনের মারফতে করা হয়েছে তা ভারতের গ্রাম-সমাজের প্রাচীন ভারসাম্যই শুধু নষ্ট করেনি অসংখ্য মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করে প্রকৃত কৃষক সমাজকে নানাকৌশলে দুর্বল ও বিভক্ত করেছিল। অধ্যাপক ইরফান হাবিব এবং গৌতম ভদ্রের মোগল যুগের শেষ অবস্থার বর্ণনা ভিত্তিক বই দুটিতে এই অবস্থার ইতিহাস আছে। ১৯৪০ সালে ইংরেজের গড়া ফ্লাউড কমিশন জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে ৪০টি মধ্যস্বত্বের সন্ধান দিয়েছে। ইদানিং কালের গবেষকরা বলছেন—৬০টি মধ্যস্বত্বের কথা। এর উপর রয়েছে ধর্ম, বিশেষ করে বর্ণাশ্রম ধর্মের সৃষ্ট বিভেদ—ধনবৈষম্যের উপর বর্ণবৈষম্য। ভারতের নবজাগরণের প্রধান পুরুষ রামমোহন রায়—ভারতের মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সূত্র সন্ধান করতে ব্রহ্মবাদ বা বিশ্বধর্ম সংস্থাপনের পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে সে বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় যাব না। জমিদারি প্রথা এবং রাওতয়ারি প্রথা প্রবর্তনের তিন দশক পরে তিনি সেই বিষয়ে যে বক্তব্য রেখেছিলেন এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তার পরিচয় দেব। রামমোহন ইংরেজসৃষ্ট একজন জমিদার এবং নানাভাবে ইংরেজ শাসনের সহায়ক ছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রিটেনে গিয়ে পার্লামেন্টের একটি কমিটির কাছে ১৮৩১ সালে যে বিবৃতি দেন তাতে বলেন : দুই প্রথাতেই (জমিদারি ও রায়তয়ারি সৃঃ প্রঃ) চাষীদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক ; একটি প্রথায় তারা জমিদারের অতিলোভ এবং যে কোনও প্রকারে ধনী হওয়ার ইচ্ছার খোরাক ; অন্য প্রথায় তারা কানুনগো, সরকারি আমিন ও পেয়াদার শঠতা ও জবরদস্তি শোষণের খোরাক। আমি এই দুই প্রথার চাষীদের জন্য গভীর দুঃখ বোধ করি। বাংলাদেশে কেবল এইটুকু পার্থক্য যে, জমিদারদের প্রতি সরকার অনুগ্রহ করেছেন রাজস্ব নির্দিষ্ট করে দিয়ে। কিন্তু সেই অনুগ্রহ থেকে গরিব চাষীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ফসল যে সময় বেশি হয় এবং দাম পড়ে যায়, তখন জমিদারদের প্রাপ্য শোধ করতে চাষীকে ফসলের সবই বেচে দিতে হয়। বীজধান, কৃষিমজুর পোষার বা নিজ পরিবারের প্রয়োজনীয় খোরাকিও সে রাখতে পারে না। ক্ষেত মজুর সম্পর্কে কোনও কথা বলতে তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হয়। ক্ষেত মজুররা কোনদিন স্বচ্ছল জীবনযাপন করে এমন কথা তিনি কোনদিন শোনেননি বা জানেন না। কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করতে হলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে রামমোহন বলেছিলেন : ৪০ বছর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যুগে জমিদাররা নিজেদের খুশিমত জমির পরিমাণ হিসাব করে যত বেশি সম্ভব খাজনা বৃদ্ধি করে নিয়েছেন, কাজেই আমার সর্বনিম্ন প্রস্তাব এবং সরকারের সর্বনিম্ন কর্তব্য হচ্ছে কোনও অছিলায় যাতে খাজনা আর বৃদ্ধি না পায় তার জন্য চাষীর খাজনাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নির্দিষ্ট করে দেওয়া। রামমোহন কৃষকের জমির স্বত্ব রক্ষার দাবিও করেন এবং বলেন যে স্বত্ববান কৃষক নিজ জমির রক্ষার জন্য দেশরক্ষাও করবে এবং সরকারের ভাড়াটে সৈন্যদল পোষার খরচ লাগবে না। রামমোহন রায়তওয়ারি প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন—এই কারণে যে, ওই প্রথা থেকে সংগৃহীত অর্থের সবই বিদেশে চলে যাচ্ছে—অপর পক্ষে দেশীয় জমিদারদের সংগৃহীত অর্থের কিছু দেশেই থাকছে—যার দ্বারা শিল্প কারখানা নির্মাণের প্রাথমিক পুঁজি তৈরি হতে পারে। শেষপর্যন্ত এই দুটি ব্যবস্থার কোনটিই যে ভারতের কোনও শ্রেণীর মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর হয়নি তা চিন্তাশীল ভারতবাসীর অভিজ্ঞতা ও বিবেচনায় ধরা পড়ে। কলকাতার ২০০ মাইলের মধ্যে কৃষকদের বিদ্রোহ যা শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) সিপাহি বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৮৫৭) এর নীলবিদ্রোহ (১৮৬০-৭০) কলকাতার ইংরেজি শিক্ষিত এবং ইংরেজ শাসনের সহযোগী মানুষদের সচকিত করে তোলে। ইংরেজের সেকালের রাজধানী কলকাতার যে সকল ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ ব্রিটিশ শাসনকে 'ঈশ্বরের দান' বলে জয়ধ্বনি দিত তাদের অগ্রগণ্য প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী' 'পত্রিকা' (১৮৪৩ সালের ১৬ই আগস্টে প্রথম প্রকাশিত) এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮ সালের ১৫ই নভেম্বরে প্রথম প্রকাশ) পত্রিকায় দেশীয় জমিদারদের অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে। শুরু হয়ে যায় জমিদারি প্রথার সমালোচনা তাদেরই দ্বারা যাদের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব হয়েছে জমিদারির প্রথার জন্য। অন্তত এই মত ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের, যিনি চিরস্থায়ী-জমিদারি প্রথা সৃষ্টি ইংরেজদের চিরস্থায়ী কলঙ্কের কারণ বলেও আবেদন করেছিলেন এই প্রথা তুলে না দিতে, কারণ তাহলে নাকি বাঙালিসমাজ ভেঙে যাবে বলে তাঁর আশংকা। বঙ্কিমচন্দ্রের আগেই প্যারীচাঁদ মিত্র (আলালের ঘরে দুলাল প্রণেতা), কিশোরীচাঁদ মিত্র , সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (বঙ্কিমের অগ্রজ), অক্ষয়কুমার দত্ত (তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক) এবং কেশবচন্দ্র সেন কৃষকদের দুরবস্থা সম্পর্কে লেখেন। বর্তমানের গবেষকদের উচিত এই সকল রচনার পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা, যার থেকে জানা যাবে জমিদারি প্রথার সমালোচনা কোন ধারায় চলছিল ? যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশে কৃষক' ১৮৯২ সালে পুনর্মুদ্রণের ভূমিকায় লিখলেন : 'বঙ্গদেশে কৃষক'-এ এদেশীয় কৃষকদের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহা আর নাই। জমিদারের আর সেরূপ

অত্যাচার নাই। নূতন আইনে তাঁহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে। কৃষকদের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেক স্থলে দেখা যায় প্রজাই অত্যাচারী জমিদার দুর্বল—সেহেতু কৃষক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা বেশ কিছু কাল স্তিমিত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সমস্যাটিকে আবার বাঙালি চিন্তাবিদদের মধ্যে উত্থাপন করেন ঠাকুর বাড়ির জমিদারির ম্যানেজার সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী।

অবশ্য বঙ্কিমের সমসাময়িক কালে দেবেন ঠাকুরের পুত্র এবং ভারতের প্রথম আই. সি. এস সত্যেন্দ্রনাথ এবং দ্বিতীয় পরীক্ষার্থী দলের আই. সি. এস রমেশচন্দ্র দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথ বোস মহারাষ্ট্রে কর্মরত ছিলেন বলে রায়তোয়ারি প্রথাকে কার্যাবলি সব দিক থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি সাধারণভাবে ইংরাজি শাসনের প্রশংসা করেও রায়তোয়ারি ব্যবস্থায়—কীভাবে কৃষক শোষিত ও লুণ্ঠিত হয়ে জমির স্বত্ব হারাচ্ছে—তার বিস্তৃত চিত্র দৃষ্টান্ত সহকারে তুলে ধরেন। ইদানিংকালের কোনও গবেষকের দৃষ্টি পড়েনি যে সেকালে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সংবাদে সত্যেন্দ্রনাথ ইংরেজ শাসকদের কাছে অপমানিত হয়েছিলেন। কী কারণ তা 'সোমপ্রকাশ' লেখেনি। তবে আমরা জানি যে জাতীয় চেতনা বৃদ্ধির জন্য রাজনারায়ণ বসু ও দেবেন ঠাকুরের ছেলেদের উৎসাহে যে চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা হয়—তার জন্য গান লিখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ 'মিলে সবে ভারত সন্তান......'। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকায় লিখতেন। 'ভারতী' ১৮৮৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথের ভগ্নী স্বর্ণকুমারী দেবী দ্বারা সম্পাদিত হত। আসলে এই পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্যোক্তাও দেবেন ঠাকুরের পরিবারবর্গের। সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির নাম ছিল 'বোম্বাই রায়ৎ'। বন্ধুগবেষক নেপাল মজুমদার বলেছেন রামমোহনের পর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম বাঙালি বুদ্ধিজীবী যিনি বোম্বাইয়ের তৎকালীন ভূমি ব্যবস্থা এবং তখনকার দুর্ভিক্ষ ও কৃষক বিদ্রোহের কারণগুলি সম্পর্কে দীর্ঘ এবং তথ্যবহুল নিবন্ধ রচনা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে টাকায় খাজনা আদায়ের নীতিতে ফসল হোক আর না হোক ঋণ করে কৃষককে খাজনা দিতে হয় এবং একবার ঋণ করলে শেষপর্যন্ত শাস্তি তার জমির স্বত্ব মহাজনের কাছে বেচে দিয়ে তাকে ভূমিদাসে পরিণত হতে হয়। ভারতের কৃষিব্যবস্থা যেহেতু প্রকৃতির দয়াদাক্ষিণ্য নির্ভর—তাই অতিবৃষ্টি বা খরা জনিত ফসল হানির কথা বিবেচনা না করে ইংরেজ শাসক যেভাবে মুসলমান শাসকদের তুলনায় অনেক বর্দ্ধিত হারে খাজনা আদায় করেছে তার জন্য বারবার দুর্ভিক্ষ হয়েছে এবং ব্যাপকহারে কৃষকরা জমির স্বত্ব হারিয়ে ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে। কারণ মহাজনরা তো আর জমি চাষ করবে না। যার কাছ থেকে জমি কিনছে তাকেই বর্গাদার করবে।

ইংরেজ শাসনের আশু উচ্ছেদ বা অবসানের দাবি-না জানালেও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে মহাজনদের বিরুদ্ধে পুনার কৃষক বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানকে (১৮৭৫ মে) নৈতিক সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছেন। সেই রচনায় 'বিদ্রোহ' ও 'বিপ্লব' শব্দ দুটি সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। ইংরেজ-পূর্বকালের তুলনায় ইংরেজ আমলে মহাজনী শোষণের ভয়াবহতা যে দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গবর্নমেন্টের আইন-কানুন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মহাজনদের সাহায্য করছে নানা তথ্য দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তা প্রমাণ করেছেন। ইংরেজের তৈরি আদালত যে আসলে ধনীদের স্বার্থে কাজ করে এরা গরিবদের দমন করার 'আইনি' কৌশল একথা নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন। বোম্বাইয়ের শহর ও গঞ্জের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রধানত মাড়োয়ারিরা কীভাবে জমির স্বত্ব তারা নিয়ে নিচ্ছেন তার বিবরণে সত্যেন্দ্রনাথ লিখছেন : 'প্রচলিত নিয়মানুসারে মাড়োয়ারীর অনুগ্রহের উপর রায়তের সকল নির্ভর। মাড়োয়ারীর হস্তেই খত রক্ষিত হয়, রায়ৎ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবসর পায়না। মাড়োয়ারী আপন ইচ্ছামত হিসাব প্রস্তুত করে, রাইয়ৎ তাহা গৃহে লইয়া গিয়া সময়মত পরীক্ষা করিতে পারেনা। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে রাইয়ত ঘোরতর কষ্টে পড়িয়া তাহার ভূমি সম্পত্তি মহাজনের নিকট বন্ধক রাখিয়াছে—অনেক বছর পরে তাহার অবস্থা একটু ভাল হইলে সে বা তাহার সন্তান-সন্ততি আপনাদের বন্ধক বিষয় ছাড়াইয়া লইবার জন্য যত্নশীল হয়, কিন্তু তখন মহাজন অথবা তাহার বংশজ লোকরা বহুকাল উক্ত বিষয় ছাড়িয়া দিতে সম্মত নহে। রাইয়ত আদালতে যাইতে বাধ্য হয়। মহাজন জবাব দেয়। এ সম্পত্তি বাদীর নহে। ইহাতো আমাদের হস্তে বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। আমরা বন্ধকের কিছুই জানি না। খত মহাজনেরই হস্তে রক্ষিত বন্ধকী সে বন্ধককে কিরূপে সপ্রমাণ করিবে? ......আদালতে যে অর্থী প্রত্যর্থী উপস্থিত হয়েন তাঁহারা আইনের চক্ষে উভয়েই সমান কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রায়ৎ ও মহাজনের মধ্যে যে বিবাদ তাহা দুগ্ধপোষ্য শিশু ও বলিষ্ঠ পালোয়ানের মধ্যে মল্লযুদ্ধের ন্যায়। মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী যতই সহজ হউক না কেন সামান্য রায়তের তাহাই নিতান্ত দুরূহ। যদি কোনও রায়ৎ মহাজনের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধে কৃত নিশ্চয় হয়—প্রথমত তাহাকে গ্রাম ছাড়িয়া কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া কতদূরে আসিয়া সংগ্রাম করিতে হইবে—তারপর স্ট্যাম্পের ব্যয় ও উকিল খরচা কত কারণে মোকদ্দমা স্থগিত হইতেছে ও তাহার পুনঃ পুনঃ আদালতে আসিয়া কষ্টভোগ......এইসকল কারণে বুঝিতে পারা যায় মোকদ্দমার সময় প্রতিবাদীগণ কেন অনুপস্থিত থাকে। নথি অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে শতকরা ৯০ ভাগ মোকদ্দমা রায়তের অবর্তমানেই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ......এ অতি ভয়ানক কথা।' ......এদেশের আইন-এ বিষয়ে মহাজনের যেন পক্ষপাতী। এই কথা বলার পর সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন—কীভাবে রায়ৎ ভূমি স্বত্ব হারিয়ে মহাজনের ক্রীতদাসে পরিণত হচ্ছে। এই কারণে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে জমির স্বত্ব প্রকৃত কৃষক ছাড়া অন্যের নিকট হস্তান্তরের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

জমিদারি প্রথাতেও কৃষকরা যে কীভাবে জমির স্বত্ব হারিয়েছে—সে বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় কিছুকাল আগেই এবং বঙ্কিমের রচনার সময়ে রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'পেজান্ট্রি অব বেঙ্গল' প্রবন্ধগুলিতে লিখে গেছেন। রমেশচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে, বাংলায় কৃষক কারা এই মূল প্রশ্ন তুলে নৃতত্ত্বের গবেষণায় সমস্ত বাঙালি জাতি যে মূলত আদিবাসী এই বক্তব্য জোরালো ভাষায় রেখেছেন: 'সত্যের খুব বেশী অপলাপ হবে না যদি বলি এই দুইকোটি আশি লক্ষ বাংলা ভাষা ভাবীদের মধ্যে অতীতে কোনও সময়ে আদিবাসীদের রক্তের প্রাচুর্য ছিল). তবে সবটাই আদিবাসী থেকে হিন্দু হওয়া সম্ভব।'

জমিদারি প্রথা হিন্দু যুগ থেকেই মুসলমান শাসকরা এবং ইংরেজ পেয়েছে—এই মন্তব্য করে রমেশচন্দ্র লিখেছেন : 'জমিদারী

প্রথা এমনই এক প্রথা যার সঙ্গে যৌথ ব্যবস্থার কোন সম্পর্কই নেই। যে তা শোষণের আর অত্যাচারের যন্ত্র হয়ে উঠবে এতে সন্দেহ কি।' বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ভারতের কৃষকদের দুর্দশার প্রধান কারণ হিসাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন—তেমনই রমেশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে : বাংলাদেশের রায়তি প্রজারা জীবনের কোন সময়েই আজকে বাঁচিয়ে আগামীকাল ভোগ করবে এমন অবস্থায় ছিল না। জমিদারই তো তাদের দাসখতে বেঁধে রেখেছে। এরপর মহাজনদের মুখ চেয়েই তাদের দিন কাটে। ওদের উপর যারা অত্যাচার করে জবরদস্তি আদায় করে। জমি জায়গা দখল করে নেয় তাদের থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনও উপায়ই তো ওদের নেই। এর উপর তো আছে উঁচু জাত নিচু জাতের অত্যাচার।

মুসলমান শাসনের যুগে জমির মালিকানা স্বত্ব ছিল পুরোপুরি রাষ্ট্রের এবং জমিদাররা ছিল আইনের চোখে খাজনা আদায়কারীমাত্র। জমিদারি প্রথার প্রবর্তন করে লর্ড কর্নওয়ালিশ 'সীমাহীন ভুল করলেন—জমির অধিকার রায়তদের দেওয়া হ'ল না—দেওয়া হল তাদের (কৃষকদের পুত্র) বংশ পরম্পরায় অত্যাচারীদের ......'এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশে যে অবশ্যম্ভাবী ভয়ঙ্কর দুর্দৈবের সৃষ্টি হ'ল পৃথিবীর ইতিহাসে তেমন অবস্থা আর কোথাও ঘটেনি। এই তড়িঘড়ি আইন চালু করার সব দোষ লর্ড কর্নওয়ালিশের'। রমেশবাবু এই মন্তব্য করার পর ওয়ারেন হেস্টিংস ও সার ই কোলব্রুকের উক্তিগুলি তাঁর মন্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত করেছেন। কোলব্রুক বলেছেন : 'এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভুলের দুটো দিক আছে। প্রথমত সব জমির মালিকানা স্বত্ব বা চাষের অধিকার স্বত্ববিলোপ করে জমির সম্পূর্ণ দখলি স্বত্ব একমাত্র জমিদারের এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারকে স্বীকৃতি দেওয়া। আর তারপর জমিদারদের উপরেই ছেড়ে দেওয়া রায়ত প্রজাদের উপর তারা ইচ্ছামত কিভাবে বন্দোবস্ত করবে তার ভার।' এর পর রমেশ দত্ত লর্ড কর্নওয়ালিশের পর লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে বলেছেন— এই লর্ডের আমলে লক্ষ লক্ষ বাঙালির স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থরক্ষা করেছেন এবং এমন সব আইন করেছেন যাতে কৃষকদের শারীরিক শাস্তি হয়। জমিদারি প্রথায় বাংলার কৃষকদের জমির স্বত্বহীন-বর্গাদার ও ক্ষেতমজুর করার পিছনে শাসক ইংরেজদের মধ্যেও যে মতভেদ ছিল—রমেশচন্দ্র তার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে শেষ পর্যন্ত বলেছেন : 'কিছু দিন আগে পাবনার রায়তরা যে ক্ষেপে উঠেছিল তা নিয়ে ভাববার মতো কিছু বিষয় আছে। ......যারা রায়তি প্রজাদের কাজের কঠিন সমালোচনা করছে, তাদের সামান্য একটা কথা মনে রাখতে বলি। অত্যাচারের ফলেই না এই বিদ্রোহ ঘটেছিল। সেখানে অত্যাচারের বদলে সামান্য কিছু ক্ষমতার অপব্যবহার তো ঘটছেই। যত শক্তি প্রয়োগ করা হবে প্রতিহত হয়ে সেই অনুপাতেই তো বিপরীত শক্তি ঠিকরে ফিরবে। আর এই প্রতিক্রিয়ার ফলে যে কেউ কোথাও আঘাত পাবে না এমন তো হতে পারে না। ......একটা জেলার সমস্ত প্রজাদের একসঙ্গে রুখে দাঁড়ানো একটা বলার মতো ঘটনা। বিশেষত বাংলা দেশের ভীরু দুর্বল চাষীদের পক্ষে এতো একটা অবাক করা কাজ। অতীতে অনেক শক্তিশালী দলপতিদের বিদ্রোহ করতে আমরা দেখেছি। ......অনেক ধর্মান্ধদের কীর্তিকলাপ, দেখেছি স্বদেশ প্রেমিকদের বিপ্লব। কিন্তু চাষী প্রজাদের এমনভাবে রুখে দাঁড়ানোর ঘটনা এদেশে তেমন শোনা যায়নি। কিন্তু গত বিশ বছরের মধ্যে তেমন ঘটনাই দু'বার ঘটেছে। যথা—নদিয়ার নীলচাষীদের বিদ্রোহ আর তারপরে পাবনায় এই খাজনা বন্ধের আন্দোলন। ইংরেজ রাজশক্তির অধীনে থাকাকালীন কেন যে এমন ঘটনা ঘটল—তার কারণ খোঁজা বোধ হয় অনর্থক হবে না।

কারণগুলি হচ্ছে জমিদারদের দ্বারা যেকোন উপায়ে বে-আইনি আবওয়াব (উপরি) আদায় এবং অন্যথায় কৃষককে জমির স্বত্ব থেকে উচ্ছেদ করা রামমোহনের মতো রমেশচন্দ্র স্বত্ববান কৃষকদের খাজনা নির্দিষ্ট করে জমির উপর অধিকারকে নিশ্চিত করার সুপারিশ করেছিলেন। তেভাগা আন্দোলনের বীজ এই দুটি দীর্ঘকালীন কৃষক নির্যাতনের ইতিহাসের মধ্যে জেগে উঠছিল। ডঃ সুনীল সেন অধ্যাপক হওয়ার আগে একজন সক্রিয় কমিউনিস্ট হিসাবে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত যে জমিদারি প্রথার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন—তিনি তখনও তা জানতেন না। তথাপি তিনি তেভাগা (১৯৪৭) সংগ্রামের রজতজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে যে প্রবন্ধ লেখেন তার সারাংশ এখানে উল্লেখ করছি। তাঁর মতে: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দুই দশকের মধ্যেই জোতদারি প্রথা বিকশিত হতে থাকে। ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটনের প্রসিদ্ধ সমীক্ষায় দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় 'আধি' প্রথার উল্লেখ আছে। এই দুই জেলায় বনিক-ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে একদল নতুন জমির মালিক রূপে দেখা দিল। এদের জমি যারা চাষ করত তাদের 'আধিয়ার' বলা হত। দিনাজপুর জেলায় তিনি দেড় লক্ষ আধিয়ার পেয়েছিলেন বুকানন হ্যামিলটন অবশ্য জোতদার বলে কোনও শ্রেণীর উল্লেখ করেননি। কিন্তু ও'ম্যালি সম্পাদিত ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে জোতদার কথাটার উল্লেখ আছে। দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং এবং বর্ধমান জেলায় যে ইতিমধ্যে জোতদারি প্রথা আত্মপ্রকাশ করেছে তা জানা যায়। উত্তরবঙ্গে যারা জোতদার বলে পরিচিত তারা আবার বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়াতে 'ভাগ-জোতদার' বলে পরিচিত। ও'ম্যালি লিখেছেন জোতদার অনাবাদি জমি কর্ষণাধীনে এনে তা কৃষকদের দিয়ে চাষ করাতো ; জঙ্গল সাফ করানো হত আদিবাসী সম্প্রদায়কে দিয়ে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ এবং দিনাজপুর জেলার জঙ্গল কেটে জমি চাষযোগ্য করেছিল—সাঁওতালরা। ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চল যে একইভাবে চাষ ও বাসযোগ্য করা হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। জীবন বিপন্ন করে জমি চাষযোগ্য করে সাঁওতালরা জমির মালিক না হয়ে বর্গাদার হয়ে তোলা শহরে চাকুরে ও বিলাতি ব্যবসাদারদের সহযোগী হয়ে যেসব ভদ্রলোক অর্থ সঞ্চয় করেছেন তারা গ্রামে জমি কিনে বর্গাদারদের দিয়ে চাষ করেছেন। চাকরির ব্যাপারে অনিশ্চয়তা থাকে বলেই এই শ্রেণী সব সময়ে চেষ্টা করতেন জমি কিনে অপরকে দিয়ে চাষবাস করাতেন। অসংখ্য মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করার পিছনে ইংরেজের আসল দুরভিসন্ধি ছিল গ্রামের লোকের মধ্যে অনৈক্যকে চিরস্থায়ী রাখা।

কাজেই কেবল জমিদারি নয়, মহাজনি প্রথার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করা কৃষক আন্দোলনের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হয়েছিল। ভারতে কমিউনিস্টদের পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশনে (১৯২৬) যে ১৭টি প্রস্তাব দেওয়া হয় তাতেই প্রথম দাবি করা ছিল

জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ এবং মহাজনি প্রথার কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি তিনটি দাবি। অবশ্য এর আগেই রাশিয়াতে গঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে যে স্মারক লিপি পাঠানো হয় তাতে বলা ছিল প্রথমেই ব্রিটিশ সম্পর্ক-ছিন্ন করে ভারতে যে ফেডারাল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে তার প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও প্রকৃত চাষীকে জমির স্বত্বদান। জমির খাজনার ন্যূনতম হার ধার্যকরা এবং মহাজন, সুদখোর ও ফাটকাবাজরা যাতে কৃষকদের ঋণগ্রস্ত না করতে পারে তার জন্য গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্রীয় কো-অপারেটিভ ব্যাংক স্থাপন করা দরকার। মনে রাখা দরকার এই প্রস্তাবগুলি অধিবেশনের প্রতিমিধিদের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁর বক্তৃতায় বলেন জাতীয় কংগ্রেস যে স্বরাজ দাবি করছে তা দেশের শতকরা নব্বুই জন মানুষের জন্য।

১৯৩৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের সময় নিখিল ভারত কৃষক কংগ্রেস (পরে নাম হয় কৃষকসভা) গঠিত হ'ল। এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থী জাতীয়তাবাদী কমিউনিস্ট ও সোশালিস্টরা যে কৃষক আন্দোলন গড়ে তুললেন তার ফলে ভারতের কৃষক শ্রেণীর পক্ষে যুগান্তকারী ঘটনা যা গত শতাব্দীর কৃষক আন্দোলন ও বিদ্রোহগুলি থেকে গুণগত ও পরিমাণগতভাবে স্বতন্ত্র চরিত্রের। এই প্রথম কৃষকের স্বার্থরক্ষা একটি জাতীয় কর্তব্যের অঙ্গীভূত হল। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সুন্দরবন অঞ্চলে ইউরোপীয় সাহেব ও তাদের দেশীয় সহায়কদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন ত্রিশ দশকেই জাতীয় আন্দোলনের সমর্থন লাভ করে। আন্দোলনের ফলে ফজলুল হক সাহেবকে কৃষক-প্রজা পার্টি দ্বারা গড়া বাংলার মন্ত্রীসভাকে কৃষকদের ঋণভার লাঘবের জন্য আইন করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত একটি কমিশন গঠন করে জমিদারি প্রথা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলিতে তদন্তের বিষয় করতে হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলায় কৃষকরা হাটতোলা বন্ধ আন্দোলন থেকে নিজ খোলানে ধান তোলার আন্দোলনে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও শক্তি বৃদ্ধি করছিল। এই প্রসঙ্গে যে কথাটা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, জঙ্গী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যারা দীর্ঘকারাবাসে মার্ক্সবাদের আলোকে কৃষক সমস্যাকে বুঝতে পেরেছিলেন—তাঁরা জেল থেকে বেরিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে ঢুকে জেলায় জেলায় কৃষকদের সংগঠিত করেছিলেন। পাবনার কৃষক বিদ্রোহীরা এমন কোনও সাহায্য পাননি এবং নীলবিদ্রোহে এই ধরনের সাহায্য যা কৃষকরা পেয়েছিল তা ব্যক্তিভিত্তিক সংগঠনগত নয়। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটেনের পরাজয়, আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্ব, সর্বোপরি সোভিয়েট ইউনিয়নে লাল ফৌজের সাফল্য কৃষক সমাজকে নিজশ্রেণীর শক্তির প্রতি আস্থা বৃদ্ধি করেছিল। গত শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহগুলির কারণ ছিল বারবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলায় মহামন্বন্তরে—ত্রিশ লক্ষ কৃষক ও কৃষি সংলগ্ন বাঙালির হত্যা যে ব্রিটিশের জন্যই হয়েছিল (যখন সারা ভারতে অন্য কোনও প্রদেশ হয়নি) এই চেতনা বাংলার কৃষক আন্দোলনের কর্মীদের মনে দানা বাঁধে। ১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই বাংলাতে সফল সাধারণ ধর্মঘট ব্রিটিশ শাসক ও তাদের দেশীয় সহায়কদের সক্রিয় করে। গবেষকরা যদি চেষ্টা করেন তাহলে বোধ করি জানতে পারবেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের রণনীতি ছিল বাংলাকে জাপানের কাছে হারাতে হলে তারা রাঁচি থেকে বিহার সীমানা ধরে ভারত রক্ষা করবে। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন চট্টগ্রাম দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রসর হতে যা জাপ-বাহিনীর নেতারা করতে বাধা দিয়েছে।

ইংরেজের সত্যই আশংকা ছিল—সুভাষের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং বাংলার কমিউনিস্টরা একত্রে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ে বাংলাকে স্বাধীন করতে পারে। বর্মার কমিউনিস্ট নেতা আউঙ সান প্রথমে ঠিক সুভাষচন্দ্রের মতো জাপ-বাহিনীর সাহায্য নিয়ে বর্মাতে স্বাধীন বর্মা সরকার গঠন করেন এবং জাপানিরা যখন পিছু হটছে তখন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বর্মাকে স্বাধীন করে ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সহকর্মীরা সুভাষচন্দ্রকেও একই পথ গ্রহণের সুপারিশ করেন তা আমরা তাঁর জীবনী থেকে জানতে পেরেছি।

এই সব সংবাদ ব্রিটেন রাখত এবং এই কারণেই তারা উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলনের কৃষকদের রুদ্ররূপ দেখে কংগ্রেস ও লিগ নেতাদের 'কমিউনিস্ট জুজুর' ভয় দেখিয়ে প্রচণ্ড দমননীতি চালিয়ে কৃষক হত্যা করতে থাকে। কিন্তু লাঠি হাতে কৃষকরা এই দমননীতিকে আটকাবে কেমন করে? সাংবাদিক গোলাম কুদ্দুস কৃষকদের অগ্নিমূর্তি দেখে সে যুগের কমিউনিস্ট পার্টি কমরেড সোমনাথ লাহিড়ীর কাছে যখন জানতে চাইলেন—'আপনারা কৃষকদের হাতে বন্দুক দিতে চান, কি চান না বলুন'—লাহিড়ী নির্বাক রইলেন।

কী করে উত্তর দেবেন? ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তখনও প্রচার যে কংগ্রেস ও মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশের কাছ থেকে ক্ষমতালাভ করবে এবং যেহেতু বাংলার মন্ত্রিসভায় লিগের নেতারা আছেন তাই সেই মন্ত্রিসভার দমন নীতির বিরুদ্ধে কৃষকদের সশস্ত্র প্রতিরোধ করা রাজনৈতিকভাবে ভুল হবে। এরপর ব্রিটেন ভারত বিভাগ করে কংগ্রেসও লিগকে ক্ষমতা দেওয়ার পর—তেভাগা সংগ্রামের কি আর কোনও ভবিষ্যৎ থাকতে পারে?

ইদানিংকালে আমরা যখন সেই সংগ্রামের মূল্যায়ন করছি—তখন মনে রাখতে হবে ওই আন্দোলনে প্রথমে প্রাণ দিয়েছে—মুসলমান ও আদিবাসী ক্ষেতমজুর—এবং তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল—বর্গাদার, অল্পজমির মালিক এবং গ্রামের কৃষক রমণীরা। এরই সঙ্গে নেতা হিসাবে ছিলেন শহরের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে—যারা জঙ্গী জাতীয়তাবাদী প্রভাবে দীর্ঘকাল পুলিশের মোকাবিলা করেছেন এবং কৃষকদের চেষ্টায় আত্মরক্ষা করেছেন। শহিদের তালিকায় তাঁদের নাম নেই বটে কিন্তু তার জন্য কখনও কৃষকরা তাঁদের দোষী করেননি কারণ কৃষকরা সচক্ষে দেখেছিল তাঁদের সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং শহরে সংযোগগুলির দ্রুত ব্যবহারের ফলে কৃষকদের পক্ষে জনমত তৈরি করার ক্ষমতা। তেভাগা আন্দোলনের দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ ১৯৪৮-৫০ এর যুগ এবং পরে নকশালবাড়ি আন্দোলনের যুগেও আমরা দেখেছি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লবী অংশের সঙ্গে সংগ্রামী কৃষক শ্রেণীর (স্বভাবত যারা শান্তিপ্রিয়) কত দূর যেতে পারে।

স্বভাবত শান্তিপ্রিয় কৃষক জমি রক্ষার সংগ্রামে সিংহ বিক্রম দেখাতে পারে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার কথা। পাবনার কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে এই পত্রিকা বাংলা —১২৮০ সালের ২৪শে ভাদ্র তারিখে (সম্ভবত ১৮৭৩ সালের আগস্ট হবে) উভয় সংকট শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে জমিদারদের দ্বারা কৃষকদের কাছ থেকে 'বাব'—অর্থাৎ আবওয়াব নেওয়ার সমালোচনা করে লেখে : 'প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত যাবৎ না হইতেছে তাবৎ গবর্নমেন্ট যদি পনেরো কিংবা কুড়ি বৎসর অন্তর এক একবার সমুদায় এদেশে আয় বৃদ্ধি দেখিয়া এক একটি করের হার স্থির করিয়া দেন তাহা হইলে প্রজারাও বুঝিতে পারে সেই পরিমাণে কর দিতে হইবে। এবং জমিদাররাও বুঝিতে পারেন তাহার অধিক প্রার্থনা করিবার তাহাদের অধিকার নাই। অতিরিক্ত কর গ্রহণের চেষ্টা হইলেই কঠিন দণ্ড দ্বারা যেন, তাহা নিবারণ করা হয়। তাহা হইলে জমিদারদিগের অত্যাচার শেষ হইতে পারে।' এরপরই 'সোমপ্রকাশে'র দ্বিতীয় প্রস্তাব : "আজিও কৃষকরা যে রূপ অজ্ঞ আছে তাহাতে তাহারা যে ত্বরায় আপনাদের কষ্ট গবর্নমেন্টের গোচর করিতে শিখিবে এমন আশা করা যায় না। অতএব দেশীয় কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃষকদিগের জন্য বাস্তবিক ভাবিয়া থাকেন তাঁহারা একটি সভা করিয়া সর্বদা কৃষকদিগের অভাব ও কষ্টের বিষয় গবর্নমেন্টের গোচর করেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। ......'ফল কথা এই প্রজাদিগের কষ্টের কথা আর সহ্য হয় না। 'শ্রমজীবী ও কৃষকশ্রেণীর উন্নতি না হইলে সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। সমাজের মধ্যে অলস ও অকর্মন্যেরা যতদিন পরিশ্রমী ও কর্মিষ্ঠ-দিগের রক্ত মাংসে প্রতিপালিত হইবে—ততদিন দেশের ভদ্রস্থতা নাই।"

এই ধরনের উদার মানবিকতা থেকেই শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব তৈরি হয়েছিল। কার্লমার্কস যদিও তখন বেঁচে তবু এই ধরনের রচনা পড়ার সুযোগ তাঁর বা তাঁর সুযোগ্য সহযোগী মহামতি এঙ্গেলসের হয়নি। তবু তাঁদের বৈজ্ঞানিক চিন্তায় আমরা জেনেছি—কোনও দেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সেই দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তব অবস্থা ব্যাপক জনগণের চেতনা ও সংগঠনের উপর নির্ভর করে। তাই সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা না ভেবে নিছক আবেগ দ্বারা পরিচালিত হলে সমগ্র প্রগতি আন্দোলনের যেমন ক্ষতি হয়—তেমনই ক্ষতি হয় অগণিত কৃষকের। আবেগপ্রবণ মধ্যবিত্ত বিপ্লবীরা প্রত্যাসন্ন পরাজয়ে স্বশ্রেণীতে আশ্রয় নিতে পারে—কিন্তু কৃষকদের পক্ষে থাকে কারাবাস, পুলিশি অত্যাচার, বনজঙ্গল ও গাছের ফলমূল এবং গভীর জঙ্গলে লতা-পাতার শয্যা। 'সোমপ্রকাশ'-এর আবেদনের পর প্রায় ১২৪ বছর অতিক্রান্ত এবং ভারতে অনেকগুলি সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠন তৈরি হয়েছে—যাদের মধ্যে কয়েকটি সংগঠন ভারতে কৃষি বিপ্লবের গুরুত্ব স্বীকার করে। ভারতের বর্তমান সামাজিক প্রগতির লক্ষ্যের সঙ্গে কৃষি-বিপ্লবের দাবি রূপায়ণের পদ্ধতির স্থান-নির্ণয় করার সমস্যাই তেভাগা ও পরবর্তী কৃষক সংগ্রামগুলিই আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে।

রণে বাজিল রে
রণ যায় রণডংকা সাজিল রে

কালী সরকার

একে একে বলে যাই শোনেন বন্ধুগণ
খাঁপুর যুদ্ধের কথা করিব বর্ণন
১৩৫৩ সাল মাঘ মাসের শেষে
তে-ভাগার রণে কৃষক কুদ্দিল সাহসে ॥
ভালকা বাঁশের ধনুক নিল হস্তেতে তুলিয়া
চোখা চোখা তীর নিল পৃষ্ঠেতে বাঁধিয়া
দলে দলে কৃষক সাজে বলে মার মার
কোমর বান্ধিয়া সবে হৈল তৈয়ার
ঘুটঘুটি আন্ধার রাতে ম্যাঘের ঝড়ে পানি
জালিমে এই রাতে বুঝি করিবে দুর্শমনি ॥

পৃষ্ঠে বান্ধি ধনুক তীর চোঙ লইয়া করে
ভোলন্টি পাহারা দেয় পাতিরামের মোড়ে
এমন সময় দ্যাখ দূরে দেখা যায়
মটোর গারির বাত্তি মিটি মিটি চায়
মিলিটারির গাড়ি আসে ভেলান্টি ভাবিল
হুশিয়ার বলি মর্দ চোঙে ফুঁক দিল ॥
ডিং ডিং শব্দে নাগরা উঠিল বাজিয়া
ইনক্লাব শব্দে আকাশ উঠিল কাঁপিয়া
না ঢুকে সৈন্যের গাড়ি রড় দিল রণে
পাতিরামে ঢুকিয়া মোড় দিল ডানে
কতক দুর হৈতে গাড়ি কতেক দুরে যায়
বড় রাস্তা ছাড়ি গাড়ি গাঁয়ের পথে যায় ॥

এক ধারে উঁচা পাহাড় একধারে বাড়ি
গুলগুলি পথে মোটর যায় গুড়িগুড়ি ॥
সম্মুখে ফাঁকা জায়গায় মোটর গাড়ি থুইয়া
নামিল কতেক সৈন্য বন্দুক কাঁধে লইয়া
আন্ধার রাতে চুপে চুপে বাড়িতে ঢুকিল
গোপেশ ডাক্তারের সাথে পাঁচজনকে ধরিল ॥
হাতেতে হাতকড়ি লাগায় কোমরে বান্ধে দড়ি
কিলচড় মারি তাদের নিয়ে যায় ধরি ॥

গ্রামের মহিলা যত ক্ষেপিয়া উঠিল
ঝাঁটা বারণ হস্তে মোটর ঘেরিল ॥
নারীগণ সৈন্যে কয় শোনরে গোলাম
সবারে ছাড়িয়া দাও করিয়া সেলাম ॥

ঝাঁটার বাড়িতে নহে খতম হবে
বাপদায় দিয়া ঘরে ফিরে যাও সবে।
নারী ভেলান্টিয়ার সাথে মরদ আসে জুটি
পৃষ্ঠে বানধি ধনুক-তীর হস্তে মোটা লাঠি ॥

সৈন্যের গাড়ির পিছে দেখা নাহি যায়
ট্রেঞ্চে খোঁড়ে কতক বীর গেরিলা কায়দায় ॥
সম্মুখে জনতা দেখি সৈন্যের কাঁপে হিয়া
নিজ নিজ ঘরে সবে যাইরে ফিরিয়া ॥
মুখে বলে এই বাত ট্রাক পিছায় ধীরে
গিড়িত করে পলো গাড়ি গাড়িয়ার ভিতরে ॥

প্রমাদ গনিল সৈন্য জান্ বুঝি গেল্
সম্মুখে তীরের ফালা পিছনেতে খাল ॥
ফায়ার ফায়ার বলি কাপ্তান ডুকুরিয়া উঠিল
অঙ্গ কাঁন্দে ঘন মুতে প্যান্ট ভিজে গেল ॥
বত্রিশটা বন্দুকের গুলি ছোটে ঝাঁকে ঝাঁক
প্রলয়ের আগুনে যেন ছাইল ব্যাবাক ॥

সাজিল কতেক সৈন্য মালকোচা সাটি
ঝাপ্টে নিল তীর-ধনুক কোন্দে ঘোরায় লাঠি ॥
ডিং ডিং ডিং ডিং তাং-ধিতাং নাগরা মাদল রবে
সামিল কৃষক সৈন্য ভয়ঙ্কর সবে ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছোটে লাঠি বনবনে
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য ভয় নাহি মনে ॥
সামনে গুলি মারে সৈন্য পিছনে জমিদার
ছুটিল গেরিলা দল সময় নাহি আর ॥

ছুটিল চিয়ার সাই হাতে মোটা লাঠি
জোয়ান মর্দ বাপের বেটা আটত্রিশ ইঞ্চি ছাতি ॥
দোহাতিয়া বাড়ি মারে সৈন্যের মাথায়
বাপ ডাক ছাড়ি সৈন্য টলে পড়ে যায় ॥
হঠাৎ লাগিল গুলি বাম কাঁধের পরে
ক্রোধ ভরে বাপের বেটা যায় নিজ ঘরে ॥
ঘর হতে চিয়ার সাই শাবল এক আনিল
সবলে ট্রাকের চাকা ফাটিতে লাগিল ॥
আর একগুলি চিয়ার সায়ের বুকে ফোটে
আনধার হৈল দুনিয়াদারি বেতন গেল টুটে ।
ক্ষণে অচেতন মর্দ মনেতে চেতন
লাফ দিয়া ট্রাকে উঠে সিংহের মতন ॥
দুশমনের গুলি ফের লাগিল কপালে
বেহুশ হৈল মর্দ রুহু ছেড়ে দিল
অভিমানে মায়ের বুকে আছড়ি পড়িল ॥

চিয়ার সাই পোল দেখে ক্ষেপিল সকলে
দিশা নাই হুশ নাই মার মার বলে।
লম্ফ দ্যায় কোন মর্দ কেহ হামাগুড়ি
অন্য কথা নাহি মুখে মার মার বুলি ॥
মটোরের চাকা কেহ দুহাতে দিয়া টানে
কেহ আছড়ায় কেহ কামড়ায় হুশ নাহি মনে ॥

তীর ধনুক শাবল লাঠি হাসুয়া কুঠার
মারিছে সবাই দ্যাখ যা ছিল যাহার
কেহ ছোড়ে ঢিল এক অন্ধ ছিটোয় বালি
মার মার মার খালি মার মার বুলি ॥

বন্দুকের গুলি মুখে টিকিতে না পারে
একে একে বীরগণ ঢোলে ঢোলে পড়ে ॥
তিনখানি ট্রাকের মধ্যে অবশ করল দুই
শহিদের রক্তে রাঙা হয়ে গেল ভুঁই ॥
একে একে একুশ বীর জান ছেড়ে দিল
শহীদের রক্তে রাঙা লাল ঝাণ্ডা হলো ॥
যুগ যুগের রুদ্ধ রাগ এই মত করে
ফাটিয়া পড়িল ভাই ঐ না খাঁপুরে ॥
এই খানেকে আমার জং গান সাঙ্গ হয়ে গেল
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ সবাই মুখে বলো ॥

তেভাগা আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামপ্রবাহে মিলেছে

কল্পতরু সেনগুপ্ত

অবিভক্ত বাংলার ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পালিত হচ্ছে। বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে তেভাগার দাবিতে আন্দোলন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। যা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে অঙ্গীভূত এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। আর এক দিকে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর করে তুলেছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে বহু কৃষক বিদ্রোহ, উপজাতি বিদ্রোহ হয়েছে। এই সকল বিদ্রোহে প্রধানত জমিতে ফসলের অধিকার, মহাজনী ব্যবস্থার সুদের চড়া হার এবং কৃষকদের সর্বস্বান্ত হবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে। জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরে বাংলার ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়, গ্রামীন অর্থনীতি, এমনকি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কৃষকরা জমি হারিয়ে খেতমজুরে পরিণত হয়, সুদের দায়ে পৈত্রিক বাড়ি ভিটা হারায়। অবশেষে মরিয়া হয়ে কৃষক সমাজ আন্দোলনে নামে, স্থানে স্থানে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগে জমিদাররা এই সকল বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমন করেছে। এই বিদ্রোহগুলির কথা স্বাধীনতার আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে যতটা মানুষের গোচরে এসেছে, তার পূর্বে আঞ্চলিকভাবে আবদ্ধ ছিল। তিতুমীরের বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ, চোঁয়ার বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, পাবনারেঙপুরের কৃষক বিদ্রোহ, সন্দ্বীপের কৃষক বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ ইত্যাদি বহু বিদ্রোহের মাধ্যমে কৃষকরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। স্বাধীনতা-উত্তর কালে গবেষণা ও পুস্তকের মাধ্যমে এই বিদ্রোহের কথা যতটা আলোকে এসেছে, ভারতের প্রকৃত চিত্র ও মর্মবাণী প্রকাশ পেয়েছে, পরাধীন ভারতে তেমনভাবে দৃষ্টিতে আসেনি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। বরঞ্চ কৃষক সমাজকে দূরে রেখেছে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের এটা এক দুর্বলতার দিক ছিল। তার কারণ জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা

ছিলেন, তাঁরা জমিদার-জোতদারের বাড়ি থেকে এসেছিলেন, অথবা উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের লোক ছিলেন। তাঁরা কৃষকদের সহযাত্রীরূপে ভাবতে পারতেন না। জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরাও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। সুতরাং তাঁরা কৃষকদের সমস্যা ও দাবী বুঝতেন না। যদিও কোনও সময়ে পলাতক অবস্থায় কৃষকের ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছে, শ্রমিকের সাহায্য নিতে হয়েছে, তথাপি তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহযাত্রী করার কথা ভাবেননি। এত ব্যাপকভাবে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন হয়ে গেল অথচ সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমাজে কৃষকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ, তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা আলোচিত হল না। একথা উপলব্ধি হল না বৃহত্তর জনসমাজ কৃষকরা যদি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে তবে সাম্রাজ্যবাদীদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করা যাবে না। রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের (১৯১৭) পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক কৃষকের ভূমিকা উপলব্ধি করা হয়। এই উপলব্ধি থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের একাংশের চেতনায় আসে শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করা প্রয়োজন। অন্যদিকে গান্ধীজি ও তাঁর ঘনিষ্ঠরা কৃষকদের দাবি ও সংগ্রামী চরিত্র দেখে ক্রুদ্ধ হন, এমনকি অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেন।

নভেম্বর বিপ্লবের পরে

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যে পৃথিবীতে নবজাগরণের জোয়ার আসে। তার ঢেউ লেগেছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে। ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয় এবং আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে থাকে। কৃষকদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। কংগ্রেসের মধ্যে লেবার স্বরাজপার্টি গঠিত হয়? পরবর্তী সময়ে লেবার অ্যান্ড পিজেন্টস পার্টি গঠিত হয়। সমাজের বঞ্চিত শোষিত মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ হবার প্রচেষ্টা প্রকাশ পায়। এই সকল সংগঠনের এবং আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে কংগ্রেসের সদস্যরা ছিলেন যাঁরা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘর থেকে এসেছেন। বিপ্লববাদী সংগ্রামের একাংশও যোগ দিয়েছিলেন অভিজ্ঞতায় এবং দেশবিদেশের রাজনৈতিক শিক্ষায়। তিনের দশকে বাংলায় বিপ্লববাদী সশস্ত্র সংগ্রামের চরম প্রকাশ হয়। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ এবং জেলায় জেলায় বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। ১৯৩০-৩৪ সাল পর্যন্ত যেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকে, তার পাশাপাশি ১৯৩৩-৩৪ সালে নোয়াখালি, ত্রিপুরা, ময়মনসিং জেলায় কৃষক আন্দোলন জঙ্গীরূপে প্রকাশ পায়। সেই আন্দোলনে প্রধান ক্ষোভ ছিল মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে, বর্গাদারীব্যবস্থা এবং জমি ও ভিটা থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে। সেই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন হিন্দু-মুসলমান কৃষক ঘরের শিক্ষিত কিছু ব্যক্তি, কয়েকজন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী যাঁরা বুঝেছিলেন ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন ও মহাজনী ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবীতে আন্দোলন না করলে গ্রামের মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত করা যাবে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের চালিকাশক্তি দেশাত্মবোধ এবং শ্রেণী চেতনা। এই আন্দোলন দমন করার জন্য পুলিশ নেমেছিল, গুলি চলেছিল, গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মিলিটারি নামিয়েছিল। কৃষকদের ভয় দেখাবার জন্য গ্রামে গ্রামে মিলিটারির রুট মার্চ করা হয়েছিল। এরূপ সন্ত্রাস সৃষ্টি সত্ত্বেও কৃষক সমিতির ডাকে হাজার হাজার ভাগচাষী ও মহাজন দ্বারা সর্বস্বান্ত খেতমজুররা ধানকাটার পর রাত্রিতে মাঠে সমবেত হতেন। কৃষক নেতারা বক্তৃতা দিতেন। নোয়াখালি ত্রিপুরায় নেতারা ছিলেন মহম্মদ ইয়াকুব, মোখলেদুর রহমান, কৃষসুন্দর ভৌমিক প্রমুখ। এই সময়টা ছিল কৃষক সমিতি গঠনের প্রাথমিক কাল। একই রকম পরিস্থিতি ছিল কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহ জেলায়ও। এই আন্দোলনের দরুন পরবর্তীকালে ঋণশালিসীবোর্ড গঠিত হয়েছিল, এবং প্রজাস্বত্ব আইন হয়েছিল ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা গঠিত হলে। সেদিনের স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক আন্দোলনের কথা আমার স্মৃতিতে আছে। তখন আমি নোয়াখালি জেলায় ছিলাম। এই আন্দোলনের দর্শক থাকায় আমার চিন্তার গতি পরিবর্তন হতে শুরু করে। এই অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন জেলায় কৃষক জাগরণ ঘটে এবং কৃষকরা সমিতি গঠনের দিকে অগ্রসর হয়।

জমিদারী ব্যবস্থার দরুন গ্রামাঞ্চলে শোষণ বৃদ্ধি পায়। একদিকে জমিদার, জোতদার, তালুকদার আর এক দিকে কৃষক, ভাগ চাষী, খেত-মজুর, গ্রামের জীবন ভাগ হয়ে যায়। তার সঙ্গে মহাজনী ব্যবস্থার দরুন কৃষক, ভাগচাষীরা ভিটা-মাটি হারিয়ে পথে বসে। এই ভাঙনের গতিমুখ বন্ধ করার উপায় ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে কৃষকদের যুক্ত করা, যুক্ত করার জন্য জমিদারী প্রথা রদ করার দাবী তোলা। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের গতিমুখ এখানে ছিল না। কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীরা জমিদারীপ্রথা বিলোপের দাবী তুলেছিল। কৃষক সমিতি রণধ্বনি তুলেছিল 'লাঙ্গল যার জমি তার'। এই ধ্বনি ধীরে ধীরে কৃষকদের সংগঠিত হবার প্রেরণা দেয় এবং কংগ্রেসের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করে। যদিও গান্ধীজিরা হৃদয় পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদের আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

তেভাগার প্রস্তাব গ্রহণ

কৃষক সমিতি গঠন ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলায় কৃষক সমিতি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে কৃষক সমিতির বিস্তৃতিতে কমরেড মুজফ্ফর আমেদ, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, আবদুল হালিম, মহম্মদ ইয়াকুব, মণি সিংহ প্রমুখের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪০ সালে যশোহর জেলার পাঁজিয়ায় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সম্মেলন একদিকে যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেই সঙ্গে তখন মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। সুতরাং, সময়ের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। পাঁজিয়া সম্মেলনে বর্গাদার ও আধিয়ারদের প্রশ্নটি গুরুত্ব লাভ করে। দাবি গ্রহণ করা হয় বর্গাদার আধিয়াররা ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ আদায় করবে। এই দাবী গ্রহণে কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। কংগ্রেস মুসলিম লিগের নেতারা এই দাবি তোলায় বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। তা হলেও কোনও কোনও জেলায় কৃষক সমিতির শাখাগুলি এগিয়ে প্রচার শুরু করে দেয়। গ্রামের গরীবদের সঙ্গে ঐক্য গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। কোনও কোনও অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে ধান ভাগের প্রশ্নে জমির মালিকদের সঙ্গে বিরোধও প্রকাশ পায়। ভাগচাষীরা ধান ভাগ করে নিজেদের ভাগ নিয়ে নেয়।

এই সময় দেশের পরিস্থিতিই পরিবর্তন হতে থাকে। মহাযুদ্ধের চাপে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা জটিলতর হয়ে উঠে। একদিকে ভারতশাসন আইনের কঠোরতা বৃদ্ধি পায়, গণআন্দোলনের পথে বাধা আসে, আর এক দিকে দুর্ভিক্ষের কালোছায়া নেমে আসে। চালের দাম, জিনিসপত্রের দাম দ্রুত বাড়তে থাকে। কাপড়-চোপড়, ঔষুধপত্র অমিল হতে থাকে। ১৯৪৩ সালে একমন চালের দাম উঠেছিল আশি টাকা। তখন সের ও মন দরে বেচাকেনা হত। চল্লিশ সেরে এক মন। একসেরের দাম দুই টাকা বা আরও বেশি ১৯৪৩ সালে টাকার দাম পুরো ষোলো আনাই ছিল। গ্রামের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা একেবারে ছিল না। দলে দলে নরনারী শিশুদের নিয়ে শহরের দিকে চলে আসছিল। শহরে ফ্যান দাও ফ্যান দাও কাতর আবেদনে এক করুণ অবস্থা দেখা গেছিল। এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধনীতি, দ্বিতীয়ত জোতদার, তালুকদার এবং বড় ব্যবসায়ীরা ধান চাল মজুত করে মূল্যবৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং দুর্ভিক্ষ ছিল মজুতদার চোরাকারবারিদের সৃষ্টি। শহরের পথে পথে কঙ্কালসার মানুষের মৃতদেহ পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দল হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি সেবা কাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। প্রায় প্রতিটি জেলায় রিলিফ কিচেন খুলে নিরন্নের মুখে অন্নদিতে চেষ্টা করেছিল। দুর্ভিক্ষের পরেই শুরু হয়েছিল মহামারী। ওষুধের অভাবে বিনা চিকিৎসায় অসহায় মানুষ মরেছে। বিশেষ করে শিশু ও নারীরা।

যুদ্ধ ও বিদ্রোহ

এরূপ হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্নিশিখা তীব্রতর হয়ে উঠে ১৯৪৫ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন ফ্যাসিজম বিরোধী যুদ্ধে পরিণত হয়, তখন উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে উঠে। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রজা আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ভারতে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক আন্দোলন জঙ্গীরূপ নিতে থাকে। আর এক দিকে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়, এবং 'দিল্লী চলো' ধ্বনিতে আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতের দিকে অভিযান করে। এই অগ্নিময় পরিস্থিতিতে বোম্বাইতে নৌ-বিদ্রোহ ঘটে। যা পৃথিবীর বৃহত্তম নৌ-বিদ্রোহ। সেদিনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান স্লোগান ছিল সাম্রাজ্যবাদকে শেষ আঘাত হানো, এটা স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ (Final fid for power)। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কৃষক আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে—বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ ভূমিসংস্কার, তেভাগা ইত্যাদির দাবীতে।

গৃহযুদ্ধের চক্রান্ত

এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মুখে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পরিণাম বুঝতে পারে। ক্যাবিনেট মিশনে পাঠিয়ে এবং নানাভাবে আলোচনার কাজ চালাতে থাকে, আপসের জন্য ভারতের কংগ্রেস এবং মুসলীম লিগের নেতাদের সঙ্গে দরকষাকষি শুরু হয়। আর একদিকে হিংসাত্মক চক্রান্ত চালাতে থাকে—উপজাতীয় অঞ্চলে বিভেদ সৃষ্টির জন্য বিমান থেকে অস্ত্র নিক্ষেপ করে গৃহযুদ্ধ বাধাতে চেষ্টা করে। এই সময় মুসলীম লিগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস পালনে ডাক দেয়। ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়। যে দাঙ্গার কথা মুসলিম লীগের অনেক সদস্যও ভাবতে পারেনি। হাজার হাজার লোকের লাশ পড়ে যায়। এই দাঙ্গায় ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ অবধারিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে যদিও সকলেই স্বীকার করেছে এই দাঙ্গা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দালালরাই বাধিয়েছে পরিকল্পনা মাফিক। মানুষ চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

বিকল্প শক্তির প্রকাশ

কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে দেশবাসী আর এক বিকল্প শক্তি দেখল সেই বছরেই ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। উত্তর দিনাজপুরের দূর গ্রামে ঢোল-নাকাড়া বেজে উঠে, আর ধ্বনি ওঠে—'আধি নয়, তেভাগা'। হিন্দু-মুসলমান, সাঁওতাল, ওঁরাও কৃষকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ধান কাটে, নিজ উঠোনে তোলে, অথবা মাঠেই ভাগ করে একভাগ মালিককে দিয়ে দুই ভাগ নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। দেখতে দেখতে এই তেভাগার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এগারোটি জেলায়। ষাট লক্ষ ভাগচাষী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে যায়। জেলায় জেলায় গানে গানে, স্লোগানে একটি সুরই শোনা যায় 'জান দেব তো ধান দেব না'। উত্তরবঙ্গ থেকে সুন্দরবন, ময়মনসিংহ থেকে ত্রিপুরা তেভাগার ধ্বনিতে উত্তাল হয়ে উঠল, কে হিন্দু কে মুসলমান এই প্রশ্ন যেন মুছে গেল। দেশবাসী অবাক হয়ে গেল এই একতা দেখে। ধানের লড়াই একবার লড়াইতে পরিণত হল। এই তেভাগার লড়াইকে প্রতিরোধ করতে কৃষকের ঐক্য ভাঙতে এগিয়ে এসেছিল জমিদারের দালাল, জোতদার, তালুকদাররা। তাদেরি সঙ্গে নামল পুলিশ বাহিনী, সরকারি পদস্থ কর্মচারীরা। ৫০ জনের বেশি কৃষক নিহত হয়ে শহিদের সম্মান লাভ করেন। প্রায় চার হাজার কৃষক গ্রেপ্তার হন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাত্র সাড়ে চার মাস পরে পরিস্থিতির এমন যে পরিবর্তন হতে পারে, তা বিস্ময়ের সঙ্গে দেশবাসী দেখল। তখনই বুঝা গিয়েছিল হিন্দু-মুসলমান ব্যবধান কৃত্রিম ব্যাপার। অর্থনৈতিক প্রশ্নে, জমির লড়াইতে দুইয়ের এক হতে সময় লাগে না। ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠনের প্রশ্ন স্বাভাবিক নয়।

হাজং চাষীদের বিদ্রোহ

তেভাগার লড়াই আরও উন্নত পর্যায়ে উঠেছিল ময়মনসিংহ জেলায় সুসং-এ। হাজং উপজাতি চাষীরা টংক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। সেই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহে পরিণত হয়, এবং হাজংরা অস্ত্র ধরতে বাধ্য হয় শাসকদের অস্ত্রের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী কৃষকরাও বিদ্রোহ করেছিল, জলপাইগুড়িতে সাঁওতাল-ওঁরাও উপজাতিরাও এই সংগ্রামে সমবেত হয়েছিল। শাসক শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধে এই আন্দোলন বিদ্রোহের দিকে অগ্রসর হয়। সিলেট, রাজশাহী ইত্যাদি জেলায়ও আন্দোলন জঙ্গীরূপ ধারণ করে। আরও উল্লেখযোগ্য যে দেশভাগের পরেও সুসং-এ হাজং বিদ্রোহ, রাজশাহীর নাচোলে এবং সিলেটে আঞ্চলিকভাবে আন্দোলন অব্যাহত ছিল। পাকিস্তানী ফৌজেরা

কৃষকদের হত্যা করেছে। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ প্রয়োজন-তেভাগা পর্যায়ে ভাগচাষীরা এত সংযতভাবে আন্দোলন করেছে যে তারা কোনও জোতদার-জমিদারকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করেনি, সন্ত্রাস সৃষ্টি করেনি। কিন্তু জোতদার-জমিদাররা পুলিশ ডেকে এবং দেশভাগের পরে পাকিস্তানী ফৌজেরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনে অর্থাৎ হাজং বিদ্রোহ ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন এই আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে। বহু কমিউনিস্ট কারাগারে নিহত হয়েছে, সংঘর্ষে নিহত হয়েছে। অনেক কমিউনিস্ট জমিদার-জোতদারের ঘরের সন্তান হয়েও তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। হাজং বিদ্রোহেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। যেমন সুসং-এ মণি সিং-এর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ্য। তিনি হাজংদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। সুসং-এর জমিদার ময়মনসিং-এর মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী। অথচ সেই মহারাজার পুত্র স্নেহাংশুকান্ত আচার্য হাজং বিদ্রোহকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। অর্থ ও আইনের পরামর্শ কেবল নয়, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে এমন পলাতকদের আশ্রয় দিয়েছেন, এমনকি নিজের বাড়ির বন্দুক পর্যন্ত দিয়েছেন। জমিদার বাড়ির সন্তান হয়েও এমনভাবে শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ায় তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দুর্গ

তেভাগার সংগ্রামের সাফল্যের আর এক সাম্প্রদায়িক বিভেদ থেকে মুক্তি। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কুমিল্লা জেলার হাসানাবাদ গালিমপুরে কৃষকদের দাঙ্গাবিরোধী ঐক্য। নোয়াখালিতে যখন দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠেছে, দলে দলে হিন্দুরা গ্রাম ত্যাগ করছে। সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লিগের গুণ্ডারা বাড়ি-ঘর লুট করছে তখন হাসানাবাদ-গালিমপুরের হিন্দু-মুসলমান কৃষক রুখে দাঁড়িয়েছিল দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে। ১৯৩৩-৩৪ সালে থেকে উচ্ছেদ ও মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে এবং ভাগচাষী আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় এই অঞ্চলের কৃষকরা রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল, শ্রেণী চেতনায় সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠেছিল। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে প্রায় দশ হাজার কৃষক যুবক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেছিল। গ্রামীণ অস্ত্রাদি নিয়ে রাতদিন পাহারা বসিয়েছিল। নোয়াখালী থেকে আসা চার হাজার হিন্দু উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিয়েছিল। তাদের জন্য রিলিফ কিচেন খুলেছিল। নোয়াখালীর দাঙ্গাকারীরা হাসানাবাদে আক্রমণোদ্যত হলে তাদের আঘাত করে, নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। তেভাগা আন্দোলনের শিক্ষা কত উন্নত স্তরে পৌঁছাতে পারে হাসানাবাদের কৃষক নেতারা সেই পথ দেখিয়েছিলেন। সেই সময়ে গান্ধীজি নোয়াখালীতে শিবির স্থাপন করে মন পরিবর্তনের পরীক্ষা করছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে এবং সরকারী সশস্ত্র পুলিশের উপস্থিতিতে দাঙ্গা প্রশমিত হয়েছিল, কিন্তু মন পরিবর্তন হয়েছিল বলা যায় না। হাসানাবাদের কৃষক নেতারা নোয়াখালী গিয়ে গান্ধীজীকে হাসানাবাদ পরিদর্শন করে হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের ঐক্যের সংগ্রাম দেখে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সময় করে উঠতে পারেননি।

১৯৪৬-এর ভয়ঙ্কর দাঙ্গার পর হাসানাবাদ-গালিমপুর তেভাগা আন্দোলনের শিক্ষায় ঐক্যের পথ দেখিয়েছে। শ্রমজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকলে দাঙ্গা প্রতিরোধ করা সম্ভব প্রমাণ করেছে।

সংগ্রাম ও সংস্কৃতি

আন্দোলন সমাজের কত গভীরে পৌঁছেছে তা বুঝা যায় সংস্কৃতির বিকাশে। গণ-আন্দোলন আর সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা প্রকাশ পেয়েছিল বন্দেমাতরম সঙ্গীতে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের গানে গানে মানুষ স্বদেশ চেতনা লাভ করেছে। ক্ষুদিরামের ফাঁসির গানের মতো লোকসঙ্গীতে পরাধীনতার শিকল ভাঙার সংকল্প জেগেছে। পরবর্তীকালে যখন কৃষক সমিতি ও মেহনতি মানুষ শ্রেণী শোষণ থেকে মুক্ত হবার সংগ্রামকে স্বাধীনতার সংগ্রামকে যুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছে, তখন নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষায় সচেতন কাজী নজরুল গেয়েছেন—"উঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙ্গল, মরতে আছি ভাল করে মরব এবার চল।" তিনি রচনা করেছেন ধীবরের গান, শ্রমিকের গান, ছাত্র ও যুবকদের গান, লাল পতাকার গান। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গান অনুবাদ করেছেন। সেই গানগুলি তিনি সভায় গেয়েছেন। শ্রমিক কৃষক, ছাত্র-যুবকরাও গেয়েছেন। বাংলায় কৃষক-শ্রমিক ছাত্র আন্দোলন সাঙ্গীতিক ভাষা পেয়েছে এই সকল গানের মাধ্যমে, এবং মানুষকে অনুপ্রাণিতও করেছে। তেভাগা আন্দোলনের প্রাণের ভাষা 'জান দেব তো ধান দেব না' একটা শ্লোগানে পরিণত হয়েছিল। মাদলের তালে তালে এই গান গেয়ে ভাগচাষীরা এগিয়ে গেছে, জান দিয়েছে। সলিল চৌধুরীর আর একটা গান 'হে সামালো ধান হো' মাঠ -গ্রাম মাতিয়ে তুলেছিল। প্রবীর মজুমদারের শোন গো দূরের পথিক! এ পথে যেতে একবার থেমে যাও গো! শহিদ অহল্যামাস্মরণে মর্মান্তিক অথচ শোক গাথা। সাধন দাশগুপ্তের 'চাষী দে তোর লাল সেলাম—লাল নিশান রে' নেত্রকোণ কৃষক সম্মেলনে উদ্বোধন সঙ্গীত গাওয়া হয়েছিল। মাঠ-গ্রামে সভায় সভায় গাওয়া হত। বিনয় রায়ের সেই বিখ্যাত গান 'আর কতকাল, বল কতকাল সইব এ মৃত্যু অপমান,' সাধন গুহের 'অহল্যা যার চিতার আগুন' ইত্যাদি বহু গান নামী-অনামী অনেকে রচনা করেছিলেন এবং গ্রামে গ্রামে গাওয়া হত। সেই গানগুলির সুরের ঢেউ শহরে পৌঁছেছিল, যা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করাতে পেরেছিল। এতবছর পরেও এই গানগুলি প্রেরণা দেয়। তেভাগার অভিজ্ঞতায় বহু 'গল্প কবিতা' রচিত হয়েছে। গল্পের বই প্রকাশ হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবাহ

সুতরাং, তেভাগা ধান ভাগের আন্দোলন, বা অর্থনৈতিক দাবীর আন্দোলন আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও তৎকালীন পরিস্থিতিতে এই আন্দোলন রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করে তুলতে সহায়ক হয়েছিল। ব্যাপক কৃষক সমাজ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, যার পরিণতিতে সঙ্ঘবদ্ধ কৃষকরা স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হতে পেরেছে। দেশবাসী উপলব্ধি করেছে ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ হতে পারে না।

তেভাগার পঞ্চাশ বছর প্রসঙ্গে

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

তেভাগা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার বিগত সম্মেলনে বলা হয়েছে

"তেভাগা আন্দোলন ছিল হিন্দু-মুসলমান আদিবাসী নির্বিশেষে কৃষক ও গ্রামের গরিব শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ এক সংগ্রাম। তেভাগা আন্দোলনের প্রথম শহিদ দিনাজপুরের চিরিববন্দরের তালপুকুর গ্রামের শিবরাম মাঝি ও সমিরুদ্দিন—একজন আদিবাসী খেতমজুর অন্যজন মুসলমান গরিব চাষী। তেভাগা আন্দোলনকে দাবিয়ে দিতে প্রচণ্ড দমন-পীড়ন চলাকালে তখনকার আইনসভায় কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন : 'আমি নিশ্চিত যে দিনাজপুরের সমিরুদ্দিন ও শিবরামের মতো মানুষেরা যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হবে না।"

"বাংলার তেভাগা আন্দোলন শুধুমাত্র ভাগচাষী-আধিয়ারদের কিছু বাড়তি ফসল আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তেভাগা আন্দোলন ছিল বড় জমির মালিক ও সামন্তবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক শ্রেণী-লড়াই। ছেচল্লিশের তেভাগা আন্দোলন বাংলার কৃষককে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার পথ দেখিয়েছে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করেছে এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণের কব্জায় আঘাত করার প্রেরণা দিয়েছে। তেভাগা আন্দোলনের পথ ধরে পঞ্চাশের দশকে খাদ্যের জন্য ও মজুতদারীর বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম, সকল ক্ষেত্রে ভাগচাষী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন, মহাজনী জুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বড় জমির মালিকদের কৃষক ও গণতান্ত্রিক জনগণের কাছে জমিচোর, খাদ্যচোর ও সমগ্র জনগণের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করার পটভূমিকায় কৃষক আন্দোলনের উচ্চতম ধাপে জমির আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছে। ....."

বাংলার 'তেভাগা' শুধু বাঙালির কাছেই নয়, গোটা দেশের কৃষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে

এক তাৎপর্যময় শব্দ হয়ে রয়েছে—ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে যুক্ত করেছে এক নতুন পরিচ্ছেদ।

১৯৪৬ সালের মার্চ-এপ্রিলে বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনের সময় থেকেই কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন ও দাবি আদায়ে সক্রিয় হবার মনোভাব দেখা যাচ্ছিল। জমিদারি জুলুম, আধিয়ার উচ্ছেদ ও বর্গাদার-আধিয়ারদের মেহনতের ফসলে বেআইনি আদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকরা সরব। শোনা যাচ্ছে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। গ্রাম বাংলার অবস্থার ইঙ্গিত দিয়ে 'দি ইস্টার্ন ইকনমিস্ট' ১৯৪৬ সালের ২৬ জুলাই লিখল: 'বর্তমান প্রজন্মের মানুষ এই প্রথম শুনতে পেলেন, দাবি না মানা হলে কৃষি মজুররা জমিদারদের কাজ করতে অস্বীকার করছে।'

বাংলার প্রধানমন্ত্রী তখন মুসলিম লিগ নেতা শহিদ সুরওয়ার্দি। প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে তখন বলা হত প্রধানমন্ত্রী। মাত্র কয়েক মাস পর তেভাগা আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠার সময় ১৯৪৬ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে বাংলার নতুন গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন কমিউনিস্ট বিদ্বেষী হিসাবে পরিচিত ব্রিটিশ আমলা ফ্রেডরিক বরোজ। দুনিয়ার পরমতম শত্রু ফ্যাসিস্ট হিটলারের জল্লাদ বাহিনীর সোভিয়েট লাল ফৌজের কাছে পরাজয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর ১৯৪৫ সালের শেষভাগে গোটা দুনিয়ার পরাধীনতার গ্লানিমুক্তির যুগ দেখা দিয়েছে। ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার আকাঙক্ষা এবং সংগ্রামের আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, ধর্মঘট ও ব্যারিকেড লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। ভারতের নতুন বড়লাট হয়ে এসে ওয়াভেল সাহেব ঘোষণা করলেন, ক্ষমতার হাতবদল ও স্বাধীন ভারতের সংবিধান তৈরির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। তিনি এটাও জানিয়ে দিলেন, বড়লাটের যে নতুন কর্মপরিষদ গঠিত হবে তাতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে। বড়লাটের ঘোষণায় ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারত ভাগের ব্রিটিশ কৌশলের সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া গেল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৌশল ছিল ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ—দ্বিখণ্ডিত বাংলা। পর্দার আড়ালের চক্রান্তে পাকিস্তান আদায়ের দাবিতে মুসলিম লিগ ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিল। কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম! তার কোনও ঘোষণা তারা করলনা। মুসলিম লিগ কলকাতার মনুমেন্ট ময়দানে সমাবেশের আহ্বান জানালো। সভা শেষে উগ্র মূর্তিতে শুরু হল সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব ও লুটপাট। বিদ্যুৎ গতিতে কলকাতার অলি-গলিতে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। ক্রোধান্ত হানাহানি খুনোখুনি। ব্রিটিশ বাহিনীকে ২৪ ঘণ্টা ধরে সামরিক ছাউনির মধ্যে নিশ্চুপ করে রেখে দেওয়া হল। রক্তস্নাত কলকাতা। রাস্তায় গলিতে হিন্দু-মুসলমান যুবক-বৃদ্ধ-শিশু নারী-পুরুষের প্রাণহীন দেহ। মাত্র ৫ দিনে ৫ হাজার মানুষ প্রাণ হারালেন৷ আহত ও অর্ধমৃত ১০ হাজার। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা—সর্বত্র চলেছে ভয়ঙ্কর সব গুজব, ধর্মীয় অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং আত্মরক্ষা ও প্রতিহিংসার বিষাক্ত বাতাস। এই আবহাওয়ার মধ্যে ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে কৃষক কাউন্সিল থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল 'এই মরশুমেই তেভাগা চাই'। সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার ওপর। বাংলায় আমন ধান কাটা শুরু হয় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে। মাত্র দেড় মাসের প্রস্তুতি। শীতের শিহরণের মধ্যে গ্রামের কৃষকদের নিজেদের অধিকার বুঝে নেবার উত্তাপ। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের একই শত্রু বড় বড় জোতদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মনোভাব।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও আক্রমণ প্রতিরোধের প্রস্তুতি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত। দাঙ্গাবাজরা হিন্দু মুসলিম হানাহানিকে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চালিয়েছে পুলিশের নির্লজ্জ নিষ্ক্রিয়তায় ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় নোয়াখালির ভয়ঙ্কর দাঙ্গা শুরু হল। দু'দিনের মধ্যে পুরো রামগঞ্জ থানা, বেগমগঞ্জ ও লখিমপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় চালানো হল দাঙ্গার বর্বর পৈশাচিকতা।

নিখিল ভারত কৃষক সভার সভাপতি তখন কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, যুগ্ম সম্পাদক আবদুল্লাহ্ রসুল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক মনসুর হবিবুল্লাহ—সকলেই কমিউনিস্ট নেতা। নোয়াখালির বীভৎস দাঙ্গার পর হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের পরস্পরের ওপর বিশ্বাস নিয়ে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে দাঙ্গাবাজদের প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়ে এক বিবৃতিতে তাঁরা স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন : "........প্রত্যেক হিন্দু-মুসলমান কৃষক, বিশেষ করিয়া কিষান সভার সভ্যদের ভুলিলে চলিবে না যে সমস্ত কৃষক তাঁহাদের ভাই এবং সংকট মুহূর্তে বিপন্ন ভাইদের পাশে আসিয়া তাঁহাদের দাঁড়াইতে হইবে। এই প্রাথমিক কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইলে তাঁহাদের ঐক্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে এবং তাঁহাদিগকে তাঁহাদের শ্রেণীশত্রুর অধিকতর অত্যাচারের সম্মুখীন হইতে হইবে।" ['স্বাধীনতা' ২১.১০.৪৬]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে সমিতির সংগঠকরা নেমে পড়েছেন। দিনে এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে হেঁটে চলা, রাতে মিটিং—হিন্দু মুসলমান ঐক্য বজায় রেখে ভাগচাষী-আধিয়ারদের তেভাগা চাই, নিজেদের খোলান খামারে ধান তুলতে হবে। ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার মুসুরদিয়া ইউনিয়নের (গ্রামের পঞ্চায়েতকে তখন বলা হত "ইউনিয়ন" বা ইউনিয়ন বোর্ড) চাতাল, বাগহাটা, চারিগাতি, বাঘাবাড় প্রভৃতি গ্রামের হিন্দু-মুসলমান কৃষক-বর্গাদার খেতমজুররা ১৯৪৬ সালের ২রা নভেম্বরের এক সভায় বর্গাদারদের 'তেভাগা' আদায়ের সিদ্ধান্ত নিলেন।

আন্দামান জেল থেকে সদ্যমুক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী সুনীল চট্টোপাধ্যায় লিখলেন ('স্বাধীনতা' ১৬.১১.৪৬) ঃ

"গত ৮ নভেম্বর কাকদ্বীপ পৌঁছে বুধাখালি গ্রামে যাই। সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতির লাল ঝাণ্ডা উড়ছে, খবর পেয়েছি। সুন্দরবনের সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক সেই লাল ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে সরকার, জমিদার ও মহাজনের চক্রান্ত ব্যর্থ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। দাবি তুলেছে—জমিদারের খামারে ধান তুলব না, দশ আনা চাষীর ছ'আনা জমিদারের, ভাগচাষীর স্বত্ব স্বীকার করতে হবে।......যেখানে আগেই জমিদারের গোলায় ধান উঠেছে সেখানকার কৃষকরা নিজেদের ভাগের ধানও নেয়নি, জমিদারের ধানও বাইরে যেতে দেয়নি। জমিদাররা বাইরে থেকে লাঠিয়াল এনেছিল ; কৃষকদের কথা শুনে তারা ফিরে গিয়েছে—বলেছে ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়বে না।......ঘুমন্ত সুন্দরবন আজ জেগে উঠেছে।"

যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার দুর্গাপুরে ৪০টি গ্রামের দেড় হাজার কৃষক প্রতিনিধি ১৫ নভেম্বর সভা করে তেভাগা আদায়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। আন্দোলন পরিচালনার জন্য হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ 'তেভাগা কমিটি' তৈরি হল। এরাই এলাকায় সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষা করবে। একই দিনে রংপুর জেলার ডোমারে তেভাগার সমর্থনে অনুষ্ঠিত হল বিরাট সমাবেশ। সেই দিনই দিনাজপুর জেলার শিবরামপুরে পাঁচ হাজার কৃষকের সভায় সভাপতিত্ব করলেন কমিউনিস্ট নেতা রূপনারায়ণ রায়। বক্তা ছিলেন সুনীল সেন। দাবি একই—'তেভাগা চাই' 'নিজ খোলানে ধান তোল'। ধান কাটা শুরু হলে বাংলার ২৬টি জেলার মধ্যে ১৯টি জেলায় দ্রুত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। অন্যান্য জেলাতে আন্দোলন ছড়িয়ে পরার লক্ষণ।

আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৪৬ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে খবর বার হল। প্রাদেশিক মুসলিম লিগ সরকার নাকি এক গোপন সারকুলার জারি করেছে, যাতে পরবর্তী আইনসভার অধিবেশনে বর্গাদারদের 'তেভাগা' স্বীকার করে নেওয়া হবে। আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান চাপে লিগ সরকার ১৯৪৭ সালের ২২ জানুয়ারি কলকাতা অতিরিক্ত গেজেটে তেভাগার দাবিকে স্বীকৃতি দিয়ে 'বেঙ্গল বর্গাদারস টেম্পোরারি রেগুলেশন বিল' প্রকাশ করল। এই বিলই সাধারণভাবে পরিচিত হল 'বর্গাদার বিল' বলে। অসংগঠিত এলাকায় যেখানে ভাগচাষীরা নিজেদের খামারে খোলানে ধান তোলেনি সেখানকার ধান তখন জোতদার-জমিদারের খামারে গাদাজাত। কোথাও চলেছে ধান ঝাড়াই, কোথাও তার প্রস্তুতি।

'বর্গাদার বিল' প্রকাশ হবার পর তেভাগা আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সৃষ্টি হল। নিজেদের খামারে-খোলানে ধান তুলে যে সব ভাগচাষী তেভাগা আদায় করে নিয়েছেন তাঁরা নিজেদের শঙ্কামুক্ত মনে করে আশ্বস্ত। যারা প্রথাগত আধা ভাগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বঞ্চনার জ্বালা ও বাড়তি ধান না আদায়ের গ্লানি। আর যাদের ধান তখনও ঝাড়াই-মাড়াইয়ের অপেক্ষায় জোতদারের খামারে গাদাজাত হয়ে রয়েছে তাঁদের মধ্যে চঞ্চলতা। আইনে মেনে নেওয়া হলে তারা কেন তেভাগা পাবে না!

তেভাগা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হল। কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ত। জোতদারের খামারে ওঠা ভাগচাষীর গাদাজাত ধান ভেঙে তেভাগা আদায়ের সংগ্রাম। তেভাগা আদায়ে বর্গাদার বিল নতুন অনুপ্রেরণা এনে দিল।

আন্দোলনের প্রসারে জোতদার-কায়েমীস্বার্থ এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে আতংকিত করে তুললো। আতংকিত করে তুললো কংগ্রেস ও মুসলিম লিগকে। গ্রামের বড় জমির মালিকরাই ছিলেন এই দুই দলের রাজনৈতিক ভিত্তি। তাঁরা ছিলেন গ্রাম বাংলায় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা বা লিগের নেতা, কর্মী ও সমর্থক। অনেকেই জেলা, মহকুমা বা থানা এলাকার নেতা। মুসলিম লিগ সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টির কৌশল নিয়ে বর্গাদার ও তেভাগা আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে 'ধান লুঠ', 'বিশৃঙ্খলা', 'সন্ত্রাস' ইত্যাদি অভিযোগ এনে সরকারের কাছে অসংখ্য টেলিগ্রাম পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল বড় জমির মালিক জোতদার এবং সেইসঙ্গে এলাকার কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ দলের নেতাদের পক্ষ থেকে।

'বর্গাদার বিল' প্রকাশ হবার পর তেভাগা আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সৃষ্টি হল। নিজেদের খামারে-খোলানে ধান তুলে যে সব ভাগচাষী তেভাগা আদায় করে নিয়েছেন তাঁরা নিজেদের শঙ্কামুক্ত মনে করে আশ্বস্ত। যাঁরা প্রথাগত আধা ভাগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বঞ্চনার জ্বালা ও বাড়তি ধান না আদায়ের গ্লানি। আর যাঁদের ধান তখনও ঝাড়াই-মাড়াইয়ের অপেক্ষায় জোতদারের খামারে গাদাজাত হয়ে রয়েছে তাঁদের মধ্যে চঞ্চলতা। আইনে মেনে নেওয়া হলে তারা কেন তেভাগা পাবে না!

বাংলায় তেভাগা আন্দোলন তখন ক্রমেই ব্যাপকতা নিচ্ছে। জাতীয় নেতা গান্ধীজি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৌত্য নিয়ে নোয়াখালি জেলায় গ্রামের পর গ্রাম সফর করছেন। নোয়াখালির নবগ্রামে ১৯৪৭ সালের ৩০ জানুয়ারি তেভাগার দাবি সমর্থন করে তিনি বললেন : "ঈশ্বরই হলেন জমির মালিক। আমি বিশ্বাস করি, যে জমি চাষ করে না উৎপন্ন ফসলেও তার অধিকার নেই। অর্ধেকের বদলে জমির মালিকের প্রাপ্য ফসলের এক-তৃতীয়াংশ হলে তা সকলেরই মেনে নেওয়া উচিত।" ১৩ ফেব্রুয়ারি গান্ধীজি উপস্থিত হলেন পূর্ব কেরোয়া গ্রামে। এখানে তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখা হয়—তখনকার অবস্থায়, বিশেষ করে তেভাগা মেনে নিলে যখন বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে তখন কি গান্ধীজির তেভাগা আন্দোলনকে সমর্থন করা ভুল হচ্ছে না?

গান্ধীজির জীবনীকার ডি জি তেন্দুলকার 'মহাত্মা' গ্রন্থে এই প্রশ্নে গান্ধীজির মনোভাব সম্বন্ধে লিখেছেন : "গান্ধীজি বুঝেছিলেন, প্রশ্নটিতে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। জমিদাররা এখনি শেষ হয়ে যাচ্ছে না। তাদের জমিও কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল না। তারা ফসলের যে পঞ্চাশ শতাংশ ভাগ পায় তা কমিয়ে তাদের শতকরা তেত্রিশ অংশ দেবার কথা হচ্ছে। এভাগ তারা পাবেন যত দূরে বা অসুবিধার মধ্যেই (লেখক ইংরেজিতে 'টিমবাকটু' শব্দটি ব্যবহার করেছেন) তারা থাকুন না কেন। এর মধ্যে জমিদারদের ধ্বংসের কোনও চিহ্ন তিনি দেখেননি।......মালিকের ভাগ কমানোর দাবির পেছনে যে নৈতিক যুক্তি রয়েছে জমিদারদের তা মেনে নেওয়া উচিত এবং চলতি প্রথা (আধা-ভাগ) সংশোধনের জন্য সক্রিয় হওয়া দরকার। তাতে

তাদের লাভ হবারই সম্ভাবনা। নিজের ফসলের সামান্য কিছু অংশ কম পাবার বিনিময়ে তাদের যেন জমি হারাবার মুখোমুখি হতে না হয়।"—গান্ধীজির অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা তেভাগা আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলার মুসলিম লিগ সরকার 'বর্গাদার বিল' প্রকাশ ক'রে এবং আইনসভায় খসড়া বিল এনেও তাকে আইনে পরিণত করল না—তেভাগা আন্দোলন দাবিয়ে দিতে ব্যবস্থা নিল প্রচণ্ড আক্রমণ ও দমন-পীড়ন।

আন্দোলন শুরু হবার সময়কালে বাংলার মুসলিম লিগ সরকার ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। অধিকাংশ মুসলিম কৃষকের সমর্থনের কথা ভেবে অনেক মন্ত্রীর কথাবার্তায় তেভাগার দাবির প্রতি আপাত সমর্থন দেখা গিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আবহাওয়ায় অধিকাংশ মুসলিম জোতদার এই ভেবে আত্মসন্তুষ্ট ছিলেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের বর্গাদার আধিয়াররা মনিবের আনুগত্য ছেড়ে জোর করে তেভাগা আদায়ে নিজেদের বিরত রাখবে। ধান কাটা মরশুম শুরু হলে হিন্দু-মুসলিম জোতদারদের হতবাক এবং ক্রমেই ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলে বেশ কয়েকটি জেলায় ঐক্যবদ্ধ হিন্দু-মুসলমান বর্গাদার ও কৃষকরা নিজ খোলানে-খামারে ধান তোলা শুরু করলেন। আন্দোলন দ্রুত প্রসারিত হতে থাকল জেলায় জেলায়। বর্গাদার বিলের ওপর বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে আইনসভায় মুসলিম লিগ সরকারের নেতা শহিদ সুরাবর্দি ১৯৪৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বললেন, আন্দোলনের এলাকাগুলি থেকে "বিভিন্ন জোতদারের বাড়িতে লুটপাটের অভিযোগ জানিয়ে বন্যাস্রোতের মতো টেলিগ্রাম আসছে।" প্রচণ্ড চাপের মুখে লিগ সরকার "আইনভঙ্গকারী ও সরকারি সিদ্ধান্ত বানচালকারী" আন্দোলনকারীদের ওপর শুরু করল বর্বর পুলিশি আক্রমণ।

প্রয়াত কৃষক নেতা মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল 'বাংলার তেভাগা আন্দোলন' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে লিখেছেন :

"পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট এম. এল. এ কমরেড জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দির সঙ্গে একান্ত ব্যক্তিগত কথাবার্তায় যখন জিজ্ঞাসা করেন, বিলটি আইনসভায় আনা হল না কেন, উত্তরে তিনি খোলাখুলি বলেছিলেন, বিলটি প্রকাশের আগে তাঁদের হিসাবে এই ধারণাই ছিল না যে, জোতদারদের শক্তি কি দারুণ।"

কলকাতায় বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল ১৯৪৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর। সভায় কৃষকদের 'তেভাগা' বিষয়টির উল্লেখ পর্যন্ত থাকল না।

তেভাগা আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি। ১৯৪৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকা খবর দিয়েছে : বর্গাদার বিলে কংগ্রেসের আপত্তির কারণ হল, বিলটি সরল বর্গাদারদের ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে-আইনভঙ্গ করতে উস্কানি দেবে। ৮ এবং ৯ ফেব্রুয়ারির আনন্দবাজারে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা গেল, বর্গাদার বিলের বিরুদ্ধে কংগ্রেস পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ ও বর্ধমানে সভা করেছে। তাদের অভিযোগ যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশে 'বর্গাদার বিল' দেশ ও জাতির বিপদকে বাড়িয়ে তুলছে এবং এতে মধ্যবিত্তরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র দৈনিক 'স্বাধীনতা' কাগজে এক প্রতিবেদনে (৬.৪.৪৭) লেখা হয়েছে : দিনাজপুর জেলায় 'জোতদার সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঠাকুরগাঁ মহকুমার হিন্দু মহাসভার সভাপতি রায়সাহেব গিরীন চৌধুরীর বাড়িতে ১৫ জানুয়ারি (১৯৪৭) এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা লিগের সভাপতি কেরামত আলি, সম্পাদক নুরুল হক চৌধুরী, লিগ নেতা আজিমুদ্দিন আহ্‌মেদ এবং কংগ্রেস নেতা সতীশ ঘোষ। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় : "মন্ত্রিসভার নিকট দরখাস্ত, টেলিগ্রাম ও প্রতিনিধিদল পাঠাইয়া তেভাগার বিরুদ্ধে প্রচার, কংগ্রেস-লিগ এম এল-দের মারফত কংগ্রেস লিগ প্রতিষ্ঠানকে জোতদারদের স্বপক্ষে টানা, কয়েকটি সংবাদপত্রের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধ স্থাপন, কৃষকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে মামলা দায়ের এবং এই সমস্ত কাজের জন্য ঠাকুরগাঁ মহকুমায় ২০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে।"

বঙ্গীয় আইন সভায় বর্গাদার বিলের ওপর কংগ্রেস এম এল এ-রা ৫৮টি সংশোধনী দিলেন। বিলটি গেল সিলেক্ট কমিটিতে। পরিণতিতে 'বর্গাদার বিল' বাতিল হয়ে গেল।

'বর্গাদার বিল' প্রকাশিত হবার পর তেভাগা আন্দোলন দ্রুত গতি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কৃষক সভার তখনকার হিসাব ছিল বাংলার ২৬টি জেলার মধ্যে ১৯টি জেলার ৬০ লক্ষ চাষী এই ঐতিহাসিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বর্তমানকালে প্রকাশিত রাজ্য সরকারের মহাফেজখানায় রক্ষিত ৬ এম ৩৮। ৪৭বি নম্বর নথিতে বাংলা সরকারের বোর্ড অফ রেভিনিউ-এর অতিরিক্ত সচিবের নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলীর উত্তরে প্রদেশের সকল মহকুমা শাসকদের গোপন চিঠিগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল অন্তত ২৪টি জেলায়—কোথাও কম, কোথাও বেশি।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে পাকিস্তান সৃষ্টি ও বাংলা ভাগের বিষয়টি সামনে রেখে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ একে অন্যের প্রতি ছিল সর্বাধিক আক্রমণাত্মক এবং আচরণ ছিল শত্রুতামূলক। কিন্তু তখনকার সংবাদ তথ্য ও ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে এই দুই পার্টির নেতারাই যুক্তভাবে সর্বত্র তেভাগা আন্দোলনের বিরোধিতায় নেমেছেন। কমিউনিস্টদের প্রতি একই ভাষায় আক্রমণ চালাতে এই দুই দলই ঐক্যবদ্ধ। দিনাজপুরের খাঁপুরে ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলি বর্ষণে এক দিনে ২২ জন কৃষক নর-নারী হত্যার পর তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ স্বয়ং উত্তরবঙ্গের কংগ্রেস নেতা অরুণ গুহ ও লাবণ্যপ্রভা দত্তকে সঙ্গে নিয়ে দিনাজপুরে গিয়েছিলেন। তেভাগা আন্দোলন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পর ১৯৪৭ সালের ১৫ এপ্রিল 'দিনাজপুরের শিক্ষা' শিরোনামে অরুণ গুহ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় তাঁর প্রবন্ধে বর্গাদার সম্বন্ধে আইন পাস না করায় প্রদেশের মুসলিম লিগ সরকারকে সমালোচনা করে একই প্রবন্ধে কমিউনিস্টদের তীব্র আক্রমণ করলেন এই বলে যে তারা "সস্তা ফললাভের জন্য ও জনপ্রিয়তা অর্জনে গরিব বর্গাদারদের উস্কানি দিচ্ছে।"

লিগের প্রচার ছিল, তেভাগার দাবি মুসলিম ঐক্যে ভাঙন ধরাচ্ছে এবং হিন্দুদের ক্ষমতা দখলে সাহায্য করছে। পাকিস্তানের দাবি আদায়

হলে বর্গাদার-আধিয়ারদের তেভাগার দাবি আদায় হবে। বাংলার কংগ্রেস দলের প্রচার ছিল, তেভাগা আন্দোলন মধ্যবিত্তদের সর্বনাশ এনে দিচ্ছে। তেভাগা আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেশের স্বাধীনতাকে বাধা দিচ্ছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইংরেজি সাপ্তাহিক 'পিউপিলস এজ' কাগজে কমিউনিস্ট নেতা পি সি যোশী এক প্রবন্ধে লিখেছেন : "কংগ্রেস চেষ্টা করছে লিগকে ধ্বংস করতে এবং লিগও চেষ্টা করছে কংগ্রেসকে শেষ করতে। আর এই উভয় রাজনৈতিক দলই চেষ্টা করছে আমাদের (কমিউনিস্টদের) শেষ করে দিতে।"

কংগ্রেস ও লিগ উভয় রাজনৈতিক দলের গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী ভিত্তি ছিল বড় জমির মালিক জোতদার-জমিদার। উভয় পার্টির ক্ষমতার উৎস ছিল গ্রামের সামন্তবাদী স্বার্থ। তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে গ্রামের সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থের সরাসরি সংঘাতে জোতদার ও কায়েমী স্বার্থ ছিল তেভাগা আন্দোলনের ঘোরবিরোধী। এদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বকারী কংগ্রেস বা লিগ তেভাগার দাবিকে মেনে নিতে পারেনি।—তাদের বিরোধিতাটা কোনও আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। তেভাগা আন্দোলনের আগেও নয়, পরেও নয়। কংগ্রেস বা লিগ তাদের শ্রেণী নীতি পরিত্যাগ করেনি। মহাত্মা গান্ধীজির পরামর্শ ও উপদেশের চেয়েও বড় ছিল এই শ্রেণী নীতি।

তেভাগার আন্দোলন সাময়িকভাবে দমন করা হয়েছিল। তেভাগা আন্দোলনের শিক্ষা ও তার পথ ধরে অনেক চড়াই-উৎরাই, সাফল্য-অসাফল্য ব্যর্থতা-শিক্ষা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলন অগ্রসর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা সঠিকভাবেই তার প্রস্তাবে বলেছে :

"পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কারের সাফল্য, বর্গাদারদের নিরাপত্তা, গ্রাম বাংলার পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার অগ্রগতি ও ছোট-বড় বিভিন্ন আন্দোলনে কৃষক জনগণের সর্বাপেক্ষা নিপীড়িত অংশের মধ্যে আজ যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তার পশ্চাৎভূমিতে তেভাগা আন্দোলনের অবদান অস্বীকার করা যাবে না। দিনাজপুরের শহিদদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়নি।"

বাংলার তেভাগা আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের বিকাশে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন বহুকাল তাকে স্মরণে রাখবে।

শিল্পী : চিত্তপ্রসাদ

তেভাগা আন্দোলনের সমকালীন অবিভক্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা

ভব রায়

ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনের ঠিক প্রাক্কালে সংঘটিত 'তেভাগা আন্দোলন' নানা অর্থে এক অসামান্য তাৎপর্যবাহী ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। অবিভক্ত বাংলাদেশের একটি অতিক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ তেভাগাকে নিছক একটি 'কৃষক আন্দোলন' রূপে অভিহিত করা যেমন অনৈতিহাসিক তেমনই সময়ের আক্ষরিক হিসাবমাফিক এই বিষয়টিকে মাত্র দুই-তিন বছরের ঘটনা হিসাবে দেখাও যথার্থ নয়। আর্থ-সামাজিক বিকাশের ইতিহাসসূত্রে আমরা জানি, যে কোনও বিপ্লবাত্মক বা বিদ্রোহমূলক গণ-আন্দোলনের উৎস বা বীজ উপ্ত থাকে দূর বা নাতিদূর অতীতের ঘটনা পরম্পরায় আবার আন্দোলন সমাপ্তির পরবর্তী পর্বে দীর্ঘকাল ধরে সেই আন্দোলনের প্রভাব প্রতিফলিত হয় সমাজের নানা স্তরে। একথাও আমাদের অজানা নয় যে, বিশেষ কোনও রাজ্যে বা সুবিস্তৃত প্রশাসনিক এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বা ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে আন্দোলনের তীব্র স্ফুরণ কেন্দ্রীভূত থাকলেও আন্দোলনের পশ্চাদপট হিসাবে বিভিন্ন ধরনের আর্থ-রাজনৈতিক কারণসমূহের কম-বেশি উপস্থিতি বা সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয় সমগ্র রাজ্য জুড়েই।

তাই, উপরোক্ত বিষয়টিকে মনে রেখেই আপাতত যে প্রসঙ্গটির উপর আমাদের কৌতূহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব, তা হল তেভাগা আন্দোলনের সমকালীন বা তার অব্যবহিত আনুপূর্বিক পর্বে কেমন ছিল অবিভক্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। প্রসঙ্গত, আমরা উন্মোচনের চেষ্টা করব সেই বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক সংকটের স্বরূপ, যার পরিণতিতে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তেভাগার বিস্ফোরণ।

তেভাগা-সম্পর্কিত যে সাধারণ তথ্যগুলি প্রায় সকলের জানা, সেগুলির দিকে এক নজরে তাকানো যেতে পারে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ঔপনিবেশিক অবস্থান থেকে স্বাধীন

ভারতে গোত্রান্তরের সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ ১৯৪৬-৪৭ সালেই ঘটেছিল এই আন্দোলনের অঙ্কুরোদ্‌গম ও বিস্তার। বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা, সুন্দরবন, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, মালদা ও বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা সহ অবিভক্ত বঙ্গদেশের উনিশটি জেলায় তেভাগা আন্দোলনের কম-বেশি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। আর 'তেভাগা'-এই শিরোনামের মধ্যেই এই আন্দোলনের প্রধান দাবি সরবে উচ্চারিত হয়েছিল বাংলাদেশের অগণিত কৃষকের কণ্ঠে, "উৎপন্ন ফসলের দু-ভাগের একভাগ জমি মালিকের পাওনা, আর বাকি অর্ধেক পাবে দরিদ্র বর্গাদার বা ভাগচাষী"—বিত্তবান জোতদার ও জমিদার শ্রেণীর একতরফা আরোপিত ও এতাবৎ প্রচলিত এই শর্তের বিরুদ্ধে সেদিন গর্জে উঠেছিল বাংলাদেশের কৃষক সমাজ। তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে দরিদ্র বর্গাদার কৃষক তথা সমগ্র কৃষক শ্রেণীর দাবি ছিল "লাঙল-গরু দিয়ে ঘাম ঝরানো শ্রমের বিনিময়ে এখন থেকে বর্গাদার চাষীকে জমির মালিকের তরফ থেকে দিতে হবে উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুইভাগ আগেকার প্রচলিত অর্ধেক ফসল ভাগাভাগি প্রথা বাতিল করতে হবে।"

অবিভক্ত বাংলাদেশের মাত্র কয়েকটি জেলায় তেভাগা আন্দোলনের তীব্র কেন্দ্রীভূত থাকলেও, একথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, সংশ্লিষ্ট এই কয়েকটি জেলার কৃষকদের অর্থনৈতিক সংকট বা সাধারণভাবে এই জেলাগুলির অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের সূত্রেই বুঝিবা জ্বলে উঠেছিল তেভাগা আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ। বরং, প্রকৃত ঘটনা হল—তেভাগা-আন্দোলন পূর্ববর্তী বাংলাদেশের ক্রমক্ষীয়মান ও সংকটাপন্ন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই সামগ্রিকভাবে তেভাগা-আন্দোলনের নেপথ্যে সতত ক্রিয়াশীল ছিল।

প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন, তেভাগা আন্দোলনের কারণস্বরূপ সামগ্রিকভাবে এক কথায় তদানীন্তন বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনীতির দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করলে বিশ্লেষণগত অতিসরলীকরণের বিভ্রান্তি অনিবার্য। তাই, সমাজমনস্ক দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লিখিত 'অর্থনৈতিক সংকটকে' চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে হলে অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয়ও বৈশিষ্ট্যের দিকেও সন্ধানী দৃষ্টিপাত একান্তভাবে প্রয়োজন।

তাহলে প্রশ্ন হল—তেভাগা-সম্পর্কিত বাংলাদেশব্যাপী সেই অর্থনৈতিক সংকটের বহুমুখী স্বরূপ ঠিক কি রকম ছিল? আর, তা কোন পর্যায়ে বা কতদূর প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল এই আন্দোলনকে? তেভাগার পশ্চাদপট হিসাবে 'অর্থনৈতিক সংকট'কে আমরা মোটামুটিভাবে কয়েকটি উপ-শিরোনামে ভাগ করতে পারি :-

(১) সাধারণভাবে ইংরেজ শাসনাধীন বঙ্গীয় অর্থনীতির দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা ও বিশেষভাবে রাজ্যের সিংহভাগ জনসাধারণ-অধ্যুষিত কৃষি-অর্থনীতির চরম সংকটাপন্ন অবস্থা।

(২) তেভাগা-প্রভাবিত জেলাগুলির দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরভিত্তিক অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনাজনিত বিষম (heterogeneous) অর্থনৈতিক সংকট।

পূর্বোক্ত প্রথম পর্যায়ভুক্ত অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের সময়ে তেভাগা-সম্পর্কিত উৎস অনুসন্ধান করতে হলে এই আন্দোলনের নির্দিষ্ট সময়সীমা থেকে পিছিয়ে যেতে হবে অন্তত অর্ধ-শতাব্দী। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিক থেকে দশকের পর দশক ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর মানুষসহ সমগ্র জনসাধারণ যে দুর্বিষহ অর্থনৈতিক অবস্থার মুখোমুখি হয়ে চলেছিল, দীর্ঘকালের সেই পুঞ্জীভূত শোষণ ও বঞ্চনাও যে তেভাগা বিস্ফোরণের অন্যতম কারণ ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

এখন দেখা যাক, আলোচ্য পঞ্চাশ বছর ধরে অবিভক্ত বাংলার অর্থনৈতিক চিত্রটি বা তার গতি-প্রকৃতি ঠিক কি রকম ছিল। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, তেভাগার প্রায় দেড়শো বছর আগে কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র সুবাদে প্রকৃত কৃষকের হাত থেকে জমির মালিকানা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং তা তুলে দেওয়া হয়েছিল পরজীবী জমিদার শ্রেণী ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে। বলা বাহুল্য, ঠিক সেই সময় থেকেই বাংলার কৃষকের জীবনে যে দুর্দশার সূত্রপাত হয়েছিল, তার নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা প্রায় অক্ষুন্ন ছিল তেভাগার সময়েও। তেভাগা আন্দোলনের পূর্ববর্তী দশকগুলিতে বাংলার কৃষক তথা কৃষি অর্থনীতি যে চরম থেকে চরমতর অবনতির সম্মুখীন হয়ে চলেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে প্রাসঙ্গিক তথ্য-পরিসংখ্যানে। বলা বাহুল্য, কৃষকদের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতির বর্শামুখ দেশের শ্রমিকশ্রেণী তথা প্রায় সমগ্র জনসাধারণকে অবিরাম আক্রমণে জর্জরিত করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বস্তুতপক্ষে বাংলার কৃষকের সামনে নেমে এসেছিল ত্রিমুখী আক্রমণ (১) জমিদারি শোষণ (২) মহাজনী শোষণ ও (৩) সরকারি শোষণ। বছরের পর বছর বেড়ে চলেছিল কৃষকের জমির ওপর খাজনা, চক্রবৃদ্ধি সুদ সহ ঋণের বোঝা এবং সরকারি ট্যাক্সের পরিমাণ, যার দায় সর্বতোভাবেই বহন করতে হত দুর্দশাক্লিষ্ট কৃষককে। আবার, অন্যদিকে, জমির ওপর বেড়ে চলেছিল কৃষিনির্ভর মানুষের সংখ্যা ও ক্রমবর্ধমান ছদ্মবেকার (Disguised unemployment)-এর চাপ। আর ক্রমশই কমছিল বিঘাপিছু জমির গড় উৎপাদন।

এই সময়সীমায় আনুপাতিক জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে বহুলাংশে অতিক্রম করে সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল কৃষিনির্ভর মানুষের সংখ্যা। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ১৯২০-র দশক পর্যন্ত কৃষিজীবী মানুষের বৃদ্ধির হার ছিল ৪০ শতাংশ সামগ্রিক হিসাবে ২.৬০ কোটি থেকে প্রায় ৪ কোটিতে উঠেছিল এই সংখ্যা। আর একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ছোটখাটো কৃষক-মালিক ও বর্গাদারদের সম্মিলিত সংখ্যা ১৯২১ সালে ছিল ৯৩ লক্ষের কাছাকাছি, ১৯৩১ সালে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে এই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছিল ৬১ লক্ষে। আর ১৯২১ সালে ভূমিহীন খেতমজুরদের সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষের কাছাকাছি, ১৯৩১ সালে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল প্রায় ২৭.৫ লক্ষ। এই পরিসংখ্যানগুলি থেকে সহজেই অনুমেয় অর্থনৈতিক অবনতির কারণে ছোটখাটো চাষী মালিক ও বর্গাদারদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ভূমিহীন খেত-মজুরদের স্তরে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ খেত মজুরদের সামগ্রিক সংখ্যায় ঘটেছিল উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। বলা বাহুল্য, ১৯৩১-পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ তেভাগার সময়ে

অর্থাৎ তেভাগার সময় পর্যন্ত বাংলার কৃষকের এই 'জমি হারানোর' ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন ছিল।

অর্থনীতির তত্ত্বের সুবাদে আমরা জানি, কোনও বিশেষ রাজ্য বা এলাকার জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি-অবনতি পরিমাণের যে সূচকগুলি সচরাচর প্রচলিত, তার মধ্যে কয়েকটি হল—জীবন ধারণের মান (standard of living), প্রকৃত আয় (Real Income) ও ঋণগ্রস্ততা (Indebtness)। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অবিভক্ত বাংলাদেশের কৃষকের জীবনে এই অর্থনৈতিক সূচকগুলির প্রতিফলন কিভাবে ঘটেছিল, তা দেখেও তাদের অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব। ১৯১০-এর দশক থেকে ১৯৪০-এর দশক পর্যন্ত যেখানে খেতমজুর ও কৃষিনির্ভর শ্রমজীবী মানুষদের মজুরির হার বেড়েছে ১০০ শতাংশ, সেখানে চাল-ডাল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে ২০০ শতাংশ বা তারও বেশি। এর অর্থ হল—এই সময়সীমায় কৃষকের প্রকৃত আয় কমেছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। আর, Central Banking Enquiry Committee (1931)' ও Survey of Rural Indebtness (1955-56)-এর পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে জানা যায়, তেভাগার সমকালীন ও তার পূর্ববর্তী দশকগুলিতে বাংলাদেশের কৃষকশ্রেণীর ওপর প্রতি পাঁচ বছরে, বহুমুখী ঋণের বোঝা বেড়ে চলেছিল ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ হারে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে উৎপাদন উত্তরোত্তর বেড়ে চলে-এটাই হচ্ছে নিয়ম। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশের কৃষিতে, বিংশ শতাব্দীর দশকগুলিতে এই স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত প্রবণতাই দেখা গিয়েছিল। এই পর্বে ত্রিশ বছরের একটি সময় সীমায় একর প্রতি কৃষি উৎপাদন কমেছে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। তৎকালীন 'India Today' নামক তথ্য সূত্রেও এর প্রমাণ লিখিত রয়েছে এই ভাষায়, "সার-চাপানের নিতান্ত অপ্রতুল প্রয়োগের ফলে জমির উর্বরতা ক্রমশই কমছে। নানা ধরনের শস্যের উৎপাদন ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে।"

এইসব আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় বছরের পর বছর, দশকের পর দশক এক চরম হতাশাব্যঞ্জক ও নেতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের কৃষি-অর্থনীতি, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ বাংলার কৃষকের জীবনে নেমে এসেছিল ক্রমবর্ধমান শোষণ এ বঞ্চনার অসহনীয় বোঝা। আর এই সূত্রেই 'মরার আগে মরণকামড়' বসাবার শপথ নিয়ে তাদের পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও প্রতিবাদ অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে স্ফুরিত হয়ে উঠতে চেয়েছিল তেভাগা আন্দোলনের মাধ্যমে।

(২)

অবিভক্ত বাংলাদেশের তৎকালীন দুর্দশাক্লিষ্ট অর্থনৈতিক পটভূমিতে তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে অতি গুরুত্বপূর্ণ অথচ পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত একটি প্রধান 'কার্য-কারণ' বৈশিষ্ট্য সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে এবং তা হল 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' (বাংলা ১৩৫০ সন)' নামে চিহ্নিত ১৯৪৩ সালের অবিভক্ত বাংলাদেশের ভয়াল দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশনের ভারপ্রাপ্ত বৃটিশ প্রশাসক জন উডহেড-এর সরকারি তরফের ও কালতিপুষ্ট প্রতিবেদনেও এই দুর্ভিক্ষের নির্মমরূপ ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি, এই দুর্ভিক্ষের কারণ ও তার বাস্তব রূপের নিরপেক্ষ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রতিচ্ছবিও ফুটে ওঠে আমাদের চোখের সামনে। জন উডহেড তাঁর অনুসন্ধানী বিবরণে মন্তব্য করেছেন এই ভাষায়, "১৯৪৩-এর গোড়ার মাসগুলিতে জেলা শাসকেরা দুর্ভিক্ষ আসন্ন মনে করেন।......জুলাই মাস থেকে সমস্ত গ্রামবাংলা দুর্ভিক্ষের প্রকোপে পড়ে এবং মৃত্যুর হার স্বাভাবিকের সীমা ছাড়িয়ে যায়।...যদিও স্থানীয় খাদ্যাভাব সর্বত্র সমান ছিল না, প্রদেশের প্রায় সর্বত্রই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে চালের দাম গরিব মানুষের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় এমন কোথাও ছিল না যেখানে তারা অন্নাভাব থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল।......১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগে চালের দাম যখন বাড়তে থাকে, যথেষ্ট শস্য মজুত যাদের ছিল না সেসব গরিব মানুষেরা খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে অপারগ হয়ে পড়ে। কিছুদিন সামান্য যা জমানো ছিল তাই খাওয়া, অথবা তাদের যৎসামান্য সম্পদ বিক্রি করে ক্রমবর্ধমান দামে চাল কেনা, তারপর অনশন।......'

সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ তথ্যাবলী থেকে এই দুর্ভিক্ষের সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে যেমন স্পষ্টতর ধারণা পাওয়া গেছে, তেমনই তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ও বৃটিশ সরকারের অনুসৃত চরম শোষণ মূলক সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশলের স্বরূপ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য উন্মোচিত হয়েছে। সাধারণভাবে, এই ধারণাই প্রচলিত আছে, চরম খরা এ অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে অস্বাভাবিক কম পরিমাণে ফসল উৎপাদন ও বাজারে খাদ্যশস্যের জোগানে টান পড়ার জন্য অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল ১৯৪২-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষ। কিন্তু, এই ধারণা যে বহুলাংশেই ভ্রান্ত, তা অর্থনৈতিক গবেষকদের সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন লিখেছেন, "১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের মহামন্বন্তরে বাংলার প্রায় তিরিশ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। তখন দেশের জনগণের জন্য মাথাপিছু যে পরিমাণ খাদ্যের যোগান ছিল তা এমন কিছু কম নয়। সত্যি বলতে কি, সেই মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ ছিল ১৯৪১ সালের তুলনায় ৯ শতাংশ বেশি। কিন্তু, ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে কোন দুর্ভিক্ষ হয় নি। ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক আর মৎস্যচাষীদের মতো মানুষেরাই হয়েছিল দুর্ভিক্ষের শিকার। বাজারে এদের ক্রয়ক্ষমতা ভয়ানক কমে যায়। যুদ্ধকালীন সমৃদ্ধি-স্ফীত সেই অর্থনীতিতে তখন চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতির চাপ, খাদ্যমূল্য ক্রমবর্ধমান, নিজেদের মজুরি বা আর্থিক আয়কে সম্বল করে এই পরিস্থিতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না তারাই মরল।..."

অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের এই সারগর্ভ ও প্রাঞ্জল বিশ্লেষণের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই তেভাগার প্রাক-কালীন বাংলাদেশের অর্থনীতির এক নিখুঁত চিত্রায়ন, ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের কারণ অনুসন্ধানের সূত্রে অমর্ত্য সেন তাঁর নতুন চিন্তার আলোকে উপস্থাপিত করেছিলেন 'পরিদান অধিকার' (exchange entitlement) সূত্র। 'পরিদান অধিকার' বলতে অধ্যাপক সেন যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, তার সারমর্ম হল—সেই ক্ষমতা যার দ্বারা লোকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে সমাজের আইনানুগ পথে, যথা উৎপাদন করার ক্ষমতা, লেনদেন ব্যবস্থা, সরকারের নিকট সাব্যস্ত দাবি, এবং অন্যান্যভাবে খাদ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া।

এক অর্থে, তৎকালীন বাংলার অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই 'পরিদান অধিকার'-এর ব্যাপক ওলট-পালট ঘটে যাওয়ার কারণেও অনিবার্য

হয়ে উঠেছিল ১৯৪২-৪৪-এর মহামন্বন্তর। এবং এই ঘটনার নেপথ্যে অনিবার্য উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের চূড়ান্ত অমানবিক অর্থনৈতিক কৌশল, দেশীয় জমিদার মহাজন ও জোতদারদের আগ্রাসী শোষণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রে সদ্যোজাত কালোবাজার, ফাটকাবাজি ও মজুতদারির অশুভ চক্র। যুদ্ধকালীন ব্যয় মেটাবার জন্য অত্যন্ত অনৈতিকভাবে ব্রিটিশ সরকার অস্বাভাবিক বর্ধিত পরিমাণে ফাঁপা নোট ছাপা শুরু করেছিল। ফলে আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছিল মুদ্রাস্ফীতি। এক শ্রেণীর মানুষের হাতে প্রচুর টাকা আসতে শুরু করেছিল, এর ফলে একদিকে যেমন বেড়েছিল তাদের অস্বাভাবিক ক্রয়ক্ষমতা, অন্যদিকে পণ্য বাজারে বিশেষ করে চালের বাজারে তারা শুরু করেছিল ফাটকাবাজি ও কালোবাজারি, এইভাবে তারা তৈরি করেছিল চালের কৃত্রিম অভাব। এসবের সামগ্রিক ফলস্বরূপ বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লাভ বাড়ল অপ্রত্যাশিত হারে শ্রমজীবী মানুষের আয় বিশেষ করে কৃষিমজুরের বেতন বাড়ল না, চালের দাম হু হু করে বাড়ার ফলে ছোট চাষী ও কৃষি মজুরের ক্রয়ক্ষমতার আয়ত্তের বাইরে চলে গেল, রেশন ব্যবস্থার সুবাদে শহরের সাধারণ মানুষ কোনরকমে সামলে নিল। তাই, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম এই দুর্ভিক্ষের পটভূমিটি এক অর্থে ছিল মনুষ্যসৃষ্ট এবং এর ফলে যে নগ্নতম শোষণ ও বঞ্চনার শিকারে পর্যবসিত হয়েছিল সারা বাংলার দরিদ্র কৃষিজীবী মানুষ, তার সার্থক প্রতিফলন আমরা শুনেছি কিশোর কবি সুকান্তের উচ্চারণে, "শোনরে মালিক/শোনরে মজুতদার/তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়/হিসাব কি দিবি তার?"

তাই, পঞ্চাশের মন্বন্তরের অব্যবহিত পরেই কেন শোনা গিয়েছিল তেভাগার পদধ্বনি, তা অনুমান করে নিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। পঞ্চাশের মন্বন্তরের দুঃস্বপ্ন তেভাগায় আন্দোলিত কৃষককে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও মরিয়া করে তুলেছিল। সে কারণেই, আর্থ-সামাজিক চালিকাশক্তির অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে দুর্ভিক্ষকালীন বঙ্গীয় অর্থনীতির শ্মশানভূমিতেই সঙ্গত কারণে মাথাচাড়া দিয়েছিল শোষিত কৃষিজীবী মানুষের বিদ্রোহের অঙ্কুর।

(৩)

এবার পূর্বোল্লেখিত দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত অর্থনৈতিক অবস্থা অর্থাৎ তেভাগা-প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে অর্থনৈতিক চিত্রটির দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। এই আন্দোলনের সমকালে অবিভক্ত বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতোই তেভাগা-প্রভাবিত উনিশটি জেলাতেও কৃষিনির্ভর মানুষদের মধ্যে ভূমি মালিকানার নিরিখে কয়েকটি স্তর-বিভাজন ছিল। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বিচারে কৃষকরা মোটামুটি এই পাঁচটি স্তরে বিভক্ত ছিল।—(১) ভূমিহীন কৃষিমজুর (গ্রামীণ মানুষদের ৩২ শতাংশ) (২) দুই একরের কম মালিকানার অতিদরিদ্র কৃষক পরিবার (৪০ শতাংশ) (৩) দুই একর থেকে পাঁচ একর জমির মালিক দরিদ্র কৃষক (২৯ শতাংশ) (৪) পাঁচ থেকে দশ একর মালিকানার মধ্য কৃষক (৬ শতাংশ) (৫) দশ একরের ঊর্ধ্বসীমার জমির মালিক-ধনী কৃষক (৩ শতাংশ)।

বলা বাহুল্য, পাঁচটি বিভিন্ন স্তরে কৃষকশ্রেণী বিভক্ত থাকলেও প্রথম তিন স্তরভুক্ত কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীস্বার্থের অভিন্নতা ও সাযুজ্যই ছিল মুখ্য প্রবণতা, যদিও তাদের মধ্যে পারস্পরিক কিছু দ্বন্দ্বের উপাদানও সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিল। আবার, তেভাগা-প্রভাবিত উনিশটি জেলায় প্রায় ২৫ শতাংশ জমি ভাগে দেওয়া হত, আর এই ভাগচাষীদের ৯০ শতাংশ ছিল হতদরিদ্র, অর্ধাহার-অনাহার ও তাদের জীবন ধারণের মান ছিল প্রায় সমার্থক। তেভাগার দাবি সরাসরি ভূমিহীন খেতমজুরদের সরাসরি স্বার্থবাহী না হলেও ভাগচাষীদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে তারাও আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। এইভাবে দুই শ্রেণীর মিলিত সংখ্যা ছিল মোট গ্রামীণ মানুষের ৭২ শতাংশ, যারা একযোগে ঘোষণা করেছিল, 'জান দেবো, তবু ধান দেব না।' এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কৃষকনেতা আবদুল্লা রসুলের এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য, "এই আন্দোলন কেবল বর্গাদার চালায়নি, ব্যাপকভাবে খেতমজুরেরাও তাতে যোগদান করেছিল, শহিদ সমিরুদ্দীন ও চিয়ার সাই ছিল খেতমজুর। কিন্তু বর্গাদাররা তাদের সাহায্যে তেভাগা আদায় করলেও তারা কিছুই পায়নি, বর্গাদাররা ফসলের অর্ধেকের চেয়ে যতটা বেশি পেয়েছিল তার থেকে কিছু অংশ আদায় করে ক্ষেতমজুরদের দেবার জন্য কোনও সাংগঠনিক ব্যবস্থা করা হয়নি। কৃষক সভার নেতৃত্বের দিক থেকে এই ত্রুটীর জন্য অনেক খেতমজুরের একটা ন্যায়সংগত অভিযোগ থেকে গিয়েছিল।"

তেভাগা-পূর্ববর্তী দীর্ঘকাল ধরে বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে তেভাগার অনুরূপ শোষণ ও বঞ্চনা ছিল বৃহত্তর কৃষকসমাজের নিত্যসঙ্গী, তা সত্ত্বেও সেই আমলে তেমনভাবে তাদের সংগঠিত ও সক্রিয় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। কিন্তু, একমাত্র রাজনৈতিক গণসংগঠনই সুনির্দিষ্টভাবে মানুষের যথার্থ ক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দিতে পারে, তার প্রমাণ তেভাগা আন্দোলন। ১৯৪৬-৪৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা তেভাগা আন্দোলন পরিচালনা করে। তেভাগার দাবিতে কৃষক সভা যে মূল অর্থনৈতিক দাবিগুলি উত্থাপন করে, সেগুলি হল ঃ—

(১) উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের দুই ভাগ, (২) ভাগচাষীর দখলীস্বত্ব, (৩) মণপিছু ধানে অনধিক পাঁচ সের সুদ (৪) রসিদ ব্যতিরেকে ভাগ দেওয়া হবে না, (৫) আবাদযোগ্য পতিত জমিতে ফসল ফলাতে হবে, (৬) জমির মালিকের পরিবর্তে ভাগচাষী বা বর্গাদারের খামারে ধান তুলতে হবে।

তেভাগা-সম্পর্কিত এইসব গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার তাৎপর্য তৎকালীন বাংলার সামগ্রিক কৃষি অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। শুধু তাই নয়, তেভাগার অর্থনৈতিক দাবি অবিভক্ত বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর, দরিদ্রতম কৃষককেও দীক্ষিত করেছিল রাজনৈতিক চেতনার আবেগে। এর প্রমাণ আমরা পাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখা তেভাগার উপাদান সম্বলিত 'খোয়াবনামা' শীর্ষক উপন্যাসে। এই উপন্যাসের কৃষক শিল্পী কেরামত 'তেভাগা' নিয়ে গান বাঁধে, লোকায়ত আঙ্গিকে সেই গান গেয়ে বেড়ায় হাটে মাঠে জনসভায়—

"যাহার হাতে লাঙল। যাহার হাতে নাঙল, ফলায় ফসল, অন্ন নাই তার পাতে।

জমির পর্চা লইয়া জোতদার থাকে দুধেভাতে ৷৷ রক্ত করিপানির অক্ত করি পানি মাটি ছানি ভাদ্রে রোপাই ধান। চার মাসের মেন্নতে দেহে নাহি থাকে পরাণ। পৌষে ধান কাটি পৌষে ধান কাটি, বাটাবাটি করিল জোতদার। ভাগে পাইলাম আদা ফসল চলে না সংসার। চাষার

মেন্নতের দাম, চাষার মেন্নতের দাম খালি আকাম জোতদারেরই কাছে। দুই মাসে গেলে চাষা ঘোরে মহাজনের পাছে ॥ জোতদার মহাজনে জোওতদার মহাজনে মনে মনে উহাদের পিরীত। চাষার মুখের গেরাস খাওয়া দুজনেরই রীত ॥

চাষার দুষমন জমিদার জোতদার অতিলেহা কথা ॥ বলি জমিদারি অলি জমিদারি উচ্ছেদ করি এমন আইন চাই। জোতদার পাবে একভাগ ফসল চাষায় দুইভাগ পাই ॥ তাই তেভাগার ডাক তাই তেভাগার ডাক দাও জোরে হাঁক বলো চাষার জয়। চাষা বিনা জগত মিছা সবজনে কয়।......" অসাধারণ বাস্তবধর্মী এই উপন্যাসের লোকায়ত কথকতায় নিখুঁত প্রামাণিক গুণসমৃদ্ধ হয়ে ফুটে উঠেছে তেভাগার সমকালীন শোষিত কৃষকের বেদনা ও সংগ্রামী চেতনা, নগ্ন সামন্ততান্ত্রিকতার স্বরূপ, এক কথায় এই আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত অথচ আদ্যোপান্ত ইতিবৃত্ত।

এইভাবে, আমরা দেখতে পাই, তেভাগা আন্দোলনের সমকালীন অর্থনৈতিক পটভূমিটি একদিকে যেমন ছিল অসাধারণ গুরুত্ববাহী। আবার অন্যদিকে তেমনই এই আন্দোলন পরবর্তী কালের কৃষি অর্থনীতিতে ফেলেছিল সুদূরপ্রসারী প্রভাব। একথা ঠিক, তেভাগা আন্দোলনের স্থায়িত্ব খুব বেশি দিন ছিল না। তবুও, প্রশাসনিক অত্যাচার-নিপীড়ন মোকাবিলা করেও এই আন্দোলন যে অনেকটাই অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছিল, সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। আবার, এও ঠিক, আন্দোলনের দাবি আদায়ের ক্ষেত্রেও সিংহভাগ সাফল্য অর্জিত হয়নি। কিন্তু, তেভাগার কৃষকদের অর্থনৈতিক দাবি ও বিক্ষোভের কতা মনে রেখেই স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রাদেশিক সরকারকে জমিদারি-উচ্ছেদসহ বিভিন্ন কৃষি-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা শুরু করেছিল। পাশাপাশি, কৃষির সংস্কারও অন্যান্য গ্রামীণ অর্থনৈতিক দাবিকে সামনে রেখে বাংলার কৃষক রাজনৈতিকভাবে উত্তরোত্তর বর্ধিত সংখ্যায় সংগঠিত হতে শুরু করেছিল তেভাগার প্রেরণায়। তাই, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তেভাগা আন্দোলন নানা ব্যঞ্জনায়, নানা তাৎপর্যে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে।

এদিকে নদীর বান
ওদিকে নদীর বান
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সব একাকার।
গাঁয়ে যত বৌ ছিল——ঢেউ
গাঁয়ে যত বুড়ি ছিল——ঢেউ
ছেলে বুড়ো বাকি নেই কেউ
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সব একাকার।
সারারাত গানের জোয়ার
সারারাত প্রাণের জোয়ার।
জন্মদুঃখী কৃষকের দুটি হাতে দোতারার তার
ঢেউ তোলে অস্থির কান্নার
পঞ্জরাস্থি ছিঁড়ে ফেলে
কবিয়াল গায় কবিগান।
দুর্জয় বক্তৃতা শোনে
আবালবনিতাবৃদ্ধ
মধ্যবিত্ত মজুর কিষাণ।

—পূর্ণেন্দু পত্রী

তেভাগার লড়াই আর চলচ্চিত্র

পার্থ রাহা

সে এক সময় ছিল যখন বাংলার উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম কাঁপিয়ে একই শ্লোগান উঠেছিল, চাষী ভাইসব, নিজ খলিয়ানে ধান উঠাও। বাংলার কৃষকেরা ফসলের তিনভাগের ন্যায্য দাবিতে হাতে বল্লম-লাঠি তুলেছিল। 'জান কবুল আর মান কবুল, রক্তে বোনা ধান, নিজেদের গোলায় তুলবো।' এই ধ্বনি সেদিন আজকের এই ভগ্ন খণ্ড পশ্চিমবাংলার নয়, যখন আমাদের মা-মাটি বুক চিরে দুই খণ্ড করা হয়নি, সেই এক বাংলার ধ্বনি। ১৯৪৬ সালের নভেম্বরে জলপাইগুড়ি থেকে কাকদ্বীপ, মেদিনীপুর থেকে রংপুর বাংলার গ্রামে-গ্রামে, গ্রামে-গঞ্জে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল।

১৯৪৬। সংগ্রাম আর লড়াইয়ের বছর। স্বাধীনতার আন্দোলন আর নিয়মতান্ত্রিক গোলটেবিল বৈঠক আর ব্যক্তিগত সন্ত্রাসে বাঁধা পড়ে নেই। সাধারণ মানুষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ে আর বার্লিনের রাইখস্ট্যাগে উড্ডীন সোভিয়েত লাল পতাকার দিকে তাকিয়ে বুক বাঁধে আশায় আশায়। পরাধীনতার শেকল ছেঁড়ার আশায়, জানুয়ারি মাসে বোম্বাইয়ে বিমানবাহিনী ধর্মঘট করে। আর ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয় ঐতিহাসিক নৌ বিদ্রোহ। এরপর একের পর এক রক্ত-ঝরানো লড়াই। ধর্মঘট-হরতাল আর পথে পথে মানুষের প্রতিরোধ। রসিদ আলি দিবস, আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির দাবিতে লড়াই, নৌবিদ্রোহের সমর্থনে হরতাল ধর্মঘট, বিদ্রোহ---সেদিন বিদ্রোহ চারিদিকে। পাশাপাশি ময়াল সাপের মতন চক্রান্ত। ভাইয়ের বুকে ভাইয়ের ছুরি, ধর্ম নিয়ে দাঙ্গা, নোয়াখালি, মজঃফরপুর বা রাজাবাজারে। কিন্তু দাঙ্গা নয়, সাম্প্রদায়িকতার বিষ নিঃশ্বাস নয়, চারিদিকের বিদ্রোহের বাতাবরণে গড়ে উঠেছিল তেভাগার কৃষক বিদ্রোহ। এই বাংলায়, তেলেঙ্গানায়, কেরালায়, ১৯৪৬-এ, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে।

১৯৩৬-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার জন্মলগ্ন থেকেই আধিয়ারের দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৩৯ সালে ভূমি রাজস্ব কমিশনের কাছে কৃষকসভা যে দাবি সনদ পেশ করে তাতে ভাগচাষীর অধিকার দাবি করা হয়। আর সেই সময় থেকেই দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি জেলায় আধিয়ার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সংগঠিত রূপ পায় ১৯৪৬-এর নভেম্বরে। চব্বিশটি জেলায় এই আন্দোলন জ্বলে ওঠে। রংপুর, জলপাইগুড়ি, খুলনা, ময়মনসিংহ, ২৪ পরগনা আর মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে হিন্দু-মুসলমান কৃষকেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল। জমিদারের গুণ্ডাবাহিনী আর পুলিশের গুলি-বেয়নেটের বিরুদ্ধে। মনে রাখা প্রয়োজন, তার মাত্র তিন-চারমাস আগেই বাংলা প্রত্যক্ষ করেছে ইতিহাসের কলঙ্কতম ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। কিন্তু শ্রেণী শোষণের লড়াই ধর্মের জিগিরকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

সেদিন বঙ্গীয় কৃষকসভা তেভাগার লড়াইয়ের উপর একটি দলিল প্রকাশ করেছিলেন। লিখেছিলেন কৃষক নেতা প্রখ্যাত আইনজীবী কৃষ্ণবিনোদ রায়। সেদিনের বাজেয়াপ্ত সেই দলিল আজ এক ঐতিহাসিক লড়াইয়ের সাক্ষ্যপ্রমাণ। তেভাগার লড়াই থেকে জানতে পারি বাংলার কৃষকের অধিকাংশ আধিয়ার। ধার-করা ধানের সুদ ছিল ১০০ ভাগ থেকে ৩০০ ভাগ। ফলে বাংলার কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল, জমিদারি আইনের জোরে মুষ্টিমেয় কয়েকজন জমির মালিক হয়ে যান। কৃষকের আর বাংলার কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্যই কৃষকসভা সেদিন দাবি তোলে উৎপন্ন চাষের তিন ভাগের দুই ভাগ চাষী পাবে, ভাগচাষীকে বর্গা থেকে উৎখাত করা চলবে না: ওই জমিতে দখলিস্বত্ব দিতে হবে।

এই ছিল তেভাগার লড়াইয়ের মূল স্লোগান। জানি, সেদিন কৃষকের সেই দাবি পরাজিত হয়েছিল। কৃষকের লড়াই কিন্তু চিরকালের মতো ছাপ ফেলেছিল বাংলার মাটিতে। আজও কংসারি হালদার বা অহল্যা মায়েরা বাংলার ইতিহাসের নায়ক-নায়িকা। এতদিনের দীর্ঘ আয়ু আমাদের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের। তবু সারা রাজ্য জুড়ে এমন লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত খুব বেশি আমাদের হাতের তালুতে নেই। তেভাগার লড়াই তাই আমাদের গর্ব। যদিও তেভাগার দাবির সত্যিকারের রূপ দেবার জন্য আমাদের আপস করতে হয়েছে বহুদিন। অপেক্ষা করতে হয়েছে সাতাত্তরের বামফ্রন্ট সরকারের শাসনভার নেওয়া পর্যন্ত। তবু তেভাগারই প্রত্যক্ষফল ভূমি সংস্কারের আন্দোলন, অপারেশন বর্গার আন্দোলন।

তেভাগার আন্দোলনের চুল-চেরা বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের দায় নয়। সংকলনে এ বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ-স্থান পেয়েছে। তেভাগার প্রভাব শুধু ভূমি সংস্কারের আন্দোলনেই নয়: আমাদের সৃষ্টিতে, চিন্তায়-মননে যে নিবিড় গভীর প্রভাব ফেলেছিল তারই রূপরেখা দেবার চেষ্টা করছি বিশেষত আমাদের চলচ্চিত্রে তেভাগা আন্দোলনের প্রভাব।

ত্রিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে ন্যুট হ্যামসুন, দস্তয়েভস্কির কল্লোলিত পদচারণা, রবীন্দ্রনাথ এলিয়টকে বাংলায় নিয়ে এলেন। নাটকে দেশপ্রেম উদ্বেলিত। স্বাধীনতা আন্দোলনও স্থান পেয়েছে সাহিত্যে। কলকাতাও কিন্তু শান্ত বাবু-বিবিবিলাসের কলকাতা নয়। বিদ্রোহের কলকাতা, বীর্যবান কলকাতা। বাংলার চলচ্চিত্রে কিন্তু তার কোনও ছাপ দেখতে পাই না। যে ভবঘুরে মানুষটি অন্যায় আর ধনলিপ্সার হা-হা ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, মানবতার প্রতিনিধি সেই চ্যাপলিন আমাদের শহরে খুবই জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন। সেদিনের গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা কথায় কথায় কাননবালা, বড়ুয়াসাহেবের ছবির সঙ্গে সঙ্গে চ্যাপলিন দেখতে ছুটতেন। কিন্তু তাঁর প্রভাবে জামাইষষ্ঠী দ্রুতগতির ভাঁড়ামির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তিন দশকের মধ্যে হীরালাল সেনের 'পার্টিশান অব বেঙ্গল' বা অরোরার নেতাজির কংগ্রেস ত্যাগের পরের বক্তৃতা ছাড়া রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ কোনও ছায়াছবি আমাদের হাতের তালুতে নেই।

বাংলার গ্রামের জীবনও কিন্তু সেদিন সোনার তবকে সাজানো, জমিদারি শোষণ আর নির্মম অত্যাচারের ছবি যে কখনও ছবিতে দেখা দিত না এমনটি নয়। কিন্তু সে ছিল 'খারাপ' জমিদারের কাণ্ড, কিংবা ভালো জমিদারের 'ভিলেন' নায়েবদের কুকীর্তি, আর গরিব কৃষক শুধু ভাগ্যের দোষ দিয়ে গেছে, গত জন্মের কর্মফলের জন্য শুধু কপালে করাঘাত করেছে। বাংলার কৃষক রমণীর দারিদ্র্য ছবিতে আসেনি, তারা শুধু সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে শাঁখে ধ্বনি তুলেছে। স্বামীর পায়ে-ধোয়া জল খেয়েছে। পতিদেবতার শত অত্যাচারকে পরমগুরুর আশীর্বাদ বলে মাথা পেতে নিয়েছে। বড়জোর ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রতিমার সামনে কান্নাকাটি করেছে। কিন্তু যে সমাজব্যবস্থা কৃষকের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী সেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, বা সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে, শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষমাশূন্য ঘৃণা ছুঁড়ে দেবার আহ্বান আমরা পাই না কোনও ছবিতেই। হিন্দু-মুসলিম দরিদ্র কৃষকের একসঙ্গে দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপনের ছবিও নেই সেদিনের চলচ্চিত্রে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে, সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদের ছবির উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না তিরিশের দশকে। অথচ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত কমবেশি আড়াইশো বায়োস্কোপ তৈরি হয়েছে। পরিচালক, তারকা, নায়ক-গায়কেরা, সরকার মশাইরা গাড়িজুড়ি চেপেছেন। কিন্তু জীবনের ছায়াছবি 'নতুন থিয়েটারের' হাতির শুঁড় কোনদিন দেখতে পায়নি। বাংলার জীবনে মন্বন্তর এসেছে, কলকাতার রাজপথ নিরন্ন মানুষের 'ফ্যান দাও ফ্যান দাও' আর্তনাদে আকুল হয়েছে। তারাশংকর থেকে বিভূতিভূষণ চোখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি। কিন্তু হায় সেদিন দর্শক-উপচানো আজকের ভাষায় সুপার সুপারহিট ছবি 'রজতজয়ন্তী' এক অকিঞ্চিৎকর উদ্দেশ্যহীন হাসির ছবি। দর্শকেরা হাসতে হাসতে হল থেকে বেরিয়েই শুনেছেন 'ফ্যান দাও' আর্তনাদ। এই স্ববিরোধিতা বুদ্ধিজীবীসংকুল নাগরিক মধ্যবিত্তদের মনে কোনও রেখাপাত করেনি।

কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনে হয়, সেদিনের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা কোনভাবেই শিল্পমাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রকে মনে করেননি। নব্য ইংরেজি-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, স্বদেশি কংগ্রেসি আদর্শে দীক্ষিত বুদ্ধিজীবী, ধার্মিক বা নাস্তিক বুদ্ধিজীবী, ইংরেজ অনুগৃহীত নতুন মুৎসুদ্দি বুদ্ধিজীবী কোনভাবেই সেদিন আমোদ-মাধ্যম বা

আনন্দ দেবার 'বাগবাজারি মৌতাতের' বেশি ভাবতে পারেননি। প্রথম বাঁক এল গণনাট্য আন্দোলনের জোয়ারে উদ্দীপিত তরুণদের মধ্য থেকে।

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন হল ১৯৪৩-এর পয়লা জুন আর ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম সম্মেলন হয় সেই বছরেই কয়েকদিন আগে পঁচিশে মে। পাশাপাশি ১৯৩৬-এর কৃষকসভার আধিয়ারের দাবির আন্দোলন চলেছে বাংলার গ্রামে গ্রামে। গণনাট্যের কর্মীরা গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে বাংলার কৃষক আন্দোলনকে শহর কলকাতার মানুষের সামনে তুলে ধরলেন। শহরের তরুণরা তখন আকুল আগ্রহে লক্ষ করছে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের মরণপণ লড়াই। অন্যদিকে কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের দোদুল্যমানতা বাংলার বুদ্ধিজীবীদের প্রথাগত দলগুলি সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটিয়েছিল, ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে সেদিন তারা সমবেত হয়েছিলেন, এমনকী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসুরাও। মন্বন্তরের অভিজ্ঞতা, বুর্জোয়া মানবতাবাদের তীব্র আকর্ষণে তাঁরা এসেছিলেন গণনাট্যসংঘের বিশাল তাঁবুতে।

ইতিমধ্যে 'উদয়ের পথে' সিনেমা হাউসে নতুন জোয়ার আনল। ছবির পরিচালক বিমল রায়। এখনও অপরিচিত, নায়ক-নায়িকা—ম্যাটিনি আইডলরা নয়। ছবির কাহিনী-কাঠামো বহু চর্চিত—ধনী নায়িকা আর গরিব নায়ক কিন্তু বাংলা ছবিতে এই প্রথম মালিকের শোষণ, শ্রমিকের প্রতিবাদ এমনকী কার্ল মার্কসের ছবি পর্যন্ত স্থান পেল। আজ হয়ত আমাদের ছবির সাজানো সংলাপ, লোক-দেখানো ইনটেলেকচুয়ালিজ্‌ম অসহ্য মনে হতে পারে। কিন্তু 'উদয়ের পথে' বাংলার সিনেমার নতুন পথ খুলে দিল। না বাংলা সিনেমার শুধু নয় ভারতের সিনেমার।

'উদয়ের পথে'র সাফল্য সিনেমার বড় বড় ব্যাওসাদারদেরও চোখ খুলে দিল। প্রথাসিদ্ধ স্টুডিও সিস্টেম 'স্টার সিস্টেমে'র তারকাখচিত কাল্পনিক মনোরঞ্জক কাহিনীর দিন আর নেই। দর্শকদের মন আর এরা ভোলাতে পারবে না। চাই জীবন, জীবন থেকে নেওয়া ছবি। অজ্ঞাতকুলশীল কুশীলবদের ভিতর তারা স্বপ্নলোকের তারকাদের নয় তাদের মতন যে কেউ হতে পারে চরিত্রদের খুঁজে পেয়েছিল। সিনেমার নতুন করে ভাবনার দরজা খুলে গেল।

এই সময়েই শুরু হল তেভাগার আন্দোলন। বাংলার কৃষক আর ভাগ্যের দোষ দিচ্ছে না। ভালো জমিদারবাবুর খোঁজে কপাল চাপড়াচ্ছে না, কৃষক রমণীরা শুধু সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে শঙ্খধ্বনি করে আর নায়ককে 'লুচি' ভেজে দিয়েই ক্ষান্ত হননি। ধানের গোলা রক্ষা করার জন্য কাস্তে নিয়ে পুলিশ আর জমিদারের গুন্ডাবাহিনীর মুখোমুখি রুখে দাঁড়িয়েছে। সিনেমার চিত্রনাট্য টুকরো টুকরো, খানখান।

ছবি প্রযোজনার সুযোগ এসে গেল গণনাট্য সংঘের কর্মীদের হাতে। এ বিষয়ে বোম্বাই গণনাট্য সংঘের কর্মীরা অনেক এগিয়ে ছিলেন। 'নবান্ন'র বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতে পারেননি বাংলার শিল্পীরা। সুযোগকে কাজে লাগালেন বলরাজ সাহনিরা। ভারতের সিনেমার ইতিহাসে 'ধরতি-কে লাল'-এর প্রযোজনা এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই প্রথম কম্যুনিস্ট পার্টির একটি গণসংগঠন সরাসরি চলচ্চিত্র প্রযোজনার মতো ব্যয়বহুল বিপুল কর্মকাণ্ডে নিজেদের যুক্ত করবেন। প্রযোজনায় ছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পক্ষে ডি পি সাঠে, পরিচালনায় গণনাট্যের এবং ভারতীয় সিনেমার প্রবাদপুরুষ খাজা আহমদ আব্বাস, সংগীত পরিচালনায় রবিশংকর, গীতিকার প্রেম ধাওয়ান, আর অভিনয়ে? —বলরাজ সাহনি, দময়ন্তী সাহনি, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি ভাদুড়ী, উষা দত্তরা। যদিও বোম্বাইয়ে প্রযোজিত। কাহিনীসূত্র কিন্তু এই বাংলার, কৃষকদের উপর জমিদারি শোষণ, নির্যাতন, ভাগ্য ফেরাবার আশায় শহর কলকাতায় আগে। সেখানেও প্রবঞ্চিত। এবার প্রতিরোধ, কৃষক হাতে কাস্তে তুলে নিচ্ছে, গোলারক্ষার লড়াইয়ে। কৃষকের প্রতিবাদী মূর্তি, কৃষকরমণীর শিরদাঁড়া টানটান ছবি এই প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রবেশ করল। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৪৬-এর শেষাশেষি। অর্থাৎ কেরালার কাঁয়ুরে, অন্ধ্রের তেলেঙ্গানায় আর বাংলার গ্রামে গ্রামে তেভাগা আন্দোলন সংগ্রামের ঢেউ উত্তাল, ঠিক সেই সময়েই ভারতীয় চলচ্চিত্র এই প্রথম শিল্পের দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করল।

'ধরতি-কে লাল'-এর অসামান্য সাফল্যে উদ্দীপিত হয়ে ১৯৪৬-এই চেতন আনন্দ 'ইপটা'রই (IPTA) ছাতার তলায় তৈরি করলেন 'নীচা নগর' ম্যাক্সিম গোর্কির 'লোয়ার ডেপথ্‌স'-কে সামনে রেখে গরিব মানুষের প্রতিবাদী চেহারা এখন সিনেমার বিষয়বস্তুই শুধু ছিল না, দর্শকগ্রাহ্যও হল। আবার কৃষক জীবন, জমিদারি শোষণ, কৃষককে প্রতিবাদের মিছিলে আহ্বান করে ছবি তৈরি হল। এবার কিন্তু মেন স্ট্রিম সিনেমাতেই। ১৯৪৭-এ বিজয় ভাট তৈরি করলেন 'সমাজ কো বদল ডালো', অভিনয়ে ছিলেন সেদিনের গণনাট্য কর্মী প্রেম ধাওয়ান, লীলা পাওয়ারেরা।

ভারতীয় সিনেমায় 'কল্পনার' মূল্যায়ন আজও হল না। শিল্পীর দায়বদ্ধতা, শ্রেণীশোষণের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা, সমাজ বাস্তবতার তত্ত্বকে এমনভাবে আর কোনও ছবিই সেদিন তুলে ধরেনি অসামান্য নন্দনতাত্ত্বিক দক্ষতায়: উদয়শংকর তাঁর প্রতিভার প্রায় সবটুকু ঢেলে দিয়েছিলেন 'কল্পনায়'। এ কথা ঠিক তেভাগার কৃষক আন্দোলন 'কল্পনা'র পটভূমিকা নয়, কিন্তু শ্রেণীশাসিত সমাজে শোষিতের প্রতিবাদ ছাড়া অন্য পথ নেই—তেভাগার এই শিক্ষা 'কল্পনা'র (১৯৪৮) প্রতিটি ফ্রেমে ধরা পড়েছে। যেহেতু কৃষক আন্দোলন তার পটভূমিকা নয়, তাই 'কল্পনা' নিয়ে বেশি কথা এখানে আলোচনা করার সুযোগ নেই।

তেভাগার পাশাপাশি এল দেশভাগ। বাংলার কৃষকজীবনে সবচেয়ে বড় আঘাত। নিমাই ঘোষ 'ছিন্নমূল' শুধু দেশভাগের যন্ত্রণাই তুলে ধরেননি, এসেছে জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষমাশূন্য ঘৃণা, এসেছে আধিয়ারদের দাবির কথা। ১৯৫০-এ 'ছিন্নমূল' মুক্তি পায়। যদিও ঋত্বিক ঘটক, শোভা সেনের মতো শক্তিশালী অভিনেতারা ছিলেন তবু প্রয়োগ-নৈপুণ্যের সীমাবদ্ধতায় ছবিটি সিনেমা হলের আনুকূল্য পায়নি।

কৃষক জীবনের শোষণের জমিদারি নির্যাতনের কাহিনী ভারতীয় সিনেমায় চিরস্মরণীয় হয়ে রইল 'দো বিঘা জমিন'-এ ১৯৫৩-তে তৈরি। সবাই জানেন এর নৈপুণ্যের কথা, জানেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। কৃষকের জমি হারানোর বঞ্চনার দলিল 'দো বিঘা জমিন',

যদিও বোম্বাইয়ে তৈরি, কিন্তু কাহিনীকার গণনাট্যের গৌরবময় ফসল সলিল চৌধুরীর, সংগীতও তাঁর। পরিচালনায় ছিলেন বিমল রায়। তাই বাংলার কৃষক আন্দোলন, কৃষকের অবস্থান চিত্রিত হয়েছে ছবিতে; বলরাজ সাহনি, নিরূপা রায়ের অভিনয় এই ছবির ঐশ্বর্য। একই কাহিনী নিয়ে সত্যেন বসু কলকাতায় একটি ছবি তৈরি করেছিলেন। 'রিক্সাঅলা' (১৯৫৪), নায়কের ভূমিকায় ছিলেন আর এক গণনাট্যের কর্মী। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিশির দাস তেভাগা আন্দোলনের ছত্রিশ বছর পরে কাকদ্বীপের লালগঞ্জ গ্রামের পটভূমিকায় এক অসামান্য উপন্যাস লিখেছেন শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা। এক অসাধারণ গবেষণাধর্মী উপন্যাস। তেভাগার কাহিনী নিয়ে এমনিতরের ছবিও তৈরি হয়েছে প্রায় চারদশক পরে। কে না জানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই'য়ের কথা? 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'-র কথা। গল্পগুলি ছিল তেভাগার লড়াইয়ের ডায়েরি, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তারা স্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছে। আশির দশকে এসে কবি-চিত্রকর-পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রী 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'কে নিয়ে সরকারি প্রযোজনায় ছবি তৈরি করেছেন। এরপর বিরাট কর্মকাণ্ডে সলিল চৌধুরিকে বহুদিন পরে গণনাট্যের জলহাওয়ায় ব্যবহার করেন প্রণব চৌধুরি, তৈরি করেন 'হারানের নাতজামাই'। মনে রাখা প্রয়োজন তখনও তেভাগার পঞ্চাশ বছর নিয়ে উৎসবের কথা ভাবা হয়নি। আমার সিদ্ধান্ত এইটিই। তেভাগার কৃষক আন্দোলন বাংলার শিল্পী-চেতনায়একটা স্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছে। জ্ঞাতেই হোক অজ্ঞাতেই হোক তাই চিরঞ্জিত-অঞ্জন লাঞ্ছিত তথাকথিত 'মেনস্ট্রিম' বাংলা ছবিতেও আর কৃষক জীবন শরৎচন্দ্রের কৃষকজীবনে বাঁধা পড়ে নেই, 'স্বামী দেবতার' ধারণা আর বাংলা ছবিতে দর্শক কাঁদায় না।

তাই বলছিলাম, তেভাগার লড়াইয়ের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ফসল যেমন ভূমিসংস্কার আইন কিংবা অপারেশন বর্গা, সাংস্কৃতিক জীবনেও সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার দেওয়াল ভাঙার শিক্ষাও দিয়েছে তেভাগার লড়াই।

শিল্পী: সোমনাথ হোর

তেভাগার গান ও কবিতা

অনুরাধা রায়

জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কৃষাণের বউ পঁইছে বাজু বানায়।
যাত্রা তাদের কঠিন পথে রাখীবাঁধা কিশোর হাতে—
রাক্ষসেরা বৃথাই রে নখ শানায়।

নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে
তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল,
লাল তিলকে ললাট রাঙা, উষার রক্তরাগে
—কার এসেছে কাল?'

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে খুলনা জেলার মৌভোগে অনুষ্ঠিত কিষাণ সম্মেলন এই কবিতার প্রেরণা। কবিতার নাম 'মৌভোগ'। রচয়িতা বিষ্ণু দে। শাসক ও শোষক বিরোধী গণসংগ্রামে সারা দেশ তখন উত্তাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরপর—১৯৪৫-এর নভেম্বর মাস থেকেই—এই জঙ্গী মেজাজের সূচনা। আজাদ হিন্দ মুক্তি আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, অগুনতি ধর্মঘট, সর্বোপরি ২৯ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টির ডাকা সাধারণ ধর্মঘট—বিক্ষুব্ধ ডাক ও তার কর্মীদের সমর্থনে। জুলাই মাসে হায়দ্রাবাদে তেলেঙ্গানা কৃষক-অভ্যুত্থানেরও সূচনা। বাংলার কৃষিক্ষেত্রে বিদ্রোহ তখনও প্রকট হয়নি। কিন্তু মেজাজটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অর্থনৈতিক মন্দা ও তারপর পঞ্চাশের মন্বন্তরের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত কৃষিজীবীরা প্রস্তুত হয়ে উঠছিল 'শেষ লড়াই'-এর জন্য।

তেভাগার দাবির কথা শোনা যাচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরে। এ হল জোতদারদের কাছে বর্গাদারদের দাবি—উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের জন্য। '৪৬-এর এপ্রিল মাস থেকে জোরালো হয়ে উঠেছিল এই দাবি এবং মৌভোগ সম্মেলনে তা উত্থাপিত হয়েছিল।

বর্গাদাররা অবশ্য কৃষিসমাজের একটিমাত্র অংশ এবং তাদের তেভাগার দাবিও আপাতদৃষ্টিতে সংকীর্ণ অর্থনৈতিক চরিত্রের। তবু এই দাবির একটা প্রতিনিধিত্বমূলক দিক ছিল। ছোট চাষী ও কৃষিমজুর-সহ বৃহত্তর বঞ্চিত কৃষকসমাজের প্রতিবাদ যেন পরিস্ফুট হয়েছিল বর্গাদারদের কণ্ঠে। আর জোতদারদের সঙ্গে তাদের লড়াইটাও নিছক অর্থনৈতিক ছিল না, অনেকটা সামাজিক-রাজনৈতিকও ছিল। সামগ্রিকভাবে একটা মুক্তির হাওয়া যেন বয়ে গিয়েছিল গ্রামাঞ্চলের শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থায়। ফসলের ভাগবাঁটোয়ারার হিসেবকে ছাপিয়ে উঠেছিল অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই। অদূরভবিষ্যতে তেভাগা আন্দোলনের নানা ঘটনায় এসবের প্রমাণ পাওয়া যায়। কৃষকরা অনেকটা তৈরি হয়ে উঠলেও, কিষাণ সভা তথা কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের ডাক দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল না মৌভোগ সম্মেলনের সময়। তবে কবির ভাবাবেগ—তা তিনি পার্টির আদর্শ অনুসারী হলেও—কখনও পুরোপুরি পার্টি-লাইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। 'মৌভোগ' কবিতাটিতে তাই কৃষকদের সংগ্রামী মেজাজ সাবলীল সৌন্দর্যে অনুরণিত হয়েছে শহরের সংবেদী প্রাগ্রসর কবির কলমে।

কবিতাটি যখন অরণি পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হল, তখন অবশ্য তেভাগার লড়াই শুরু হয়ে গেছে। অগাস্ট মাসে ঘটে গেছে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কমিউনিস্ট পার্টি উপলব্ধি করেছে যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার একমাত্র বিকল্প শোষক-বিরোধী গণসংগ্রাম এবং ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে এই সংগ্রাম চালাতে হবে প্রধানত কৃষিসমাজে। তাই সেপ্টেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে তেভাগা আন্দোলনের সূচনা করা হল। আর কৃষকরা যেভাবে সাড়া দিল এই আন্দোলনে, তার বিস্তার ও তীব্রতা দুই-ই সংগঠকদের কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে গেল।

বাংলার জেলায় জেলায় আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল তেভাগা আন্দোলন। নভেম্বরে ধান কাটাব সময় এলে সত্যি করে শুরু হল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। 'জান দিব, তবু ধান দিব না' স্লোগান তুলে চাষীরা ধান কেটে নিয়ে যেতে লাগল নিজেদের খোলানে, জোতদারের গোলার বদলে। জোতদার-নিযুক্ত গুণ্ডার হামলার সঙ্গে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যুক্ত হল সরকারী পুলিশের হাঙ্গামা। আন্দোলন চলতেই থাকল। '৪৭-এর আগস্ট মাস পার হয়ে স্বাধীন দেশের নতুন সরকারের আমলেও। বহুসংখ্যক কৃষক প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করল তাদের অঙ্গীকারের দৃঢ়তা। তাদের ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত সেই মরণপণ সংগ্রামে অগ্রণী অংশ নিল—যে সংগ্রাম জাগিয়ে তুলল তাদের নারী-অধিকারের চেতনাও। গ্রামসমাজের চিরায়ত জাতিধর্মভেদ বহুক্ষেত্রে ঘুচে গেল সংগ্রামের আবেগে। অল্প জমির মালিক জোতদাররা স্বেচ্ছায় তাদের আধিয়ারদের তেভাগা দিয়ে লড়াইয়ের সামিল হয়, এমন দৃষ্টান্তও আছে।

শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক আদর্শবাদী মানুষও তেভাগা আন্দোলনে সাড়া দিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বহু ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী গ্রামে গ্রামে গেলেন কৃষকদের সংগ্রামে সামিল হতে। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে, নিজেদের শ্রেণী অবস্থান ভুলে তাঁরা লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—সকলে মিলে সুন্দর একটা পৃথিবী গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায়। গ্রামে যাননি এমন অনেক মধ্যবিত্ত মানুষকেও ছুঁয়ে গেল তেভাগার আবেগ—শুধু তেভাগার নয়, এক আন্তর্জাতিক মুক্তি সংগ্রামের আবেগ। চল্লিশের দশকের শেষ ও পঞ্চাশের প্রথমে শতাব্দী লাঞ্ছিত ঔপনিবেশিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, এমন একটা সংগ্রামের জোয়ার এসেছিল। বাংলার বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা তেভাগাকে এরই অঙ্গ বলে মনে করতেন। বাংলার বিভিন্ন গ্রামে কৃষকদের লড়াই, ভারতের অন্যত্র তেলেঙ্গানা ও আরও কয়েকটি বিক্ষিপ্ত সংগ্রাম, কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি হবার (১৯৪৮) সুবাদে অনেক ক্ষেত্রে নিজেদেরও আন্ডারগ্রাউন্ড বা কারাগার জীবনযাপন—তাঁদের চোখে আসন্ন বিপ্লবের স্বপ্ন জাগিয়ে রাখল বেশ কয়েক বছর। সে স্বপ্নে যতটা আদর্শ ও আন্তরিকতা ছিল ততটা বাস্তববোধ হয়ত ছিল না।

তবু অনস্বীকার্য যে তেভাগাকে কেন্দ্র করে সংগ্রামী আবেগের এক লক্ষণীয় বিকাশ ঘটেছিল মধ্যবিত্ত ও কৃষক উভয় সমাজেই, যার পরিচয় ছড়িয়ে আছে বেশ কিছু গান ও কবিতায়। আবেগের সেই উজ্জ্বল দলিলের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করব এই প্রবন্ধে। এই দলিল বোধহয় তেভাগার অন্যান্য ঐতিহাসিক দলিলের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ সংগঠনের সীমাবদ্ধতা থাকলেও রণকৌশলের দুর্বলতা থাকলেও, এই আশ্চর্য আবেগটুকুর জন্যই তেভাগা আন্দোলন ইতিহাসে স্থায়ী স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

প্রথমেই বলে নেওয়া যাক, তেভাগার মধ্যবিত্ত কবি-গীতিকারদের কথা। এঁদের মধ্যে আবার সবার আগে মনে পড়ে সলিল চৌধুরীর নাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গণ-অভ্যুত্থানের শ্রেষ্ঠ গীতিকার-সুরকার সলিল চৌধুরীর গানে বলিষ্ঠ ভাষা পায় সংগ্রামী কৃষকদের দাবি—

> হেই সামালো! হেই সামালো!
> হেই সামালো ধান হো
> কাস্তেটা দাও শান হো
> জান কবুল আর মান কবুল
> আর দেব না, আর দেবনা
> রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো ॥
> চিনি তোমায় চিনি গো
> জানি তোমায় জানি গো
> সাদা হাতীর কালা মাহুত তুমিই না?
> পঞ্চাশে লাখ প্রাণ দিছি
> মা-বোনেদের মান দিছি
> কালো বাজার আলো কর তুমিই না?[২]

তেভাগা নিয়ে সলিল চৌধুরীর সবথেকে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'কাকদ্বীপ' শীর্ষক কবিতা। উত্তর-স্বাধীনতা পর্বের সুবিখ্যাত তেভাগা-অঞ্চল সুন্দরবনের কাকদ্বীপ। ১৯৪৮-এর অক্টোবর মাসে এখানকার চন্দনপিঁড়ি গ্রামের অহল্যা নামে এক কৃষকবধূ—

পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন। তিনি তখন ছিলেন অন্তঃস্বত্ত্বা। কবিতাটির অংশবিশেষ—

সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে
হরতাল হয়েছিল
সেদিন আকাশে জলভরা মেঘ
বৃষ্টির বেদনাকে
বুকে চেপে ধরে থমকে দাঁড়িয়েছিল।
এই পৃথিবীর আলোবাতাসের অধিকার পেয়ে
পায় নি যে শিশু জন্মের ছাড়পত্র
তারি দাবি নিয়ে সারা কাকদ্বীপে
কোন গাছে কোন কুঁড়িরা ফোটে নি
কোন অংকুর মাথাও তোলে নি
প্রজাপতি যত আরো একদিন
গুটিপোকা হয়েছিল
সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে
হরতাল হয়েছিল।[৩]

চন্দনপিঁড়ির 'অহল্যা মা' অমর হয়ে আছেন একাধিক গানে। বিখ্যাত গণসংগীতকার বিনয় রায়ের "আর কতকাল, বল কতকাল, সইব এ মৃত্যু অপমান" গানটি প্রথমে হুগন্দ্রলর বড়া কমলাপুর ও কাকদ্বীপের ডোঙাজোড়ায় পুলিশের গুলিতে নিহত কৃষকদের স্মরণ করে, তারপর বলে অহল্যার কথা—

অহল্যা মা তোমার সন্তান জন্ম নিল না
ঘরে ঘরে সেই সন্তানের প্রসব যন্ত্রণা
শত কংস ধ্বংস করে যে শিশু জন্মিবে
মাঠে মাঠে তারি জল্পনা।[৪]

তেভাগার শহিদরা অনুপ্রেরণা দিয়েছেন গণগীতিকার হেমাঙ্গ বিশ্বাসকেও। শিলচর জেলে বন্দী কৃষক মাধবীনাথের মৃত্যুতে (১৯৫০) ভাটিয়ালীর একটি বিশেষ ঢঙে তাঁর গান—

আমরা তো ভুলি নাই শহীদ একথা ভুলব না
তোমার কলিজার খুনে রাঙাইলো কে আন্ধার জেলখানা।[৫]

তেভাগার লড়াই যে-সব কবি ও গীতিকারদের উদ্বেল করেছিল, আগেই বলেছি, তাঁরা একে এক ক্ষুদ্র কৃষিজীবী গোষ্ঠীর সংকীর্ণ অর্থনৈতিক লড়াই হিসেবে দেখেননি, কৃষক-শ্রমিক মধ্যবিত্ত সকলের সচেতনতা ও ঐক্যসঞ্জাত এক বৃহত্তর মুক্তি-সংগ্রাম হিসেবে দেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের কাছে এই সংগ্রামের প্রেক্ষাপট ছিল সমগ্র বিশ্ব। 'কাকদ্বীপ' কবিতারই পূর্ববর্তী অংশ যার নাম 'শপথ', সেখান থেকে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

তাই দেশে দেশে যত প্রতিরোধ
তারি মাঝে তুলি রক্তের শোধ
নানকিং আর প্যারীর যুদ্ধে
আমরাই সাথে আছি
কাকদ্বীপে মরে আমরা আবার
তেলেঙ্গানায় বাঁচি।[৬]

বাংলার গ্রামে "কাস্তের মুখে নতুন ফসল তুলবার" দিন আনে যারা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চোখে তাদেরই দোসর ছিল—

পেরাকে পেনাঙে টিনের খনিতে
রবারের বনে
মসলার দ্বীপে,
সোনাফলা ইরাবতীর দুধারে
উপত্যকায়
বদ্বীপে নীলকান্তমণির
ঝিকি মিকি দেশে
শ্যামে কম্বোজে
অনামী পাহাড়ে
মেকং নদীর বানডাকা জলে
ঘুম-ভেঙে-ওঠা অগ্নিকোণের মানুষ।[৭]

"অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে দুরন্ত ঝড়ে তোলপাড় কালাপানি" দেখে আপ্লুত হয়েছিলেন শুধু সুভাষ নয়, আরও অনেক কবি। চীনের সংগ্রাম বিশেষ করে অনুপ্রাণিত করেছিল এইসব কবিদের। এমন অসংখ্য অজস্র কবিতা সে-যুগে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলিকে পরোক্ষভাবে তেভাগার কবিতা বলা চলে। কারণ কবিদের হাতের কাছে সংগ্রামের নমুনা বলতে তেভাগাই ছিল। তেভাগার মধ্যে তাঁরা দেখেছিলেন চীন বা বর্মার সংগ্রামের সমান্তরালতা, প্রধানত তেভাগার মধ্য দিয়েই দাবি করেছিলেন আন্তর্জাতিক বিপ্লবের অংশীদারিত্ব।

ক্রমে অবশ্য কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন ও বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লব-স্বপ্ন দুই-ই স্তিমিত হয়ে এল। পার্টি আবার সাংবিধানিক পন্থা অবলম্বন করল। কিন্তু তারপরেও কিছুদিন জঙ্গী মেজাজের রেশ থেকে গিয়েছিল। ১৯৫৩ সালের মে মাসে হাওড়ার বাগনানে অনুষ্ঠিত হল কিষাণ সভার প্রকাশ্য প্রাদেশিক সম্মেলন। ওই অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ছিল তরুণ কবি পূর্ণেন্দু পত্রীর। এই সম্মেলনেও তিনি যেন তেভাগার প্রতিবাদী-প্রতিরোধী আবেগ অনুভব করেছিলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কবিতা 'বাগনান'—

এদিকে নদীর বান
ওদিকে নদীর বান
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সব একাকার।
গাঁয়ে যত বৌ ছিল—ঢেউ
গাঁয়ে যত বুড়ি ছিল—ঢেউ
ছেলে বুড়ো বাকি নেই কেউ
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সব একাকার।
সারারাত গানের জোয়ার
সারারাত প্রাণের জোয়ার।
জন্মদুঃখী কৃষকের দুটি হাতে দোতারার তার
ঢেউ তোলে অস্থির কান্নার
পঞ্জরাস্থি ছিঁড়ে ফেলে
কবিয়াল গায় কবিগান।
দুর্জয় বক্তৃতা শোনে
আবালবনিতাবৃদ্ধ
মধ্যবিত্ত মজুর কিষাণ।[৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যশোরের নাড়াইল অঞ্চলে তেভাগা সংগ্রামের নেতা নুরজালাল নিজে কিন্তু একজন ছোট জোতদার ছিলেন। ৩০ বিঘা মতো জমি ছিল তাঁর। আদর্শবাদী এই মানুষটি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের অধীনস্থ ভাগচাষীদের তেভাগা দেন এবং আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা নেন। গানটিতে মন-ভাঙানো কাজকর্মের কথা যা বলা হয়েছে, তার ইতিহাস সম্ভবত এরকম—এই অঞ্চলে তেভাগা সংগ্রামীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল নমঃশূদ্র চাষীরা। মুসলমান কৃষকরাও ছিল। ছিলেন নুরজালালের মতো অগ্রণী মুসলমান কৃষক-নেতা।

গদ্যসাহিত্যকে আমরা এই প্রবন্ধের আওতার বাইরেই রেখেছি। তবু মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে তেভাগার সংগ্রাম কিছু উৎকৃষ্ট নাটক ও ছোটগল্পেরও জন্ম দিয়েছিল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর কলমে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'নয়ানপুর' নাটক। লেখক অনিল ঘোষ ২৪-পরগনার গণনাট্য শাখার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে ডোঙাজোড়া গ্রামে পুলিশ-কৃষক সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে নাটকটি লেখেন। ১৯৪৯-৫০ সালে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ তেভাগা-অঞ্চল জুড়ে নাটকটি বহুবার অভিনীত হয়েছে। ১৯৪৮-এ বড়া কমলাপুরে কৃষক-পুলিশ যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। তেভাগার ঠিক সমসাময়িক না হলেও ১৯৫০-এর দশকেই রচিত হয় সাবিত্রী রায়ের উপন্যাস 'পাকা ধানের গান'—ময়মনসিংহের হাজং কৃষকদের আন্দোলন নিয়ে, যে আন্দোলন ছিল তেভাগারই অংশ। সংগ্রামী কৃষকদের সঙ্গে গভীর সহমর্মিতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে এইসব মধ্যবিত্ত রচনা। 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী'-তে মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠায় ধরা পড়েছে তেভাগার দৌলতে কৃষক-মানসে নবজাগ্রত চেতনা। বরাবরের ভীরুতা, বশংবদতা ও হতাশা কাটিয়ে উঠে তারা জেগে ওঠে আত্মমর্যাদায়, অধিকারবোধে এবং ন্যায়সম্পন্ন শ্রেয়স্কর ভবিষ্যতের স্বপ্নে। গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে—"মোরা কলির পাপী লোক, এ লড়ায়ে মোরা মরব। মোদের ছেলেপুলেরা ফের সত্যযুগ করবে।"[৯]

এবার আমরা আলোচনা করব তেভাগার কৃষক কবি ও গীতিকারদের কথা। এঁদের রচনা হয়ত খুব কিছু পরিশীলিত ছিল না, কাব্যিক সূক্ষ্মতায় ভূষিতও ছিল না। আন্তর্জাতিক বিপ্লবের কথাও এঁরা ভাবতেন না (যদিও পার্টি-স্লোগানের প্রভাবে কখনও কখনও "মজুর চাষির জয়-নিশান" উড়িয়েছেন)। কিন্তু এইসব গানের জোরের জায়গা হল এই যে এগুলি ভাষায় ওভাবে অনেক বেশি মৃত্তিকাগন্ধী। এঁদের জীবনের বঞ্চনা ও দারিদ্র্য অনেক বেশি প্রত্যক্ষ এই গানগুলিতে। আর এঁদের সংগ্রামী প্রতিজ্ঞায় স্বপ্নবিলাসের থেকেও বেশি আছে মাটি-কামড়ানো দৃঢ়তা। স্বপ্নও অবশ্য আছে, বাধ্যতই। কিন্তু সে নিতান্ত সাধারণ মানুষের সাদামাটা স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের স্বপ্ন।

১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা পত্রিকায় যশোরের নমঃশূদ্র চাষী পঞ্চানন দাসের এক দীর্ঘ গান প্রকাশিত হয়—'হও রে সবে আগুয়ান'। এখানে প্রথম দিকে আছে চাষীর দুঃখের কথা—মহাজনের কাছে হাল-বলদ বাঁধা পড়া, 'বুড়ো ঠাকুরদাদার নড়া দাঁতের' মতো 'নড়বড়ে লাঙলের কুটি' ও হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও গিন্নির কাছে গালি খাবার ক্ষোভ। তারপর আন্দোলনের কথা—

তেভাগার আন্দোলনে নড়াইল হল অগ্রণী
চন্দ্র বসু এলেন আশু শুনতে পেলাম ইদানি
ভাঙতে এদের কলকাটি
কেউ বাজাচ্ছে দোকাটি
এই আন্দোলন গড়ে তোলার প্রধান নেতা নুরজালাল
এই দলেরই মন ভাঙিতে জুটে গেছে কয় দালাল।
হস না তোরা বিমর্ষ
তোদের এই আদর্শ
ভারত জুড়ে বেড়াক উড়ে মজুর চাষির জয়-নিশান
হও রে সবে আগুয়ান।[১০]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যশোরের নাড়াইল অঞ্চলে তেভাগা সংগ্রামের নেতা নুরজালাল নিজে কিন্তু একজন ছোট জোতদার ছিলেন। ৩০ বিঘা মতো জমি ছিল তাঁর। আদর্শবাদী এই মানুষটি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের অধীনস্থ ভাগচাষীদের তেভাগা দেন এবং আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা নেন। গানটিতে মন-ভাঙানো কাজকর্মের কথা যা বলা হয়েছে, তার ইতিহাস সম্ভবত এরকম—এই অঞ্চলে তেভাগা সংগ্রামীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল নমঃশূদ্র-চাষীরা। মুসলমান কৃষকরাও ছিল। ছিলেন নুরজালালের মতো অগ্রণী মুসলমান কৃষক নেতা। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কিছু লোক এখানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা করে।[১১]

উত্তর বাংলার ডিমলা থানার নাওতারা গ্রামের অত্যাচারী জোতদার কোরামল দাগার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ৭০ বছরের এক রাজবংশী বৃদ্ধা—কৃষক বাবুরি বর্মণের মা। মাড়োয়ারি কোরামল ব্যবসার নামে ওই অঞ্চলে এসে জাঁকিয়ে বসে ও স্থানীয় অধিবাসীদের যারপরনাই শোষণ করে। আন্দোলনের ফলে তাকে রাতের অন্ধকারে পুলিশি প্রহরায় পালাতে হয়। তবে কৃষক-নেতা মণি সেন কোরামলের পাইক কর্তৃক প্রহৃত হন। এইসব নিয়ে একটি গান পাওয়া গেছে, রচয়িতা অজ্ঞাতনামা—

বিকান থেকে আলুরে কাইয়া
হাতে লইয়া ঘটি,
আস্তে আস্তে নিলুরে কাইয়া
মোদের দেশের মাটি।

কোন দেশের নাড়িয়া কাইয়ারে
মোর দেশে আলুরে কাইয়া,
মোরে মাটি নিলু,
পেটের ভোখে তেভাগা চাইতে
মাথাতে ডাঙ্গালু।
কোন দেশের নাড়িয়া কাইয়ারে।
কাইয়া কান্দে কাইয়ানী কান্দে
কান্দে কাইয়ার মাও
মণি সেনের মাথায় ডাঙ্গেয়া
কি করিস উপায়
কাইয়া কান্দে রে।[১২]

রংপুর অঞ্চলের প্রচলিত লোকগীতি 'ভোটানযাত্রা' —"বনুসের (বউয়ের) হাত ধরি ভোটানত যায়। কান্তাই (কড়াই) মাথায় দিয়া ফিরে ফিরে চায়"! জোতদারের অত্যাচার চরম দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকের দেশান্তর গমনের বর্ণনা পাই এই গানে। যেখানে সে নির্বাসনে যাচ্ছে সেই ভোটান হল জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চল। তেভাগার সময় রচিত হল উল্টো ভোটানযাত্রা। জোতদার রমেশ পালিয়ে যাচ্ছে, তার ভৃত্য গণা তাই পুলকিত। এতদিন সে আর্থিক কারণে 'ঢ্যানা' অর্থাৎ অবিবাহিত থাকতে বাধ্য হয়েছিল। এখন সে একটি সুখী পরিবার গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে—

বনুসের হাত ধরি অমেশ ভোটান যায়
গণা ঢ্যানা এইবার ব্যাটা ছাওয়া চায়।[১৩]

রংপুরের কৃষক ও কিষাণ সভার সদস্য জামশেদ আলি চাটি তেভাগার সময় গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে গান গেয়ে কৃষকদের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতেন। তেভাগা আন্দোলনের আরও দু-জন কৃষক গায়কের কথা পাই—গয়াবাড়ির বিপিন বর্মণ ও গা ভরণের রাজেন্দ্র সাধু। কিন্তু এঁরা ঠিক কী গান গাইতেন তা জানা যায় না।

জলপাইগুড়ির তেভাগা আন্দোলনে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন চা-বাগানের শ্রমিকরা। এরকমই এক শ্রমিক লাল শুকরা ওঁরাও-এর গান, সাদ্রী-ভাষায়—

মালবাজার আনা যানা
মাটিয়ালী থানা রে
শুনো ভাই-স্বাধীন দেশকা গানা রে।
এক বিতা পেট লিগিন
গিলি জেলখানারে
শুনো ভাই—স্বাধীন দেশকা গানা রে।[১৪]

তেভাগার সময় এই ধরনের গান তিনি গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াতেন, বোন পোকো ওরাঁও-এর সঙ্গে।

এক নামহীন রচয়িতার গানেও তেভাগার প্রতিজ্ঞা—

ওরে জমিদারের চর আইস্যাছে কাড়ইয়া নিতে ধান,
ছাইরবো না ঘরের লক্ষ্মী-দ্যাহে থাকতে প্রাণ।
জলে ভিজাইয়া, রোদে পুড়ইয়া, আনছি ঘরে লক্ষ্মী,
তোমরা থাইক সাক্ষী।
তারেই আইজ গায়ের জোরে লইতে আইছে ওরা—
এ ধান দিমু না, এ লক্ষ্মী ছাড়মুনা দ্যাহে থাকতে প্রাণ
ওগো মা, আমরাও তো তোমারি সন্তান।[১৫]

মেদিনীপুর সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমায় কৃষক সমিতির আনা নবজাগরণের পরিচয় হিসেবে এক সাঁওতাল কবিতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ২৯শে জুন, ১৯৪৭-এর **স্বাধীনতায়**। এখানেও কৃষকদের ক্ষোভ প্রতিফলিত—

ফ্যান আমানি খেয়ে আমরা
হাসিল করলাম বন
উঁচু জমি সমান করলাম
হেসে উঠল ফসল।
আজ সে জমির মালিক আমরা নই
সেই ক্ষিধেও রইল
আর থাকার মধ্যে রইল শুধু নেই নেই।

কৃষকদের যেমন স্লোগান-ধর্মী কবিতা ছিল, তেমনই ছিল, ছন্দোবদ্ধ স্লোগান। এমন একটি স্লোগানের উল্লেখ এই প্রবন্ধে নিতান্ত বেমানান হবে না। আরও উল্লেখ করছি এই কারণে যে এটি রচনার ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। উত্তরবঙ্গের নীলফামারি শহরের দিকে কৃষক সভার এক মিছিল যাচ্ছিল, দাবি-পেশ করার উদ্দেশ্যে। পথে খিচুড়ি রেঁধে খাওয়ার জন্য থামা হল ডোমারে। এমন সময় একটা ভীতিপ্রদ খবর এসে পৌঁছাল—নিকটবর্তী রেলওয়ে শহর সয়ীদপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে। এদিকে নীলফামারির মিছিলে হিন্দু মুসলিম দুই-ই আছে। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল তাদের মধ্যে। মিছিলের সংগঠক মধ্যবিত্ত নেতারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তখন কয়েকজন তরুণ কৃষক এসে তাদের বলল—"হামার হাত্তা ছাড়ি দাও। চিন্তা না করেন।" এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্লোগান উঠল—

দাড়ি টিকি ভাই ভাই
লড়াইয়ের ময়দানে জাতিভেদ নাই।[১৬]

গুঞ্জন স্তব্ধ হল। আবহাওয়া বদলে গেল। খিচুড়ি রান্না ও খাওয়ার পর্ব শেষ করে মিছিল আবার রওনা হল গন্তব্যস্থলের দিকে। কৃষকদের স্লোগান তথা শ্লোকটিতে ধরা থাকল তাদের মানবিক শুভবুদ্ধি, সংগ্রামী ঐক্য ও সংকট-মুহূর্তে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতার পরিচয়।

কিন্তু তেভাগা আন্দোলনে মধ্যবিত্ত ও কৃষক কবিদের কথা পৃথকভাবে আলোচনা করলে, বিশেষ করে প্রথমোক্তদের আদর্শবাদী স্বপ্নবিলাসী ও দ্বিতীয় দলকে বাস্তববাদী সংগ্রামী বলে সে আলোচনা শেষ করে দিলে, ইতিহাসের অসম্পূর্ণতা এমনকি বিকৃতি ঘটবে। তেভাগায় অনেক মধ্যবিত্ত মানুষ শারীরিকভাবেই অংশ নিয়েছিলেন। আর কৃষকরাও ন্যায়ের আদর্শ ও আসন্ন অভীষ্ট-লাভের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই আদর্শ ও স্বপ্ন তৈরি করতে পার্টি বা কিষাণসভার মধ্যবিত্ত কর্মীরাও খানিকটা সাহায্য করেছিলেন। দৈনন্দিন জীবনের ওঠা-বসা, কাজকর্ম ও বেঁচে থাকায় তেভাগা মধ্যবিত্ত ও কৃষক অংশগ্রহণকারীদের অনেকটা কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সুযোগ করে দিয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক

পার্টি নেতাদের আগ্রহে তরুণ চিত্রশিল্পী সোমনাথ রংপুরে গিয়েছিলেন কৃষক-সংগ্রামে অংশ নিতে। সেখানে কৃষকদের বলিষ্ঠ সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা। সে-সব সচিত্র ধরা পড়েছে তাঁর এই ডায়েরিতে। তখন সংগ্রামের আবেগে ভেসে গেছে সব শ্রেণীভেদ। শহর থেকে আসা নেতাকে কেউ 'বাবু' বলে ডাকে না, বরং স্থানীয় কৃষক-নেতা শহরের বাবুর সম্বোধনে হন 'রূপকান্তদা'।

আদান-প্রদান সাংগীতিক ক্ষেত্রে তো লক্ষণীয় বটেই, তবে সংস্কৃতি শব্দটা এখানে বৃহত্তর অর্থেই ব্যবহার করছি। আসলে এই আদান-প্রদানের ভিত্তি ছিল তাদের পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্য। এর উজ্জ্বল বিবরণ পাওয়া যায় সোমনাথ হোরের 'তেভাগার ডায়েরি' তে।[১৭]

পার্টি নেতাদের আগ্রহে তরুণ চিত্রশিল্পী সোমনাথ রংপুরে গিয়েছিলেন কৃষক সংগ্রামে অংশ নিতে। সেখানে কৃষকদের বলিষ্ঠ সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা। সে সব সচিত্র ধরা পড়েছে তাঁর এই ডায়েরিতে। তখন সংগ্রামের আবেগে ভেসে গেছে সব শ্রেণীভেদ। শহর থেকে আসা নেতাকে কেউ 'বাবু' বলে ডাকে না, বরং স্থানীয় কৃষক নেতা শহরের বাবুর সম্বোধনে হন 'রূপকান্তদা'। আবার এক ভদ্রলোক — নীরেনদা — একেবারে চাষীদের ভাষাতেই বক্তৃতা দেন, চাষীরা তা মুগ্ধ হয়ে শোনে। সবাই সবাইকে 'কমরেড' সম্বোধন করে। সকালে কৃষকরা যখন মাঠে ধান কাটতে যায় তখন তাদের মুখে মধ্যবিত্ত গণসংগীতকার বিনয় রায়ের গান— "চাষী দে তোর লাল সেলাম লাল নিশানরে"। এই গানের মধ্যেই তারা জোতদারদের গুণ্ডাদের প্রতিহত করার শক্তি পেত। সন্ধ্যাবেলাতেও সারাদিনের কাজের শেষে মধ্যবিত্ত নেতা, কৃষক কর্মী সব এক জায়গায় জড়ো হয়। লড়াইয়ের স্ট্র্যাটেজি আলোচনা করে, কি শুধুই গল্পগুজব করে। গান ছিল এই আড্ডারও অপরিহার্য অঙ্গ। "এক কৃষক কমরেড কিছু গান শোনালো। আমাদের পার্টির উদ্যোগে প্রচারিত নতুন সংস্কৃতি যে সাধারণ মানুষের জীবনে কতোখানি প্রভাব বিস্তার করেছে, তার একটা পরিচয় এখানে পেলুম। কমরেড প্রথম গান শুরু করে আমাদেরই একটি কিষাণ সংগীত দিয়ে। তারপরেই গাইল, রঙপুরের প্রাচীন গান 'চেনার বধুয়া তুই'। উপস্থিত শ্রোতাদের কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না। এর পরের গান 'দুখের রাতের ঘোর তমসা ভেদি' (হেমাঙ্গ বিশ্বাসের রচনা)। দেখলুম, বৃদ্ধ নীলকান্ত পঞ্চায়েত, তাঁর বৃদ্ধ সঙ্গী দুর্গাবাবু, সবাই গানের তালে তাল দিচ্ছেন। এর পরে তাঁরাও গুনগুন করে গাইতে শুরু করলেন। পরপর অনেকগুলো স্বদেশী গান হলো। ছেলে বুড়ো সবাই তালে তাল ঠুকে গুনগুন করে চলেছে। যে গানের মানে বুঝতে কষ্ট হয়েছে, সেটার মানে বুঝে নিয়ে আবার গেয়েছে। মুগ্ধ হয়ে মাথা নেড়ে বৃদ্ধরা বলেছেন, 'বাঃ চমৎকার'। একটি গান শেষ হলেই অনুরোধ করেছেন, 'আর একটি গাও'। ভোটের গান, তেল-নুন-কেরোসিনের গান, স্বদেশী গান কোনটিই বাদ যায় নি। নতুন করে চোখে ঠেকল, যে গান শুধু সাময়িক উত্তেজনা হয়ে আমাদের জীবনে এসেছিল সে আজ কৃষকের স্বাভাবিক জীবনের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

সুতরাং সোমনাথ হোরের বর্ণনায় দেখা গেল, মধ্যবিত্ত রচিত গণসংগীত অনায়াসেই তেভাগার কৃষকদের গান হয়ে উঠেছিল। এমনকি নিজেদের ঐতিহ্যাশ্রয়ী লোকগীতির থেকেও তারা এসব গান বেশী পছন্দ করত। আবার অন্যত্র দেখি, গণনাট্য সংঘের 'নয়ানপুর' নাটক তেভাগার চাষীদের মধ্যে কী বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। ডোঙাজোড়ার সতীকান্তের কৃষক পুলিশ সংঘর্ষ নিয়ে রচিত এই নাটক সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে অভিনীত হত কৃষকদেরই সোৎসাহ সহযোগিতায়। জোতদারের লোক প্রায়ই অভিনয়ে বাধা দিতে আসত এবং কৃষকরাও লাঠিসোটা নিয়ে তাদের প্রতিরোধ করত। অন্যতম অভিনেতা সুনীল দত্তের লেখা থেকে এখানে একটু উদ্ধৃতি দিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "যথারীতি সন্ধ্যা পেরোতেই নাটক শুরু হল। মঞ্চের আশেপাশে কয়েকজন পাহারাদার। তারা পুলিশ নয়, কৃষকসভার সভ্য। জান দিতে প্রস্তুত আছে ঐ খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষেরা। নাটক হবেই, তাতে দু'চারটে জান যায় যাবে। সেদিন আরো প্রাণবন্ত অভিনয় হল। কারণ একসঙ্গে দু'টো নাটক চলছে। মাঝপথে নাটক বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেছে জমিদারের গুণ্ডাদের পিটিয়ে পিটিয়ে তাড়ানোর পালা। এই নয়ানপুর পালাটা একটু থমকে দাঁড়াল। আবার শুরু হল নাটক, দ্বিগুণ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের মধ্যে সে কি উচ্ছ্বাস।"[১৮]

যে লড়াইয়ের আবেগ কৃষক ও মধ্যবিত্তের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ রচনা করেছিল, সেটি কিন্তু ক্রমে থেমে এল। তখন আর মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী রচিত গান বা নাটক সম্পর্কে কৃষকদের সেই আগের আগ্রহ রইল না। বুদ্ধিজীবীদেরও কৃষকজীবনের সঙ্গে সেই ঘনিষ্ঠতা ও সহমর্মিতার অভাব ঘটল।

সোমনাথ হোর জানিয়েছেন, তেভাগার সময় নিজেদের পুরোনো লোকগীতি 'চেনার বধুয়া তুই' বাতিল করে রংপুরের চাষীরা শুনত ভাল আমাদের মধ্যবিত্ত গণসংগীতকারদের গান। আমরা জানি, 'চেনার বধুয়া তুই'—এর সুর অবলম্বনে বিনয় রায় সেই সময় একটি নতুন গান বেঁধেছিলেন। মূল গানটি ভুলে গিয়ে এই গানটিই কৃষকরা গাইতে থাকে বেশ কিছুদিন ধরে। 'চেনার বধুয়া' র বৃদ্ধ কৃষকের

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কাছে জব্দ হবার সরস বর্ণনায় তারা আর মজা পায় না, বরং বিনয় রায়ের গানের প্রতিরোধী বক্তব্য তাদের উদ্দীপিত করে। মুখে মুখে ঘোরে—

> গরীব দেশবাসী গরীব কিষাণ ভাই
> তুই খ্যাত্যাৎ করলিরে ফসল
> সেই ফসল কাড়িয়া নিল
> মজুতদার শয়তানে, গরীব কিষাণ ভাই রে।
> তুই জলোইতে ভিজিলি, ঐদোতে পুড়িলি
> হাড়ভাঙা খাটলিরে তুই
> ফসল না তোর ঘর ওঠে
> চিনিয়ে নেরে বাটপাড়ে
> গরীব কিষাণ ভাই রে।

কিন্তু তেভাগা আন্দোলন থেমে যায়। বিনয় রায়ের গানটিও লোকে বিস্মৃত হয়। 'ঢেনার বধূয়া তুই' আবার ফিরে আসে।

প্রাচীন লোকগীতি 'ঢেনার বধূয়া'র শিকড়-স্থানীয় সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত। সে ছিল কৃষকের নিজস্ব সম্পদ। অন্যদিকে, বিনয় রায়ের গানের ভাষা ও ভাবপ্রকাশের ভঙ্গিমা যেন কিঞ্চিৎ কৃত্রিম। একটা কথা তো ঠিক, একজন কৃষকের পক্ষে আরেকজন কৃষককে 'কিষাণ ভাই' বলে সম্বোধন করা স্বাভাবিক ঘটনা নয়। একজন মধ্যবিত্ত গীতিকার যতই কেন আন্তরিকভাবে কৃষক-সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করুন, লোকসংগীতের ফর্ম ব্যবহার করুন, কৃষকদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ব্যবধান পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে দুষ্কর। তবু সংগ্রামের তাগিদই তাঁকে কৃষকদের সবথেকে কাছে এনে দিতে পারে। তা সত্ত্বেও তাঁর যেটুকু সীমাবদ্ধতা থেকে যায়, কৃষকদের কাছে তা ঢাকা পড়ে সংগ্রামের উত্তেজনায়। জঙ্গী-আবেগ মিলিয়ে দেয় মধ্যবিত্ত ও কৃষক সংস্কৃতিকে। অবশ্য সে নিতান্তই সাময়িকভাবে তবু তো মানুষে মানুষে শুভবুদ্ধিভিত্তিক অন্যায়বিরোধী ঐক্যই সভ্যতার চিরায়ত সত্য। তেভাগা ও তেভাগার সংস্কৃতি এই সত্যের অন্যতম নিদর্শন হয়ে থাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

প্রান্তটীকা

১ *অরণি*, শারদীয়, ১৯৪৬। পরে *সন্দীপের চর* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

২ দীপা মুখোপাধ্যায় ও সুহাস চৌধুরী সংকলিত *সলিল চৌধুরীর গান* গ্রন্থে গানটি পাওয়া যাবে।

৩ *সলিল চৌধুরীর কবিতা* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৪ বিনয় রায়ের সুপরিচিত গান। পরবর্তীকালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এটিকে ক্যাসেটে বিধৃত করেছে।

৫ মাস সিঙ্গার্স কর্তৃক প্রকাশিত *হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৬ দ্রষ্টব্য *সলিল চৌধুরীর কবিতা।*

৭ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *অগ্নিকোণ* কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা।

৮ *পরিচয়* পত্রিকায় প্রকাশিত।

৯ দ্রষ্টব্য ।

১০ আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের *স্বাধীনতা* পত্রিকার সংগ্রহে এই সংখ্যাটি নেই। এটি পেয়েছি Intelligence Branch- এর ফাইলে।

১১ নাড়াইলের তেভাগা সংক্রান্ত এইসব তথ্য পেয়েছি *Adrienne Cooper*-এর *Sharecropping and Sharecroppers' Struggle in Bengal*, 1930-1950 শীর্ষক গ্রন্থে।

১২ নির্মলচন্দ্র চৌধুরীর বই *স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশী সম্প্রদায়* গ্রন্থে উদ্ধৃত। প্রকাশক উত্তরবঙ্গ অনুসন্ধান সমিতি, জলপাইগুড়ি।

১৩ দ্রষ্টব্য নির্মলচন্দ্র চৌধুরীর উল্লিখিত গ্রন্থ। এই উল্টো 'ভোটানযাত্রা' *তেভাগার সংগ্রাম : রজত-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে* মণিকৃষ্ণ সেনের প্রবন্ধেও উদ্ধৃত হয়েছে। দুটি উদ্ধৃতির মধ্যে কিছু হেরফের আছে।

১৪ জগৎ সাহা, 'লাল শুকরা ওরাঁও ও তার কথা', *জলপাইগুড়ি-লোকসংস্কৃতি উৎসব স্মরণিকা* থেকে নেওয়া।

১৫ শংকর সেনগুপ্তের *লোকবৃত্তের অন্য দিগন্ত* গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১৬ *তেভাগা রজত-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে* মণিকৃষ্ণ সেনের প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

১৭ প্রথমে *এক্ষণ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে বই হিসেবে প্রকাশ করেছে সুবর্ণরেখা, ১৯৯১ সালে।

১৮ সুনীল দত্ত, *জীবনধর্মী নাট্য প্রযোজনার রূপরেখা*, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ।

শিল্পী : চিত্তপ্রসাদ

আধিজমি তেকুটিভাগ

রণজিৎকুমার সমাদ্দার

"দিনের শোভা সুরুয' রে,
আতের* শোভা চান,
হালুয়ার শোভা হালকৃষি,
জমিনের শোভা ধান।"[১]

এ শুধু শব্দগুচ্ছ নয়। আধিয়ার যুবকের অন্তরের কথা। গান হয়ে ঝরে পড়েছে। এই আধিয়ার কারা? প্রশ্ন ওঠে স্বভাবতই। তখন অবশ্যই দৃষ্টি ফেরাতে হবে গ্রামীণ অর্থনীতির মূলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই—জমি, জমিদার ও রায়ত এই তিনসূত্রের মধ্যে জোতদার আবার কোথায়ও বা লাটদার হিসেবে নবীন ভূস্বামীর সৃষ্টি হয়। এরা জমিদারকে খাজনা দিত বা সরাসরি সরকারকেই ভূমি রাজস্ব দিতে পারত। এদের আয়ের উৎস ভাগচাষী বা বর্গা আধিয়ারদের কাছ থেকে ফসলের অর্দ্ধাংশ (পঞ্চাশভাগ) হিসাবে সংগৃহীত খাজনা।

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট (১৯৪০) থেকে এটা স্পষ্ট। ৭৫ লক্ষ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ৩০ লক্ষ পরিবারের প্রজাস্বত্বের অধিকার ছিল না। তারা মজুর শ্রেণী বা ভাগচাষী এবং আবাদী জমির ৩৪ শতাংশ চাষ করে ওই ভাগচাষী, ভূমিহীন পরিবারবর্গ। অথচ মুষ্টিমেয় কয়েকজন যারা অ-কৃষক, তাদের হাতে ছিল বিশাল পরিমাণ জমি। এদের জমির উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় কোনও ভূমিকা ছিল না। না শ্রমে, না অর্থে। কিন্তু তারা শোষণ করত ওইসব ভূমিহীন পরিবারবর্গকে। শোষণের তির্যক-প্রক্রিয়া ছিল বর্গাচাষ। অর্থাৎ চাষীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি চাষের বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের আধাআধি দিতে হত, তাই আধিয়ার। আর ভূস্বামী অলস প্রতিভূকে, বলা হত জোতদার।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিদানে বনেদি জমিদার হারিয়ে যায়। নতুন ভূস্বামীর সৃষ্টি হয়। শহরে এক শ্রেণীর হাতে নতুন পুঁজির ফলে এবং জমি যেহেতু সামাজিক প্রতিষ্ঠার, আত্মসম্ভ্রমের প্রতীক বা নিশ্চিন্ত ভোগ বিলাসের সুযোগ যা নিতান্ত চাকরির ওপর সম্ভব ছিলনা। সেই শ্রেণী জমির নতুন মালিক হয়ে বসে,—এরাই জোতদার।
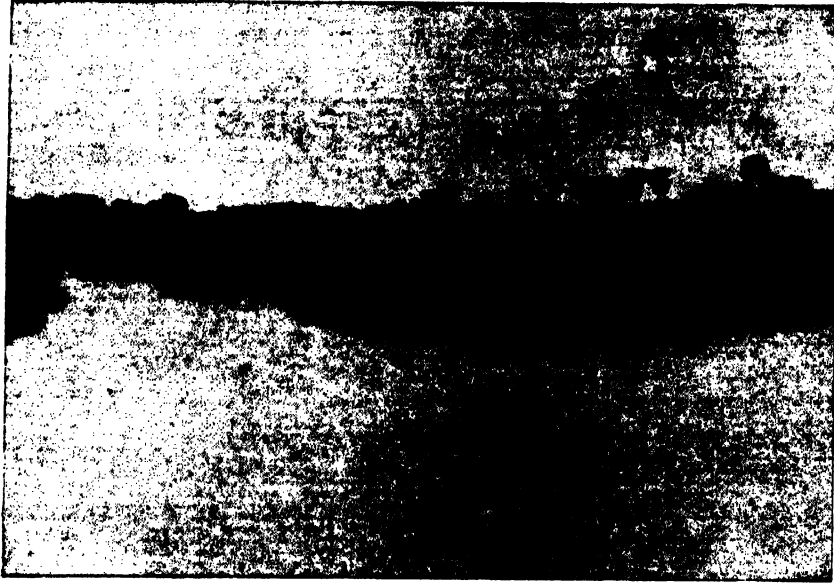
দিনাজপুর, রঙপুর, জলপাইগুড়ি, যশোর, ময়মনসিংহ, মালদহ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলায় জোতদার শোষকের ভূমিকায়, আপন স্বরূপে অবতীর্ণ হয়। নিয়ম ছিল, চাষী হাল বলদ নিয়ে চাষ করবে। চাষের খরচ বলতে যা কিছু সবই তার। অথচ ফসলের অর্দ্ধভাগ চাষীকে জোতদারের গোলায়, খোলানে তুলে দিতে হত। চাষের নানাবিধ খরচের জন্য চাষী জোতদারের কাছেই কর্জ করত। সে কর্জ ধান দিয়ে শোধ দিত, সুদসমেত। এর কোনও প্রতিকার ছিল না। কারণ বর্গাদারের জমিতে স্বত্বস্বামিত্ব ছিল না। 'লিজ' বা 'অবাধচুক্তি' বলে একটা কথা চালু ছিল। সে কথার কথা, মৌখিক। খাজনার চড়ামূল্যে এবং জোতদারের নিজস্ব সুদচক্রে সে নিপীড়িত হত, শোষিত হত।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা ১৯৩৯ সালে ভূমি রাজস্ব কমিশনের কাছে এক স্মারকলিপিতে বর্গাদার সমস্যার কথা তুলে ধরে। এই কমিশন অবশ্য স্বীকার করেছিল যে, ফসলের অর্দ্ধাংশ অত্যধিক খাজনা। যারা হাল বলদ, চাষের যন্ত্রপাতি, শ্রম দিয়ে থাকে তাদের প্রজা বলে গণ্য করা হোক। এবং খাজনা নেওয়া হোক উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ। বলা বাহুল্য, প্রস্তাব, সুপারিশ ছিল কাগুজে-ব্যাপার, কার্যকর হয়নি। ফলত, শুরু হয়ে গেল প্রতিরোধ আন্দোলন।

তৃতীয়ত, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি কখনও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেয়নি আধিয়ারেরা। জোতদারদের দুরভিসন্ধি ও উস্কানিমূলক চেষ্টা সত্বেও আন্দোলনকারীরা হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বজায় রাখতে পেরেছিল।

চতুর্থত, জোতদারদের বর্গাচাষীদের কাছ থেকে নানাধরনের অবৈধ আদায়, আবওয়াব প্রভৃতি নেওয়া বন্ধ হল। বন্ধ হল চাষীর কাছ থেকে দেড়া-বাড়ি, বা দ্বিগুণ-বাড়ি আদায়।

পঞ্চমত, এই আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তারা পুরুষের সঙ্গে প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হয়েছে। সশস্ত্র লড়াইয়ে নেমেছে। সামাজিক কাজেও তাদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তাদের বীরত্ব ইতিহাস হয়ে আছে।

এই আন্দোলনের ব্যর্থতার দিক নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। যেমন প্রথমত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতা,

দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্র জোতদারদের বাদ না দেওয়া। ভবানী সেন বলেছেন ; "আধিয়ারদের আমরা পরামর্শ দিতে পারতাম যে, তেভাগার কার্যক্রম থেকে ক্ষুদ্র জোতদারদের বাদ দেওয়ার এবং সবচেয়ে ধনবান ও বৃহত্তমদের বিরুদ্ধে আন্দোলন কেন্দ্রীভূত করার।"[২২]

তৃতীয়ত, শ্রমিক শ্রেণীকে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়নি।

চতুর্থত, যখন খসড়া বর্গাদার বিল আইন সভায় পেশ হল। তার রূপায়ণে জোরালো দাবি উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল গণপ্রচারাভিযান ও জন আন্দোলনের। সেটা হয়নি। সংগ্রামী নেতা বলেছেন, বিল পেশ হয়েছে। "আমরা তখন আত্মসন্তুষ্ট ও অসতর্ক হয়ে পড়ি, কারণ আমরা ভেবেছিলাম জয় সমাসন্ন।"[২৩] চিন্তা ও চেতনার মধ্যে বাস্তবের ফারাক—ব্যর্থতার কারণ।

পঞ্চমত, অকৃষক, গরিব, মধ্যবিত্ত জনগণ যাঁরা গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। যুক্ত ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায়—তাঁদের কৃষি আন্দোলনেও সামন্তবাদ বিরোধী করে তোলা যায়নি। এই শ্রেণীকে যুক্ত করতে পারলে আন্দোলন হয়তো বা সর্বাত্মক হতে পারত।

তবে এটা ঠিক। উনিশটি জেলায় প্রায় ষাটলক্ষ আধিয়ার-কৃষক যেভাবে তেভাগার দাবিতে লড়াই করেছেন—বলা যেতে পারে জীবনসংগ্রামে নেমেছেন ; তা ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়—নতুন কালপর্ব হিসাবে বিবেচিত হবে। ভূমি ও কৃষক—এ দুটি উচ্চারণে, 'তেভাগা' এই রক্তঝরা শব্দটি উচ্চারিত হবে স্মরণ ও মহিমায়, স্বতন্ত্র মর্যাদায়।

॥ উৎস ॥

† সুরজ, সূর্য

রাতের

* চাঁদ

১. সোমনাথ হোর, তেভাগার ডায়েরি, ১৯৯১, পৃ. ৪৫

২. সুশীল সেন, দ্র. নিবন্ধ, তেভাগা সংগ্রাম, রজতজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, পৃ. ৩১,

৩. সোমনাথ হোর বলেছেন, দিনাজপুরের কমরেড রূপনারায়ণের মুখে এসব কথা শুনেছেন। দ্র, তেভাগার ডায়েরি, পৃ. ১৫

৪. চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ এলাকার নাচোল ১৯৪৭ সালের পূর্বে মালদহ জেলার মধ্যে ছিল। পরে রাজশাহী জেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়। নাচোলের শিক্ষক ইমানুল মুর্মু লোকমুখে প্রচলিত এই লোকগানটি শুনেছেন। দ্র, বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, ১৯৮৬, পৃ. ৩৯৭

* ইলা মিত্র। চাঁপাই নওয়াবগঞ্জের বরেন্দ্রনাথ মিত্র বিবাহ করেন কলকাতায় ইলামিত্রকে, (১৯৪৪) ইলামিত্র শ্বশুরবাড়ী রামচন্দ্রপুরে এসে শিক্ষকতা ও রাজনীতিতে আরও সক্রিয় হন।

৫. মণিকৃষ্ণ সেন, দ্র, নিবন্ধ, তেভাগা আন্দোলনে রংপুর, তেভাগা, রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, পৃ. ৫৭

৬. তেভাগার ডায়েরি, পৃ. ১৯

৭. মণিকৃষ্ণ সেন, তদেব

৮. ধনঞ্জয় রায় সম্পাদিত, রংপুরের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন, ১৯৮৬, পৃ. ৫

৯. তদেব, পৃ. ১৬। 'ঢেনার বধুয়া তুই' রঙপুরের প্রাচীন গান দ্র, তেভাগার ডায়েরি পৃ. ৪৮

* মেদিনীপুরের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী বিমলা মাজির সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত করেছেন Peter Custer, Women in Tebhaga Uprising, 1987 P. 24

১০. The Statesman, March 19, 1947
এই সময় গান শোনা যেত, "চাষীরে তোর লাল সেলাম তোর লাল নিশান রে", দ্র, তেভাগার ডায়েরি, পৃ.২২।

১১. হোর, তদেব, পৃ. ২৬

* ধনঞ্জয় রায় উল্লেখ করেছেন। যাদুমিঞার সঙ্গে ২৫।৩০ জন জোতদার বন্দুকসহ সেখানে উপস্থিত হয়। এবং আহতের সংখ্যা ২৫।৩০ জন। দ্র, ধনঞ্জয় রায়, তদেব, পৃ. ২২

১২. মণিকৃষ্ণ সেন, তদেব, পৃ. ৬১

১৩. তদেব

১৪. তদেব

১৫. সেন, তদেব

১৬. আওরায় বলেছেন, পুলিসেরাই যে দিনমজুর হিসেবে জোতদারদের ফসলকাটার কাজে সাহায্য করতে লেগেছে। এই খবর নীলগঞ্জে সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। দ্র, নিবন্ধ, তেভাগা সংগ্রাম, রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ৭৩

১৭. আওরায়, তদেব, পৃ. ৭৫

১৮. 'লালগঞ্জে পৌষোবোহি' দ্র, তেভাগার স্মৃতি, পূর্ণেন্দু ঘোষ, ১৯৮৭ পৃ. ৩৯-৪০ কবিতাটি এখানে সম্পূর্ণ নয়। কালীপদ কোঙার তাঁর সম্পাদিত অগ্নিকোণে বসন্ত কাব্যগ্রন্থেও কবিতাটি সংযোজন করেছেন।

১৯. কৃত্তিবাস ওঝা, দ্র, নিবন্ধ, শারদীয়া সত্যযুগ, ১৩৮৯, পৃ. ৭৪-৭৬

২০ ভবানী সেন, দ্র, নিবন্ধ, তেভাগা সংগ্রাম, রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, পৃ. ৫-১৮

২১. সুশীল সেন, দ্র, নিবন্ধ, তেভাগা সংগ্রাম, রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, পৃ. ৩১

২২. ভবানী সেন, তদেব, পৃ. ১৭

২৩. তদেব।

তেভাগা আন্দোলনের শহিদ

দিনাজপুর জেলা

১।	সমিরুদ্দীন	চিরির বন্দর	৪ জানুয়ারি ১৯৪৭
২।	শিবরাম মাঝি	"	"
৩।	চিয়ার সাই শেখ	খাঁপুর	২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭
৪।	যশোদারানী সরকার	"	"
৫।	কৌশল্যা কামারনী	"	"
৬।	গুরুচরণ বর্মণ	"	"
৭।	হপন মার্ডি	"	"
৮।	মাঝি সরেন	"	"
৯।	দুখনা কোলকামার	"	"
১০।	পুরনা কোলকামার	"	"
১১।	ফাগুয়া কোলকামার	"	"
১২।	ভোলানাথ কোলকামার	"	"
১৩।	কৈলাস ভুঁইমালী	"	"
১৪।	খোতো বর্মণ	"	"
১৫।	ভাদু বর্মণ	"	"
১৬।	আলু বর্মণ	"	"
১৭।	মঙ্গল বর্মণ	"	"
১৮।	শ্যামাচরণ বর্মণ	"	"
১৯।	নগেন বর্মণ	"	"
২০।	ভুবন বর্মণ	খাঁপুর	২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭
২১।	ভবানী বর্মণ	"	"
২২।	জ্ঞান বর্মণ	"	"
২৩।	নারায়ণ মুর্মু	"	"
২৪।	গহনুয়া মাহাতো	"	"
২৫।	শুকুর চাঁদ	ঠুমনিয়া	"
২৬।	ঐ স্ত্রী	"	"
২৭।	মাকটু সিং	"	"
২৮।	নেন্দেলি সিং	"	"
২৯।	গজেন বর্মণ	চিরির বন্দর	"
৩০।	ঝড়ু বর্মণ	"	"
(৩১-৩৫)	পাঁচজন কৃষক (মিছিল ক'রে জনসভায় ঠাকুরগাও যাবার পথে পুলিসের গুলিতে নিহত)।		২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭
(৩৬-৩৯)	বিচারাধীন অবস্থায় দিনাজপুর জেলে মৃত চারজন কৃষক।		"
৪০।	একজন কৃষক (জোতদারদের দ্বারা নিহত)		১৯৪৭

জলপাইগুড়ি জেলা

(৪১-৪৫)	পাঁচজন কৃষক	হাহাইপাথা, মাল	১ মার্চ, ১৯৪৭
(৪৬-৫৪)	নজন কৃষক	মঙ্গল বাড়ি হাট, মেটেলি	৪ এপ্রিল, ১৯৪৭

খুলনা জেলা

৫৫। হাজারিপদ বালা — বালাবুনিয়া, শোভনা — ২৩ জানুয়ারি ১৯৪৭

৫৬। হাজরা পদ মণ্ডল (জোতদারদের দ্বারা নিহত)। — দাকোপ — ”

রংপুর জেলা

৫৭। তৎনারায়ণ বর্মণ — ” — জানুয়ারি ১৯৪৭

হাওড়া জেলা

৫৮। প্রাণকৃষ্ণ মান্না (৪০) — জামিরা — ৬ জানুয়ারি ১৯৪৭

চব্বিশ-পরগনা জেলা

৫৯। কার্ত্তিক কর — ” — ১৯৪৮

৬০। যতীশচন্দ্র হালদার — ” — ”

৬১। রবিরাম সর্দার (৩৫) — বেড় মজুর — ৮ মার্চ, ১৯৪৭

৬২। পাগলু সর্দার — ” — ”

৬৩। চামু বিশাল (রাজবাড়ি) — বেড় মজুর — ৮ মার্চ, ১৯৪৭

৬৪। বৈরা সর্দার (২৭) — ” — ”

৬৫। রতিরাম সর্দার — ছোট আজগড়া — ”

মালদহ জেলা

(৬৬-৬৯) চারজন আদিবাসী কৃষক — চরুল বিল — ২৯ মার্চ, ১৯৪৭

ময়মনসিং জেলা

৭০। রাসমনি — বহেরাতলি সুসংখানা — ৩১ জানুয়ারি, ১৯৪৭

৭১। সুরেন্দ্র সরকার — ” — ”

৭২। রাজেন্দ্র সরকার — ” — ”

৭৩। সর্বেশ্বর ডালু (জোতদারদের দ্বারা নিহত) — ” — ”

১৯৪৮-৪৯ এর কৃষক আন্দোলনে পুলিসের গুলিতে আরও ৬৮ জন কৃষক শহিদ হন।

[কৃষক সভার ইতিহাস—পৃঃ ২৮২-২৮৪]